রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত

অচেনা এই কলকাতা

৫৭/২ডি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

অচেনা এই কলকাতা

সাত-আট বছর বয়সে প্রথম কলিকাতা-দর্শন, ষোল বছর বয়সে স্থায়ী পদার্পণ, দেখতে দেখতে অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে, কিন্তু দেড় ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস ছায়াছবির মতই। কারণ কোলকাতা জোব চার্নকের দিন থেকে কেবলই ছুটছে। আজও তার থামার সময় নেই, কেউ তাকে লাল বাতি দেখিয়ে থামাতে চায়ও না। কারণ কোলকাতা কখনও লাল সবুজের সঙ্কেত মেনে চলেনি, রেসের ঘোড়ার মত সে ছুটছে, বারুদের স্তূপ হয়ে ফুটছে বা ফাটছে, কখনও মাতাল হয়ে টলছে, কখনও কারো দিকে ঢলছে। কখনও কখনও মনে হতেও পারে নিমগ্ন ঘুমে ঢুলছে হয়তো, ট্রামের আসনে, বাসের জানলায়, আপিসের টেবিলে। কিন্তু সবই সাময়িক, ছুটে চলাই তার নিত্য-দিনের পরিচয়, অফিস-যাত্রীদের মত।

সুতরাং কোলকাতার জীবনে কত ঘটনা ও অঘটন, কত দৃশ্য, এবং অদৃশ্য ইতিহাস, কত ভাঙাগড়া, এবং কত ভাঙা মাস্তুলের ডুবন্ত জাহাজ তার বন্দরের ঘাটে, তার পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলে। তবু অনুসন্ধানীর দৃষ্টি শুধুই কৌতূহল মেটায়, কোলকাতা ইতিহাস হয়ে ওঠে না। কোলকাতা কোন জীবন্ত চরিত্র হয়ে ওঠে না।

অর্ধশতাব্দীর ওপর কোলকাতার সঙ্গে এই গাঢ়-গভীর প্রণয় সত্ত্বেও আমার মত অনেকেই হয়তো বুঝতে পারেন, অনুভব করেন, যে শেষ অবধি সত্যি সত্যি ক্যালকেশিয়েন হওয়া যায় না। কেউ হতে পারে না, সারা জীবন ধরে তার সঙ্গে ঘর করেও কোলকাতা কারও ঘর বা ঘরণী হয় না, শহরটা

তার অগণিত নটগৃহের স্টেজের আলোয় ঝলসানো নর্তকীর মত শুধু নাচের ফাঁকে কুহকিনী কটাক্ষ ছুঁড়ে দেয়, ভ্রূবিলাস দেয় হাতছানি, তারপর তার লুকোনো শূন্যতার বুক আড়াল করে, তার বেদনা, তার মানসযন্ত্রণা, তার ঐশ্বর্যময় দারিদ্র্য গোপন করে ভিড়ের রাস্তায় মিশিয়ে যায়, গোপন রাত্রির বন্ধ-ঘর একাকিত্বের মধ্যে। কোলকাতা রয়ে যায় সেই ধরাছোঁয়ার বাইরে। তার সঙ্গে চক্ষুমৈত্রী ঘটে, সে কারও প্রণয়ী হয়ে ওঠে না।

তবু কোলকাতাকে জানতে ইচ্ছে করে।

আগ্রহী গবেষকরা, বিদগ্ধ বিজ্ঞজন, উৎসাহী সাংবাদিক, পথ-চলা কোন সাধারণ মানুষ নিত্যদিন কোলকাতাকে টুকরো টুকরো ভাবে আবিষ্কার করে চলেছেন। কেউ মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে, কেউ কেউ রাশি রাশি গ্রন্থ পুঁথি দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে, কেউ আকস্মিকভাবে, কেউ বা বুদ্ধির বিশ্লেষণে। কিন্তু এ-সবই আমাদের ছোট ছোট কৌতূহল মেটায়, কোলকাতা ইতিহাস হয়ে ওঠে না। তাই কোলকাতার আগে একটাই শুধু মানানসই বিশেষণ : অচেনা শহর।

জোব চার্নক যদি এ শহরের পত্তনদার, তা হলে তার বৈঠক-খানায় ভিড করে আসতো কারা? তারা কোথায় ছিল? সতীদাহের চিতা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে যে চার্নক একটি বিধবা তরুণীকে পত্নীর আসনে বসিয়েছিল, তার সমাধির দিকে সকলেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে, কিন্তু গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে কেউ হদিশ দিতে পারে না কোন ঘাটে নথিভুক্ত তিনশো সতীর ছাই মাত্র একবছরেই গঙ্গার মাটির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে। কোন্ ঘাটে? কোন্ সে বংশ বা পরিবার? যারা সমাজের

বলি হয়ে এই নৃশংস প্রথাকে ভেবেছিল গর্ব· এবং গৌরব? আমরা গর্ব করে শুধু বলি, আমাদের রামমোহন। আর তার ফাঁকে নির্বোধ অহঙ্কারী কলঙ্কময় মুখগুলোকে আত্মগোপন করার সুযোগ দিই। আমরা শুধু কৌতূহল মেটাতে চাই, ইতিহাস জানি না, জানতে চাই না।

যে সকল এবং অর্থবান ডাক্তার আত্মসন্তোষে রুগী দেখেন, অথবা যে সাধারণ মানুষ হাসপাতালে ছুটে যান মৃত্যু-ভয়ে, তাঁদের দু'জনেরই মুখ ফসকে যখন একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের মন্তব্য বেরিয়ে আসে, তখন সেই চিকিৎসক জানেন না যে তাঁর ডাক্তার হয়ে ওঠার মূলে, কিংবা ওই মরণাপন্ন রুগী জানেন না যে তাঁর জীবন ফিরে পাওয়ার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। তাঁর মুখ ফসকে যাদের সম্পর্কে নিন্দাবাক্য বেরিয়ে এসেছে, তাদেরই একজনের দান করা জমি এবং দানের টাকায় গড়া বাড়ির চিরন্তন মাসোহারার শয্যার কাছে তাঁরা চিরকৃতজ্ঞ। ইতিহাস ভুলে যেতে পারে, ইতিহাস মুছে যেতে পারে। কিন্তু আমরা ভুলবো কি করে যে আমরা অকৃতজ্ঞ।

কোলকাতার ইতিহাস ঘাঁটলে তবেই আমরা জানতে পারি নন্দকুমারের ফাঁসি এ শহরকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, আবার এই কোলকাতা নফর কুণ্ডুকেও ভোলে না, রাস্তার নামকরণের সময় ভুলে যায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু কেন ভুলে যায়, কোন্ দম্ভের মুখগুলিকে তিনি ম্লান করে দিয়েছিলেন, সেই অপ্রকাশিত ইতিহাস কারও জানা হয়ে ওঠে না।

আমাদের ইতিহাস অন্বেষণ করে বেড়ায় কালীঘাটের মন্দিরের প্রাচীনত্ব, তার আড়ালে দীনতম কুটিরে বসে যে পটুয়া ছবি এঁকে গেছে একটি কি দুটি পয়সার বিনিময়ে, তার ইতিহাস

তার সমসাময়িক কাল জানতে চায় নি। অথচ বিদেশের বিদগ্ধ মহলে সেই ছবি যখন বিস্ময়বিমুগ্ধ রসিকের প্রশংসা কুড়োয়, আমরা শিক্ষিতজন তা আত্মসাৎ করে বসি। আত্ম-গ্লানিতেও ছাপার অক্ষরে তার স্বীকৃতি রেখে যাই না।

যা মনে রাখার কথা, কোলকাতা তা মনে রাখে না। যা চিনে রাখার কথা, তা অচেনাই থেকে যায়। তাই বিদেশী শিল্পীদের ছবি হাতড়ে বেড়াতে হয়, বৃথাই, শুধু সেকালের বাঙালীর, বিশেষ করে বাঙালী রমণীদের বেশভূষা, কেশবিন্যাস, অলঙ্কার অথবা তাদের মুখের আদলটি জানার জন্যে। এই সেদিনের লুপ্ত হয়ে যাওয়া পণ্টুন ব্রিজের আকৃতি জানতে হয় একালের পাঠককে, শুধুই ছবি দেখে। সেই ইতিহাসচেতনা থাকলে বেলেঘাটা কিংবা ঢাকুরিয়া লেকে তার কিছুটা অংশ জীবন্ত হয়ে থাকতো। ভাঙা হত না সেনেট হলের অন্তত মুখশ্রীটুকু; খুঁজে বের করা হ'ত গলির মোড়ের ছোট্ট প্রেস, যেখান থেকে মূল দ্বৈপায়ন ব্যাসের সমগ্র মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হয়ে সারা পৃথিবীকে চমকিত এবং শ্রদ্ধানত করেছিল।

কোলকাতা কোনদিন আসল কলকাতাকে মনে রাখতে চায় নি। নর্তকী নিকি কিংবা ফিরিঙ্গি সাহেবের উপপত্নীর খোঁজ নিতে তার যতখানি আগ্রহ, তার শতাংশের একাংশও নেই এ শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোমাঞ্চময় বিশ্বদর্শনে। জৈনরা এ শহরকে দিয়েছে দু'দুটি বর্ণাঢ্য মন্দির, জৈনদের অস্তিত্ব আমাদের প্রায় অজ্ঞাত। একটা চীনে পাড়া, বৌদ্ধমন্দির, শকুনের পক্ষচ্ছায়ায় পার্শীদের টাওয়ার অব সাইলেন্স, ওয়াজেদ আলির দর্জি, টিপুর পুত্র-প্রপৌত্র, আর-মেনিয়ান বসতি, কালিঘাটে গ্রীকচার্চ, লেবেডফের যবনিকা

কোথায় প্রথম উত্তোলিত হ'ল, উদ্বেলিত হ'ল কোলকাতা, কারা গড়লো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোন শিল্পী রাজমিস্ত্রীর দল, যে কোলকাতা জালিয়াতির অভিযোগে ব্রহ্মহত্যায় শোক-স্তব্ধ সেই কোলকাতা কেন উচ্চারণ করেনি একটি প্রতিবাদ বাক্য, হেস্টিংসের মূর্তির পাদদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি-মূর্তির অলঙ্করণে? হাজারো প্রশ্ন, হাজার কৌতূহল।

কোলকাতার পথে পথে অর্ধশতাব্দী ধরে ঘুরেছি। কত পুরোনো গলি, কত নতুন রাস্তা, কত নাম, বকুলতলায় কোন বন্ধুর বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে সেই বকুলের সুঘ্রাণ কল্পনা করেছি, একডালিয়ায় কি একটি ডালিয়া গাছ, বৌবাজারে কোনো সোনার দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি বউ না বহু, নাকি Bow সাহেব থেকে, প্রশ্ন জেগেছে মতি-লাল পদবীর চেয়েও তো বৌবাজার অনেক প্রাচীন, তা'হলে কি ওসব নেহাৎই কিংবদন্তী! অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরিঙ্গি কালীর সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছি অ্যান্টনি কবিয়াল কোথায় থাকতো, কোন বাড়িতে, বাগবাজারে নবীন সেনের স্পঞ্জ রসগোল্লার যদিবা হদিশ মিলেছে, ভোলা ময়রা কোন হোগলার ছাউনি দেওয়া ঘরে জীবন কাটিয়েছে, জানতে পারিনি। এমনি শত শত প্রশ্ন জেগেছে, কোনটির সামান্য ইশারা মিলেছে, কোনটির তাও নয়।

পঞ্চাশ বছর ধরে নানা পথ হেঁটে (সেকালে হাঁটা যেত) জেনেছি কোন পথই চেনা হয়নি, আজও ক্ষণে ক্ষণে ওল্টাতে হয় স্ট্রীট ডাইরেক্টরি। ছাদ-খোলা দোতলা বাস কেমন ছিল, তা দেখার এবং দেখাবার জন্যে একখানা ছবিও মেলে না।

তাই কোলকাতা আজও অচেনা।

এই অচেনা কোলকাতাকেই একটু চিনতে চেয়েছিলাম, চেনাতে চেয়েছিলাম।

এক যুগ আগে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়র পাতা মেলে দিয়ে বিদগ্ধজন, কোলকাতা-রসিক, সাংবাদিক, সাধারণ পাঠকের কাছে চেয়েছিলাম অচেনা শহর কোলকাতাকে তাঁরা টুকরো টুকরো করেই চিনিয়ে দিন। অনেকেই লিখেছিলেন, কেউ কেউ তখন অজ্ঞাত বা অল্পখ্যাত, এখন খ্যাতির শীর্ষে। সে রচনাগুলি হয়তো হারিয়ে যেত। এত বছর বাদে সেগুলিকে একত্রিত করতে গিয়ে তৎকালে অনুপস্থিত কয়েকজনের রচনাও এ সংগ্রহের মূল্য বাড়ালো। এবারে যাঁদের সহযোগিতা পেলাম না, আশা করি পরবর্তী সংস্করণে তাঁরাও সহযোগিতার হাত বাড়াবেন।

কিন্তু তবু এ-পরিচয় হয়ে থাকবে কোলকাতার আংশিক পরিচয়।

এ ধরনের শত শত বইয়ের ওপর ভিত্তি করে হয়তো একদিন কোলকাতার ইতিহাস রচিত হবে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস হবে কিনা সন্দেহ। কোলকাতা হারিয়ে গেছে, হারিয়ে যাচ্ছে। ভুলে যাওয়াই তার চরিত্র। তার দোকানের সাইনবোর্ড পাল্টাতেই সে ব্যস্ত, রাস্তার নেমপ্লেট রাতারাতি পাল্টে দিতে অথবা কোন ঐতিহাসিক বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতেই তার আগ্রহ।

রমাপদ চৌধুরী

শব্দবিদ্যার আঁচড়ে কলকাতার স্কেলিটন

সুকুমার সেন

কলকাতা সহরের পত্তন হয়েছিল কেনাবেচার জন্যে। সহরের এই মূল চরিত্র অবলম্বন করেই আড়াই'শ-তিন-শ' বছর ধরে সহরটি ফুলে ফেঁপে উঠেছে আর সেই চরিত্রের প্রবলতা বেড়ে বেড়ে এখন শ্বাসরোধজনক স্ফীতির পরিণামে নিয়ে যাচ্ছে। কলকাতার এই মূল বেচাকেনা চরিত্রের কোন নকল নেই, জাবদা দলিল ত নেই। তবে পুরোন স্থাননামগুলির পর্যালোচনা করলে মোটামুটি একটা আদল মেলে বলে আমার ধারণা। এই ধারণাকে রূপ দিয়েই এই প্রবন্ধ। সহরের নামটি নিয়ে আগে আমি আলোচনা করেছি। এখানে সে কথা আর তুলছি না।

অনেকগুলি পুরনো অঞ্চলের নাম এখন রাস্তার নামে পরিণত হয়েছে। কিছু কিছু অঞ্চল নাম লুপ্ত হয়ে গেছে। আর কিছু অঞ্চল নাম এখনো টিকে আছে। সবই আমি এক সঙ্গে আলোচনা করছি।

প্রথমে ধরি 'টোলা'-অন্তক নামগুলি। 'টোলা,' ছোট হলে 'টুলি,' বোঝায় কোন জীবিকা কাজের জন্য অস্থায়ী, অ-পোক্ত

আবাস অর্থাৎ ঝাঁপড়ি, কুঁড়ে, তাঁবু, কামরা, ছাউনি ইত্যাদির মতো। একদা আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিদ্যাশিক্ষা দিতেন এইরকম অস্থায়ী আবাসে। তাই বলত 'টোল'। কলকাতার যেসব অঞ্চলে একটু নিম্নস্তরের জীবিকা অবলম্বনকারীদের অস্থায়ী আস্তানা বা কুঁড়েঘর সারি সারি থাকত সেই অঞ্চলের নাম হত 'টোলা' দিয়ে। উদাহরণ ধরা যাক উত্তর দিক থেকে।

প্রথমে পাই এখানকার শ্যামবাজার অঞ্চলে 'কম্বুলে টোলা'। এখন এটি রাস্তার নামে পর্যবসিত। আমার বাল্যকালে এটি অঞ্চল নাম ছিল। সেখানে ভেড়িওয়ালারা ভেড়ার লোমে মোটা ও রুক্ষ কম্বল ও কম্বলের আসন তৈরি করত। সে বস্তু বাঙালী গৃহস্থ ব্যবহার করতো খুব। এই কম্বল-বানানেওলা ও বেচনেওলাকে বলত 'কম্বুলে' (সাধু বাংলা 'কম্বলিয়া' থেকে)। যে অঞ্চলে কম্বুলেদের বস্তি ছিল সে অঞ্চল কুম্বুলে টোলা নাম পেয়েছিল।

তারপর পরপর দক্ষিণে বলি। একটু পরেই 'কুমোরটুলি।' এখানে হাঁড়ি কলসী, পাতখোলা, প্রতিমা, পুতুল ইত্যাদি নির্মাতাদের আস্তানা ছিল। পাশেই হাটখোলা, সেখানে হাটে কুমোরের প্রস্তুত জিনিস প্রচুর বিক্রি হয়। আর একটু দক্ষিণে এগোলে পাই 'আহিরীটোলা'। নামটির ঠিক উচ্চারণ ও বানান হল 'আহিড়িটোলা'। আহিড়ি মানে পাকমারা শিকারিদের আস্তানা। 'বেনেটোলা' অর্থাৎ বেনেতি মশলা বেচা ব্যবসাদারদের আস্তানা দুটি ছিল। একটি কুমোরটুলির কাছাকাছি, আর একটি

দূরে পূর্ব-দক্ষিণে, পটুয়াটোলার কাছে। 'পটো' অর্থাৎ চিত্রকরদের আস্তানা ছিল 'পটুয়াটোলা,' পটলডাঙায় বেনেটোলার কাছে। কলুদের আস্তানা 'কলুটোলা,' পটুয়াটোলার কিঞ্চিৎ পশ্চিম দক্ষিণে, এখনো রয়ে গেছে একটি বড়ো রাস্তার নাম।

পিতল কাঁসার কারবারী কাঁসারিদের আস্তানা 'কাঁসারিটোলা' একদা কাঁসারিপাড়া নামেও চলত। এখানকার বিখ্যাত সংদার যাত্রা (Procession) অনেকদিন যাবৎ বিখ্যাত ছিল।

'জেলেটোলা,' জেলেদের আস্তানা, কলুটোলার দক্ষিণ-উত্তরে। জেলেটোলাব উত্তরে 'শাঁখারিটোলা'। শাঁখ কেটে যারা চুড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য করত, তাদের আস্তানা। শাঁখারিটোলার অনেক পশ্চিমে, লালবাজারের কাছে, 'কসাইটোলা,' মাংস বিক্রেতাদের স্থল। এ স্থান এখন বেন্টিক স্ট্রীটের অন্তর্গত। কলুটোলার দক্ষিণে 'কপালিটোলা' অর্থাৎ জড়ি-বুটি বেচা তান্ত্রিক কাপালিকের বসতি বা স্থল।

এই তো গেল সেকালের কলকাতার বস্তির সার্ভে। সেকাল মানে কোন কাল ? মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিকাল।

যে অঞ্চলে স্থায়ী নিবাস হত তার নাম হত 'পাড়া' দিয়ে। কলকাতার কোন কোন পাড়া-নাম এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন 'মালিপাড়া' (ধর্মতলা স্ট্রীটের পৃষ্ঠভাগ), 'মুসলমান পাড়া' (মির্জাপুর স্ট্রীটের পূর্বদিকে), 'চাষাধোবাপাড়া' (সিমলে স্ট্রীটের কাছে) ইত্যাদি। কোন কোন নাম বিলুপ্ত না হলেও

লোপোন্মুখ। যেমন 'নিকিরি পাড়া'। যারা জেলের কাছে মাছ কিনে বাজারে মাছ বিক্রেতাদের কাছে পাইকারিভাবে বেচে তাদের বলত 'নিকিরি'। মাছ ছাড়া অন্য বস্তু হলে 'ফড়ে' (ফড়িয়া)। নিকিরি পাড়ার বস্তি এখন নিশ্চিহ্ন। তবে কাছেই 'ফতেপুকুর'। এ পুকুর নিকিরিদের উচ্ছন্ন হবার আগেই ডাঙা হয়ে গিয়েছিল। তবে এখনো রাস্তার নামে টিকে আছে।

'পাড়া' থাকে একটু উঁচুস্তরের বস্তুনির্মাতা ও ব্যবসায়ীর নামে। এখানে 'টোলা'র সঙ্গে 'পাড়া'র বৈপরীত্য। যেমন কাঁসারি পাড়া, ছুতোর পাড়া, গোয়ালাপাড়া (গোয়াবাগানে, নামটি প্রথমে রাস্তার নামে গিয়ে ঠেকে এখন ব্যক্তিনামে পরিণত,—অবিনাশ ঘোষ লেন), শুঁড়িপাড়া, তেলিপাড়া (শ্যামপুকুর অঞ্চলে এখন রাস্তার নামে পরিণত), ডোমপাড়া (রামবাগান অঞ্চলে), মুচিপাড়া (নেবুতলা), জেলেপাড়া (বৌবাজার অঞ্চলে) ইত্যাদি।

এই আলোচনায় আমি খাস—অর্থাৎ অতীতের মারাঠা খালের বাতাবন্দি মূল কলকাতার কথা বলছি। তবুও গড়খাইয়ের বাইরে তুটি নামের আলোচনা না করে পারছি না। কলকাতার ইতিহাসের পক্ষে নাম তুটি কিঞ্চিৎ বিশেষ আলোকপাত করে। নাম তুটি হল, 'যুগীপাড়া' ও 'বলদেপাড়া,' গায়ে গায়ে সংলগ্ন। যুগীপাড়া মানে সহজ। যেখানে অনেক যুগী বাস করেন। যুগীরা তখন নানারকম ব্যবসায় করতেন। তাঁদের অন্যতম বৃত্তি ছিল বলদযোগে মাল পরিবহণ। এঁদের বলত 'বলদে (বলদিয়া) যুগী'। এই শেষোক্ত যুগীদের বসতি ছিল 'বলদে পাড়া'য়।

দরজীপাড়ায় ছিল রাজা নবকৃষ্ণের পরিবারের দরজীদের বাস। এইখানে ও আশে পাশে মুসলমানদের কিছু বসতি গড়ে উঠেছিল। আশেপাশে অন্য ব্যবসায়ী মুসলমানও কিছু ছিল। তা বলছি পরে গরানহাটার প্রসঙ্গে।

গোড়ার দিকে কলকাতা সহরের মধ্যে বসতিহীন ফাঁকা জায়গা অনেক ছিল। এই ফাঁকা জায়গাগুলিতে যখন অল্প অল্প করে বসতি শুরু হয় তখন পাড়াগাঁয়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে কোন স্থানীয় উল্লেখযোগ্য গাছের (অথবা দেবতার অথবা অন্য বস্তুর) নামের সঙ্গে 'তলা' যোগ করে নাম দেওয়া হত। যেমন বটতলা (বড়তলা), চাঁপাতলা, ডালিমতলা, নেবুতলা, আমড়াতলা (বড়বাজারে), বাঁশতলা (বড়বাজারে), তালতলা, মানিকতলা, ধরমতলা (বা ধর্মতলা)। শেষোক্ত নাম দুটি নিয়ে কিছু সন্দেহ আছে, নীচে বলছি।

কোন কোন নামে যে 'তলা' পাওয়া যায় তা বাংলা 'তলা' যা উপরে বললুম তা নয়। এ 'তলা' এসেছে হিন্দি 'তলাও' থেকে (সংস্কৃত 'তড়াগ' থেকে উদ্ভূত)। যেমন খাস কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে চৌরঙ্গী রোডের পাশে 'বির্জিতলা'। নামটি আসলে হল 'বীরজী-তলাও'। এখানে পুকুরের ধারে বটগাছের তলায় পুলিস ফাঁড়ির লোকেরা বীরজীর অর্থাৎ হনুমানের পূজা করত। এইভাবে এসেছে 'নোনাতলা', অর্থাৎ নোনাপুকুর। 'ধর্মতলা' নামটি যদি আসলে অবাঙালীর দেওয়া 'ধরমতলা' হয় তা হলে এই 'তলা' 'তলাও' থেকে আসা সম্ভব। এজরা স্ট্রীট অঞ্চলে একদা (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে) ডোমতলা' ছিল (যেখানে

লেবেডফ প্রথম বাংলা থিয়েটার করে ছিলেন)। সে ডোমতলার 'তলা' অবশ্যই 'তলাও' ছিল। মানিকতলার 'তলাও' 'তলাও' হওয়া সম্ভব। 'গেড়াতলা' নামটির 'গেঁড়া' মনে হয় 'গেঁড়ি' শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাহলে মানে হবে শামুক-গুগলি। যে পুকুরে প্রচুর গুগলি-শামুক সে পুকুর বা ডোবা 'গেঁড়াতলা'।

কলকাতার মাঝে মাঝে যেমন ফাঁকা জায়গা ছিল এবং সেখানে বসতি শুরু হলে নাম দেওয়া হত 'তলা', তেমনি পুকুর ডোবা গেড়েও অনেক ছিল। বসতি করবার জন্যে মাটি প্রয়োজন হত, সে কারণে বসতির কাছে ডোবা গেড়েও গজিয়ে উঠত প্রচুর। (আমি বাল্যকালে গোয়াবাগানের ঘনবসতির মাঝখানেও ডোবা গেড়ে দেখেছি।) বড়ো সাইজের জলাশয় হলে তার ধারে ধারে যে বসতি হত তার নামে 'পুকুর' শব্দটি যুক্ত থাকত। হয়ত দু' একটি ছাড়া (?) এমন পুকুরের অস্তিত্ব কবে বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু নামটি যায়নি। অঞ্চল নাম হিসেবে শুরু হলেও রয়ে গেছে রাস্তার নামে। যেমন 'শ্যামপুকুর', 'কাঁটাপুকুর,' 'ফড়েপুকুর,' 'ঝামাপুকুর,' বেনেপুকুর,' 'চুনোপুকুর,'। এই সঙ্গে 'কারবালা ট্যাঙ্ক'ও যোগ করতে হবে। 'মারাট্টা ডিচ'ও নিতে হবে।

কেনাবেচার সহর কলকাতার 'বাজার' নামযুক্ত অঞ্চল-গুলি মোটেই অপ্রধান নয়। এ নামের অঞ্চলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হলো 'বড়বাজার'। 'বাজার' যুক্ত নামগুলি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর নামের প্রথম অংশটি ব্যক্তিনাম অথবা পদবী ধরনের।

'টেরিটি বাজার'—Tirett সাহেবের বাজার, 'বউবাজার'—Bow সাহেবের বাজার, 'জানবাজার'—John সাহেবের বাজার, 'চীনেবাজার'—যেখানে চীনেরা কারবার করে, 'রাজাবাজার', 'শ্যামবাজার' ইত্যাদি। অনেক 'বাজার-ওলা' নামের অস্তিত্ব তো নেই-ই, উপরন্তু কোন হদিসই মেলে না। যেমন 'রাধাবাজার'। 'লালবাজার' বোঝা যায় লালদীঘির কাছের অঞ্চল বলে। ('লালদীঘি' আসলে হল 'নালদীঘি', যে দীঘিতে প্রচুর নল-খাগড়া আছে।) 'মেছোবাজারে'র কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না মাছের বাজার বলে। 'সভাবাজার' (শোভাবাজার) নিয়ে বিতণ্ডা আছে। কেউ কেউ মনে করেন রাজা নবকৃষ্ণের কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এখানে যে বিরাট বাজার বসেছিল তারই পরিণতিতে এই নাম। যাই হোক আপাতত নবকৃষ্ণের রাজসভা-ঘটিত নাম বলে নিলে দোষ নেই। 'বাগবাজার' হল আসলে 'বাঁকবাজার' (বা বাঁকিবাজার, তুলনীয় বিহারে 'বাঁকিপুর')। এখানে নদী বাঁক ফিরেছে। ওপারে ঘুসুড়ির টেঁক।

সহরে বাজার, পাড়াগাঁয়ে হাট। কলকাতা খাঁটি সহর হলেও এখানে গোড়া থেকেই হাট বসত। যে হাটে ইংরেজ কোম্পানি মাল কিনে চালান দিত। তারপর ক্রমশ এদেশে কেনার পাট কমিয়ে দিয়ে বেচার পাট বাড়াতে লাগল কোম্পানি। তাই কলকাতায় হাট এল সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে এবং অবশেষে দু-একটি অঞ্চলে নামটুকু রেখে দিয়ে বাজারের কাছে বিকিয়ে গেল। তবু যে দু-একটি নাম আছে তার থেকে আমরা

কিছু খাঁটি পুরোনো তথ্য উদ্ধার করতে পারি। 'হাটা' নিয়ে তিন চারটি নাম: গরানহাটা, গোরুহাটা, দরমাহাটা আর মুরগিহাটা। গোয়াবাগানের উত্তর গায়ে গোরুহাটা, একদা সেখানে গোরু-মোষের খুব বড়ো খাটাল ছিল এবং সেখানে গোরু-মোষ বিক্রি হত। বড়বাজারে 'দরমাহাটা'য় একদা 'দরমা' অর্থাৎ চাঁচ, চিক্, ঝুড়ি প্রভৃতি পেতে বাঁশের তৈরি জিনিসের হাট বসত। চীনেবাজারের সংলগ্ন মুরগিহাটায় অবশ্যই ব্যাপারীরা মুরগি বেচতে আসত। এখন এখানে নানা রকম মনোহারি জিনিসের আড়ত।

'গরানহাটা' নিয়ে কিছু বলবার আছে। চিৎপুর রোড আর বিডন স্ট্রীটের মোড়—এই অঞ্চলকে মোটামুটি বলা হয় 'গরানহাটা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'গরান' কী বস্তু বা কোন ব্যক্তি? 'গরানের খুঁটি'—এমনি প্রয়োগ থেকে মনে হয় শব্দটির সম্পর্ক ছিল আগে কাঠের সঙ্গে। তাহলে 'গরানহাটা' মানে কাঠ কাঠোরার হাট। কিন্তু গরান কি কাঠ হতে পারে? একদা এবং এখনো অ-পথ পার্বত্য অঞ্চলে বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়ি নদী পথে ভাসিয়ে আনা হত। এভাবে উত্তরবঙ্গ এবং সুন্দরবন —আসলে 'সোঁদরবন', যেখানে সুঁদরি গাছ খুব জন্মায়— থেকে কাঠের গুঁড়ি ভাসিয়ে আনা হত কলকাতায়। সেই ভাসিয়ে আনা কাঠসম্ভারই 'গড়ান' বা 'গড়ান কাঠ'। এই রকম কাঠের হাট (এবং গুদোম) ছিল যে অঞ্চলে সে অঞ্চলের নাম হয়েছিল 'গরানহাটা'। এই নামটি যে একদা কত প্রবল ছিল তার একটা গৌণ প্রমাণ পেয়েছি 'গরানহাটী'—কীর্তনঠাটের

এই বিশেষ নামটির মধ্যে। কলকাতায় গোড়া থেকেই বৈষ্ণব-ধর্মের খুব 'প্রভাব ছিল। প্রথম দিকে যে সব প্রভাবশালী বাঙালী—নবকৃষ্ণ দেব প্রমুখ, তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত। এই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই এখানে পদাবলীর বিশেষ অনুশীলন চলেছিল, বিশেষ করে মেয়ে কীর্তনীদের দ্বারা। কলকাতার মেয়ে কীর্তনীরা অনেকেই থাকতেন এই গরানহাট অঞ্চলে। তাঁদের দ্বারা কীর্তনগানেব যে বিশেষ রীতিটি—অনেকটা মেয়েলি ঢঙযুক্ত, তাই-ই পরিচিত হয়েছিল 'গরানহাটী' নামে। আসলে পদাবলী কীর্তনের এখন যে চলিত রীতি—যাকে বলা হয় গরানহাটী—তা আসলে 'কলকাত্তান রীতি' (বৈষ্ণব সাহিত্যের পণ্ডিতেরা 'গরানহাটী'র ব্যুৎপত্তির জন্যে এদিক ওদিক চারদিক হাতড়ে অবশেষ আনুমানিক 'এক গড়ের হাট' কল্পনা করে 'ক্ষান্ত আছেন। ভাগ্য ভালো যে তাঁরা 'গড়িয়া হাট'কে সনাক্ত করেন নি। অতঃপর আর করতে উৎসাহ পাবেন না আশা করি।)

গোড়ার দিকে অন্তত গড়ান কাঠের ব্যবসা করতেন মুসলমানেরা। তার প্রমাণ হচ্ছে, 'সোনাগাজী' (প্রথমে 'সোনাগাছি') অঞ্চল গরানহাটারই ঘনিষ্ঠ সংলগ্ন। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের পূজিত পীরের আস্তানা এবং মসজিদ ছিল। মসজিদের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু সোনাগাজীর কোন হদিস মেলে না—শুধু নামটি ছাড়া।

ধরে নিতে পারি গঙ্গায় কাঠ ভাসিয়ে আনা হত উত্তরবঙ্গ

ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে। উত্তরে এবং দক্ষিণে জঙ্গলভূমির প্রধান লৌকিক দেবতা হলেন বাঘঠাকুর। হিন্দুর কাছে তিনি 'সোনা রায়' (উত্তরবঙ্গে) আর 'দক্ষিণ রায় (দক্ষিণবঙ্গে)। মুসলমানের কাছেই তিনি সোনাগাজী (উত্তরবঙ্গে), আর 'কালু-গাজী' অথবা 'পীর গোরাচাঁদ' (দক্ষিণবঙ্গে)। গরানহাটার কাছে সোনাগাজীর আস্তানা ও মসজিদ যাঁরা তুলেছিলেন তাঁরা যে মুসলমান এবং উত্তরবঙ্গ থেকে আগত তা এই নাম থেকেই অনুমান করতে পারি। সোনাগাজীর কিছু দক্ষিণ-পূর্বে দরজী-পাড়ায় ছিল মুসলমানের বাস। দরজীপাড়ায়ও মসজিদ আছে। সেখানে রাস্তার নামই মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট।

কলকাতার গঙ্গাতীর মোটেই ভালো ছিল না। তাই ইংরেজরা প্রথমে উত্তরে সুতোনুটিতে পরে দক্ষিণে গোবিন্দপুরে আড্ডা গাড়ে, মাঝখানে কলকাতাকে, গঙ্গাতীর অব্যবহার্য বলে ফাঁকা রাখে। তাই সুতোনুটি ও গোবিন্দপুরের মাঝখানে 'ঘাট' দিয়ে কোন অঞ্চল নাম নেই, একটি ছাড়া। সে হল 'পাথুরে-ঘাটা'। নামটির দুটি অর্থ হতে পারে। এক, পাথরে বাঁধান ঘাট, আর, পাথরের বস্তু আমদানির ঘাট। শেষের অর্থই ঠিক বলে মনে হয়। পাথরে বাঁধান ঘাট ছিল, খানিকটা উত্তরে। সে অঞ্চল 'পোস্তা' নামে খ্যাত। সে অঞ্চল বসবাসের নয়, আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের।

বাঙালী জাতটা আবহমানকাল ধরে মাটির বুকে বেড়ে উঠেছে। তাই সে সহরে বাস উঠিয়ে আনলেও মাটির কাছাকাছি থাকতে চাইত। (এই হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ আদর্শ বাঙালী।)

তাঁরা অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ী ফাঁদতেন। তা ছাড়া সহরের বাইরেও কেউ কেউ মস্ত বাগানবাড়ী করতেন। বাঙালী ছাড়াও অন্য ধনী লোকে—যেমন পারসী, ইহুদী, ফিরিঙ্গি—এঁরাও তাই করতেন। তারপর বাড়ন্ত কলকাতার চাপে পড়ে সঙ্কুচিত কড়িপাতির মালিকেরা ধীরে ধীরে তাঁদের বাড়তি জমি ও বাগান বসতিকারীদের কাছে বিক্রি করেছেন। এইসব বাগানভাঙা বসতি ও পাড়ার নামের শেষে 'বাগান' শব্দ পাওয়া যায়। এগুলি বেশিরভাগ কলকাতার পূর্ব অঞ্চলেই দেখা যায়। যেমন, রামমোহন রায়ের বাগান-ভাঙা—বাদুড়বাগান, চালতাবাগান, হর্তকিবাগান, গোয়াবাগান, আতাবাগান, পেয়ারা-বাগান, রায়বাগান। এক পারসী ব্যবসাদারের,—পারসী-বাগান। এক ফিরিঙ্গির —অ্যান্টনিবাগান। রামতন বসুর (?) —রামবাগান। সভারাজাদের দেবগোষ্ঠীর,—হাতিবাগান, ফুল-বাগান, হালসিবাগান (মানে, হাড়গিলাবাগান), শিকদারবাগান, রাজাবাগান। জানবাজারের কাছে রানী রাসমণির স্টেটের, কেরানিবাগান ইত্যাদি। পটুয়াটোলার কাছেই পটুয়ার বাগান। ইংরেজী বানানের প্রভাবে এখন হয়েছে 'পটোয়ার বাগান'।

দু-চারটি বড়ো নাম এমনিই বোঝা যায়। যেমন, 'পটল-ডাঙা'। যেখানে পটলের চাষ হত। পটল চাষে মুসলমান চাষীরাই বিশেষ পোক্ত। এখনও তাই। তার কিঞ্চিৎ প্রমাণ হল কাছাকাছি দুটি মসজিদ আর দুটি পথ নাম, মির্জাপুর স্ট্রীট আর মীরজাফর লেন। 'বৈঠকখানা' বোঝাও সহজ, তবে কার বৈঠকখানা এখানে ছিল তা বলা শক্ত।

বাগানের প্রসঙ্গে 'কলাবাগান'-কে ধরিনি—কেন না, নামটির সঙ্গে কলার সম্পর্ক নেই, বাগানেরও নয়। এটি হল ফারসী 'কলাবাগ' (মানে, যে মুদ্রা জাল করে) শব্দের বহুবচন।

কলাবাগান ও মেছোবাজারের উত্তরে 'ঠনঠনে'। কবি-কঙ্কণের কাব্য থেকে জানতে পারি যে সেকালে বাঁদর নাচিয়ে ও বাজীকরদের বলত 'ঠনঠনিয়া'। এই অঞ্চলে তাদেব আড্ডা ছিল মনে করতে দোষ কী ?

ঠনঠনের উত্তরে 'চোরবাগান'। চোর ছেঁচড়দের বস্তি, বাঁদর-নাচিয়ে বাজীকরদের বস্তির পাশাপাশি হওয়াই স্বাভাবিক।

চোরবাগানের উত্তরে 'সিমলে'। এই নামটি নিয়ে একটু বিশেষ আলোচনার অবকাশ আছে। এটি বাংলাদেশের বিশিষ্ট-তম গ্রাম নাম। দেশের সব জেলাতেই খুব কম গোটা তিন-চার করে সিমলে, সিমলা, সিমুলিয়া নামে গ্রাম আছে। খাস কলকাতার মধ্যে এই একটি মাত্র অঞ্চল যেটি গ্রাম নাম বলেই প্রসিদ্ধ। কেন এমন হল, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় যে কলকাতা পত্তনের গোড়ার দিকে, কিংবা হয়ত তারও আগে সুতানুটির পাশে এই অঞ্চলে বসতি শুরু হয়েছিল সুতরাং সিমলেকে বলতে পারি নিউক্লিয়ার কলকাতা।

খিদে পেলে কলকাতা

শংকর

"পেটে খিদে, জিভে স্বাদ এবং পকেটে পয়সা থাকলে ক্যালকাটার মত শহর পৃথিবীতে নেই। দরকার হলে ইউ-এন-ওতে গিয়ে বুক ফুলিয়ে গলা ফাটিয়ে স্টেটমেণ্ট দিয়ে আসতে পারি।"

কোটেশন বইতে স্থান পাবার মতো এই মন্তব্যটি পটলদার। খানাপিনার ব্যাপারে পটলদার বলবার এক্তিয়ার আছে। কারণ বেশ কয়েকবার কারণে অকারণে তিনি ফরেন ঘুরে এসেছেন এবং মূল্যবান জীবনের অবশিষ্ঠ সময় তিনি কলকাতার খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ, ক্লাব এবং হোটেল চষে বেড়াচ্ছেন।

পটলদাই আমাকে বলেছেন, "খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ফরাসীদের এত নাম ডাকের কোন যুক্তি নেই। প্যারিসের কিছু রইস লোক ভালমন্দ খানাপিনা নিয়ে মাথা ঘামায় বটে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে খেয়ে ফতুর এবং খাইয়ে ফতুর শহর একটাই আছে—এবং তার নাম ক্যালকাটা।"

দাঁতে কাঠি ঢুকিয়ে ঈষৎ বিরক্ত পলটদা মন্তব্য করলেন। "বিশ্বাস হলো না বুঝি? পৃথিবীর অন্য কোন শহরে কোন্

আড়াইশ টাকা মাইনের কেরানি মেয়ের বিয়েতে আড়াইশ লোকের ডিনারের ব্যবস্থা করে এবং কী সে মেনু। পটল ভাজা থেকে পান পর্যন্ত দিশি বিলিতি ঝাল নোনতা টক মিষ্টি পদের লিস্টি দেখলে বিদেশের শেরাটন হিলটন, এস্টোরিয়া হোটেলের ব্যাংকোয়েট ম্যানেজার পর্যন্ত ভিরমি খাবে।"

পরে কাঠিটা দাঁতের ফাঁকে পুরে দিয়ে পটলদা 'ওপেন চ্যালেঞ্জ' করে ছিলেন। "কলকাতা ছাড়া ওয়ার্লডের কোন্ খানদানি শহরের নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকেরা ছেলের ভাত এবং বাবার শ্রাদ্ধে ভুরি ভোজনের জন্যে নিজের ইজ্জত, আপিসের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং বউয়ের গয়না বাঁধা দিয়ে কাবলে অথবা কো-অপারেটিভ থেকে হাসিমুখে টাকা ধার করতে পারে?"

একটু থেমে পটলদা বললেন, "আরও দুটো ইমপটেণ্ট স্টেটমেণ্ট লিখে নে। পৃথিবীর আর কোন শহরে এতো প্রফেশনাল হালুইকর নেই, যারা কেবল ভোজবাড়িতে লুচি মাংস মণ্ডা মেঠাই বানিয়ে জীবন ধারণ করে। ওয়ার্লড ব্যাংকের ম্যাকনামারা সায়েবকেও চ্যালেঞ্জ করছি—তিনি আর একখানা শহরের নাম করুন যেখানে এত মিষ্টির দোকান আছে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টরণ্টো, টোকিও, পিকিং, মস্কো যার সাহস আছে এগিয়ে আসুক—এই পয়েণ্টে লড়ে যাক আমাদের মেট্রোপলিটান কলকাতার সঙ্গে।"

পটলদা দুঃখ করে বললেন, "আগে বলতো প্রাসাদপুরীর কলকাতা—এখন বলা উচিত 'মিষ্টি শহর কলকাতা, মিষ্টি মুখের

শহর কলকাতা।' জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের যেমন প্যারিস ও ব্যংককে যাওয়ার মানে হয় না ; তেমন যেসব বিদেশীর মিষ্টি খাওয়া বারণ কলকাতা তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ শহর।" আরও একটা পয়েন্ট লিখে নে, হুকুম করলেন পটল দা। "বিলু বলে এক সাহেব ছোকরা বাল্য বয়সে পাদরী বাবার সঙ্গে কলকাতার কাছে থাকতো—এখন বিশ্ব ব্যাংকে মস্ত চাকরি করে। টাকা ধার দিতে এসে তিনি কলকাতাকে ইনসাল্ট করে গেলেন। বিলুবাবু কাগজের লোকদের বলেছেনঃ কলকাতার সন্দেশ তেত্রিশ বছর আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমন আছে—একটুও খারাপ হয় নি।

বলবার কায়দাখানা দ্যাখ! যেন ক্রমশ খারাপ হয়ে যাওয়াটাই ক্যালকাটার ধর্ম! আগের দিনকাল থাকলে কলকাতা বন্‌ধ ডাকতাম এর প্রতিবাদে। বিলুবাবুকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে মদের থেকেও কঠিন সাবজেক্ট এই সন্দেশ। অন্নপ্রাশন থেকে মুখাগ্নি পর্যন্ত সত্তর আশি বছর ত্রিসন্ধ্যা সন্দেশ সম্ভোগ করেও এই সাবজেক্টের কূলকিনারা পাওয়া যায় না। কলকাতার সন্দেশ সম্বন্ধে আনাড়িদের মন্তব্যের কোনো মূল্য নেই। পটলদা বললেন এইবার আসল পয়েন্টখানা লিখে নেঃ গত তেত্রিশ বছরে কলকাতায় সন্দেশের মান রীতিমত উন্নত হয়েছে। বিশ্বাস না হলে বিশ্বব্যাঙ্ক জনা দশ-বারো নিরপেক্ষ প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিক—হাতে-নাতে (জিভে জিভে?) প্রমাণ দিয়ে দেবে।

"খাবার ব্যাপার নিয়ে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হওয়াটা ঠিক

আর্টিস্টিক নয়।" আমি পটলদাকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, "আমাদের শহরের টপ লোক যাঁরা, তাঁরা চিরকাল খাবার ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন, ঘামাচ্ছেন এবং ঘামাবেন। উদাহরণঃ স্বামী বিবেকানন্দ, স্যর আশুতোষ মুখুজ্যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অমন যে অমন সত্যজিৎ রায়—তুলি ধরেন, ক্যামেরা চালান, কলম পেষেন, তিনিও সন্দেশ, সমঝদার এবং হাজার কাজের মধ্যেও এ বছরেই তিনি এক নতুন ধরনের সন্দেশ ডিজাইন করেছেন, অপূর্ব নাম দিয়েছেনঃ ডায়ামণ্ডা। নামটা রেজিস্ট্রি করিয়ে নিলে ভদ্রলোক লক্ষ লক্ষ টাকা রয়ালটি পেতে পারতেন —কিন্তু মিষ্টান্ন প্রেমিকের স্বভাবসিদ্ধ কলিকাতাকে উদারতায় অমূল্য আবিষ্কারটি তিনি জাতিকে দান করেছেন।"

পটলদা দুঃখ করলেন "এক এক সময় খবরের কাগজ পড়লে চোখে জল এসে যায়। কলকাতা থেকে আজকাল নাকি এরোপ্লেনে আইসক্রিম রপ্তানি হচ্ছে। কিন্তু কোথা সন্দেশ রসগোল্লা আর কোথায় আইসক্রিম। সমস্ত দেশের বিদেশী মুদ্রা সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় কাঁচের শোকেশের পিছনে থালায় থালায় সাজানো রয়েছে অথচ সেদিকে আমরা নজর দিচ্ছি না।"

গভীর আগ্রহে আমি নোট বই বার করে ফেললাম। পটলদা বললেন, "লিখে নে। ঠিক মতো বুদ্ধি খাটিয়ে কলকাতার সন্দেশ রপ্তানি করতে পারলে আমাদের কোন দুঃখই থাকবে না। যদি জাপানীদের কাছে সন্দেশের নো-হাউ থাকতো তাহলে এত

দিনে দেখতিস কি হতো। স্রেফ কোটি কোটি ডলার, মার্ক, ফ্রাঁ আসতো এই ক্যালকাটা সন্দেশের বিনিময়ে।”

প্রস্তাবটা আমাকে মোটেই উৎসাহিত করছে না সন্দেশ প্রেমিকদের পক্ষ থেকে পটলদাকে বললাম, “সে তো টন-টন সন্দেশের ব্যাপার, পটলদা! ফরেনের লোকরা তো চিংড়ি মাছের বারোটা বাজিয়েছে; বাঙালী আজ সত্যিই চিংড়ি মাছের কাঙালী। একবার কলকাতার সন্দেশের দিকে বাণিজ্য মন্ত্রীর নজর পড়লে আমরা কি কেবল ভেজাল গজা এবং সাপের চর্বিতে ভাজা ঝিলিপি খেয়ে জীবন কাটাবো?”

স্মিত হাসিতে মুখ ভরিয়ে পটলদা বললেন, “কিছু ভাবিস না। আমিও স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত—কচুরি জিলিপি গজা ইত্যাদি ঘিয়ে ভাজা মেঠাই যে কলকাতার অধঃপতন ঘটাবে তা আশি নব্বই বছর আগেই ভদ্রলোক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু আমি ক্যালকুলেট করেছি—কলকাতার সন্দেশ একবার এক্সপোর্ট শুরু হলে, ওয়ার্লড ডিমাণ্ড মেটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন রয়ালটির বিনিময়ে সন্দেশ তৈরির টেকনিক্যাল নো-হাউ আমরা বিদেশে ভাড়া খাটাবো। কলকাতার অলিতে-গলিতে ময়রা দোকানের ছোকরা কারিগর গুলোকে টেকনিক্যাল ডিরেকটর নাম দিয়ে মাসিক হাজার পনেরো টাকা মাইনেতে ফরেনে পোস্টিং দেবো। খুব সোজা হিসেব। তোমার দুধ, তোমার চিনি আর আমাদের সন্দেশ তৈরির নো-হাউ। সন্দেশ পিছু আমরা দুই ইউ এস সেন্ট রয়ালটি চার্জ করবো।” এরপর হুড় হুড় করে মৌখিক অঙ্ক

কষে গেলেন পটলদা। বললেন, "একখানা সন্দেশের দাম যদি পঁচিশ সেণ্ট হয় এবং প্রত্যেক আমেরিকান যদি সপ্তাহে একখানা সন্দেশ খায় তাহলেই বছরে রয়ালটি বাবদ আমাদের রোজগার হবে অন্তত টু হানড্রেড মিলিয়ন ডলার।"

মিলিয়ন, বিলিয়ন, ডলার, ইয়েন, এই সব শুনলে আমার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। পটলদা মৃদু ভৎর্সনা করলেন। "সে বললে তো চলবে না, কলকাতার সন্দেশ হল পৃথিবীর সেরা—কোনো ব্যাটার ক্ষমতা নেই এরকম ওয়ার্ক অফ আর্ট তৈরি করে। গাঙ্গুরাম, সেনমশায়, ভীম নাগের বাৎসরিক বিক্রি জেনারেল মোটরস থেকে কম হবার কোনো যুক্তিই নেই।" এবার করজোড়ে নিবেদন করলাম, "পটলদা, খানাপিনার ব্যাপারে কলকাতার অধঃপতনের কারণ কি?"

"খানাপিনার অধঃপতন মোটেই হয়নি। তবে খানাপিনা অবহেলা করায় কলকাতার অধঃপতন হয়েছে"। তৎক্ষনাৎ উত্তর দিলেন পটলদা। "গুণের সমাদর করতে আমরা কলকাতার লোকরা তো তিনশ বছরেও শিখলাম না। লণ্ডন, শিকাগো, সানফ্রানসিসকোর সায়েবরা সার্টিফিকেট না-দেওয়া পর্যন্ত আমরা তো রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকেও পাত্তা দিতে চাইনি। যদু মধুর নামে কলকাতায় রাস্তা রয়েছে, কিন্তু দ্বারিক, নবীন ময়রা, নকুড়, নিজামের স্মৃতিতে একটা কানাগলিও নেই। যে লোকদের নামে বড় বড় রাস্তা তাঁরা উকিল মোক্তার ডাক্তার মাস্টার না হয় স্রেফ ব্যবসাদার। ওঁদের নিয়েই থাক তোরা। মন্ত্রীদের ধ দিয়ে রেশন কার্ড করিয়ে ম্যাকনামারা কলকাতায়

পাকাপাকি বসবাস করলেও তোদের উদ্ধার করতে পারবেন না।"

পটলদা দুঃখ করলেন, "আইন করে সরকারী টাকায় তোরা মনুমেণ্ট এবং ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি রক্ষে করছিস। কিন্তু তোদের উচিত, কলকাতার কিছু বিখ্যাত খাবারের দোকান এবং রেস্তোরাঁকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা। সত্যিকারের ইনস্টিটিউশন অফ ন্যাশনাল ইমপর্টান্স বলতে কলকাতায় কয়েকটা খাবারের প্রতিষ্ঠান আছে। তুই কি জানিস কলকাতায় এখন মদের দোকান আছে যা এক নাগাড়ে পলাশির যুদ্ধের বছর থেকে চলে আসছে? বিবেকানন্দ যে রেস্তোরাঁয় চা খেয়েছেন, যে দোকানের কড়াপাক সন্দেশ টপাটপ মুখে পুরতে পুরতে স্যর আশুতোষ ওয়ার্লডের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় চালাতেন, সুভাষ বোস যে দোকানে বসে ডাবের সরবত খেতে ভালবাসতেন, রবীন্দ্রনাথ যেখানে বসে চাইনীজ মিকসড স্যুপ উপভোগ করতেন। শেয়ালদায় যে পাইস হোটেলে চেটেপুটে হেনরি কিসিংগার ভাত খেয়েছিলেন, সেসব দোকান এখনও চলছে। অথচ আজও আমরা তাঁদের কোন সম্মান দিই না। পয়সা? ওরে, যারা খাবারের লাইনে আছেন তাঁরা শিল্পী, পয়সায় তাদের মন ভরে না। এক আধটা পদ্মশ্রী পদ্মবিভূষণ ওদিকে ঘুরিয়ে দিলে এদেশের ভাল ছাড়া মন্দ হবে না।" "খানাপিনার কলকাতাকে দুনিয়ার সেরা বলছেন কেন, পটলদা"? আমার প্রশ্ন।

"বলছি এই কারণে যে কন্টিনেন্টাল, চাইনীজ, মোগলাই,

নর্থ ইণ্ডিয়ান, সাউথ ইণ্ডিয়ান, ইস্টইণ্ডিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন খাবারের এমন মহামিলনক্ষেত্র দুনিয়ার কোথাও নেই। কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত খাবারের ধারা। দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে কলকাতায় হতে হারা। খাদ্যতীর্থ হিসেবে একমাত্র লণ্ডন আসতে পারে কলকাতার কাছাকাছি। কিন্তু ওখানে ডিমের ডেভিল এবং কবিরাজী কাটলেট পাওয়া যায় না। স্যর পি সি রায় আবিষ্কৃত ডাবের প্যারাগন শরবতের ফর্মুলা ওঁদের জানা নেই। প্যারিস বড় সাম্প্রদায়িক—দোকানদারগুলো মুখের ভাব এমন করে বসে থাকে যেন পৃথিবীতে আর কোন স্কুল অফ কুকিং নেই। নিউ ইয়র্কে হরেক রকম খাবার পাওয়া যায়—কিন্তু মোগলাই খানা খুবই পুওর, মাছের ঝোলভাত তো স্বপ্ন।" তাছাড়া ন্যাশনাল দেশ বলতে যে দেশে হটডগ বোঝায় সে দেশ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না-করাই যুক্তিযুক্ত। টোকিও? একটা শহরেই দশ হাজারের বেশী বার আছে, এমন রেস্তোরাঁ আছে যেখানে একখানা লাঞ্চে হাজার তিনেক টাকা লাগবে। কিন্তু রান্নাবান্নার ব্যাপারে এখনও মধ্যযুগের অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। সভ্য হতে সময় লাগবে।" "বম্বে, দিল্লী?"

অসতর্ক অবস্থায় আমার মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে যেতেই বিরক্ত হলেন পটলদা। বললেন, "সমুদ্রের ওপর পাথর ফেলে চল্লিশ পঞ্চাশতলা হোটেল বিলডিং বানালেই রান্নাবান্না শেখা যায় না! একমাত্র বোম্বাইতেই এমন আসীরি রেস্তোরাঁ আছে যেখানে মেনু কার্ডে খাবারের দাম লেখা থাকে না। টাকা কামড়ে খাব্বার সাধ হলে ওখানে যাও। অতো ধনী শহর, কিন্তু

আমাদের ফ্লুরির মতো একখানা কেক বা পেসট্রি কিনিস তো। রসিকরা বলেন, পার্ক স্ট্রীটের ফ্লুরির মতো এমন মাননীয় কনফেক-শনার এখন ভু-ভারতে নেই।" মাথা চুলকে পটলদা এবার দিল্লী আক্রমণ করলেন। "গণ্ডায় গণ্ডায় হোটেল বাড়ি ওখানেও উঠেছে। বোকা সায়েবগুলো হাজারে হাজারে ওখানে ভিড় করে। মোগলাই খানার এখনও বারোটা বাজেনি। কিন্তু চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি হবে কি করে? খোদ রাজধানীতে চাইনীজ ফুলেরও যা অবস্থা।"

প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে গেলাম, "পটলদা, এখন দিল্লী বড় বড় হোটেলে খুব ভাল চাইনীজ রেস্তোরাঁ হয়েছে।" কিন্তু পটলদা পাত্তাই দিলেন না, বললেন, "রাখ রাখ। আমাদের নানকিং কিংবা ওয়ালডর্ফের সঙ্গে লড়তে ওদের এখনও একশ বছর লেগে যাবে। মুরোদ থাকে তো আমাদের হাউ হুয়া এবং চাঙ্গুয়ার সঙ্গে ওরা লড়ে যাক। একমাত্র দুঃখের বিষয় ব্রেন ড্রেন শুরু হয়ে গিয়েছে।—কলকাতার হীরের টুকরো চীনে ছেলেগুলো পেটের দায়ে বোম্বাই, বাঙ্গালোর, দিল্লীতে চাকরি নিচ্ছে। সন্দেশ রপ্তানি করে আমাদের অবস্থা একটু ভাল হোক, তখন এদের সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনবো। এটা জেনে রাখ, চীন এবং ফার-ইস্টের বাইরে যদি কোথাও চাইনীজ খেতে হয় সে আমাদের এই কলকাতায়।"

"কন্টিনেণ্টাল খাবার?" আমার প্রশ্ন শুনে পটলদার মুখ বেদনায় ভরে উঠলো। বললেন, "স্বাধীনতার পরে তিনটি সবচেয়ে দুঃখজনক খবর হলো: গান্ধী হত্যা, চীনের সঙ্গে 'সংঘর্ষ

এবং চৌরঙ্গীর ফারপো রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাওয়া। যতদিন ফারপো ছিল ততদিন কলকাতাই ছিল ইণ্ডিয়ার খাদ্য রাজধানী। তবে এখনও আমাদের স্কাইরুম আছে। পুরনো ফারপোর এক বুড়ো অফিসারের মুখে শুনেছি, ফারপো ঘরানার আস্বাদ এখনও স্কাইরুমে পাওয়া যায়। আর যদি মার্চেণ্ট আপিসের কোনো ভাগ্যবানকে পাকড়ে তাঁর অতিথি হয়ে বেঙ্গল ক্লাবে যেতে পারিস তাহলে তো কথাই নেই, কণ্টিনেণ্টাল ডিশের কুম্ভমেলা। এটা মনে রাখবি, লণ্ডনের বাইরে সবচেয়ে সাহেবী শহর বলতে খোদ সায়েবরাও এখনও কলকাতাকেই স্বীকার করেন। টালি, রয়াল, বেঙ্গল ইত্যাদির মতন 'কোই হ্যায়' ক্লাব এখন পৃথিবীর কোথাও এমন কি বিলেতেও নেই। উঁচু পাঁচিলের আড়ালে এখানে আট দশ প্রজন্মের ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে আছে—এখানকার বয় বাবুর্চিদের চলন-বলন এবং খাবারের স্বাদই আলাদা। এক এক ক্লাবের এক একটা ডিশ জগদ্বিখ্যাত—কোথাও সিজলার, কোথাও কোল্ড বুফে, কোথাও ফিস অ্যাণ্ড চিপ্‌স। এসব ঠিকমত জানতে হলে পুরো একটা জীবনই কেটে যাবে। কলকাতার ভাগ্যে তো একজন এগন রনে জুটলো না!"

"তিনি আবার কে?" আমি চক্ষু বিস্ফারিত করি।

"হোটেল নিয়ে নবেল লিখেছিস, শাজাহান হোটেলে কাজ করেছিস না। কিন্তু মহাত্মা এগন রনের নাম জানিস না।" দুঃখ করলেন পটলদা। "প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। বিলেতে কোন্ খাবারের দোকানে কী পাওয়া যায় তার ওপর সমস্ত জীবন ধরে রিসার্চ করে চলেছেন, প্রতি বছর তাঁর 'এগন রনের ডানলপ

গাইড' বার হয়—রসিক জনেরা হুমড়ি খেয়ে হাজার হাজার কপি কিনে নেন। কলকাতার জন্য এ রকম একখানা এগন রনে গাইড বিশেষ দরকার। যাতে বই খুললেই জানা যায় তাল শাঁস সন্দেশ এখন কোন দোকানের সেরা ; মিঠাইয়ের কাঁচা-গোল্লার সঙ্গে গিরিশের কাঁচাগোল্লার কী তফাৎ, পার্কস্ট্রীটের কোন দোকানে ভেটকি মেয়নিজ এখন টপ!" এই মহাত্মা কবে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করবেন জানি না। ইতিমধ্যে পটলদার মতো লোকের মৌখিক উপদেশের ওপর আমাদের কাজ চালাতে হবে। পটলদা বললেন, "বাইরে থেকে অতিথি আসবার সম্ভাবনা থাকলে তাঁকে শুক্রবারটা ফ্রি রাখতে বলবি। শুক্রবারে কলকাতার ক্লাবে, হোটেলে, রেস্তর াঁয় ভরা পূর্ণকুম্ভ মেলা। সেদিন লাঞ্চে স্পেশাল মেনু, স্পেশাল ভিড়। স্পেশাল টেবিলগুলো অনেক আগেই বুক হয়ে থাকে। লাঞ্চ খেতে খেতে কর্তাব্যক্তিদের ঘড়ির কথা মনে থাকে না। মারো গলি ঘড়িতে, থ্রি পি এম তো কী হয়েছে? হ্যায় খিদ-মতগার, জলদি করো, হুইস্কি-সরাব ব্রাতি পানি লে আও।"

শুক্রবারের এই চূড়ামণিযোগ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে। সেকালে শুক্রবারে নাকি চাঁদপালঘাট থেকে বিলেতের জাহাজ ছাড়তো। ক্লাইভ স্ট্রীটের আফিসে সকালবেলা পর্যন্ত ধস্তাধস্তি করে হোমের চিঠিপত্তর লেখা শেষ করে 'বক্স-ওয়ালা' সায়েবরা ক্লান্ত হয়ে পড়তেন এবং কাজের লেঠা চুকিয়ে দু'দণ্ড শান্তির জন্যে স্পেনসেন অথবা উইলসনস হোটেলে ছুটতেন। যে তিন সেন গেরস্ত বাঙালীর জাত নষ্ট করেছিল

তা হলো ইস্টি সেন, কেশব সেন এবং উইলসেন। শেষোক্ত উইলসেনই এখনকার গ্রেট ইস্টার্ণ—সরকারী সহৃদয়তায় যা আবার কল্লোলিনী হয়ে ওঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। "খানা-পিনার ব্যাপারে আমাদের এখন পোজিশন কী?" পটলদাকে আমি জিজ্ঞেস করি।

ঠোঁট উলটে পটলদা বললেন, "পিনার ব্যাপারে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। এ শহরে এখন ককটেল মানে কেবল হুইস্কি ফায়ার ওয়াটার সেবন। ফরেন মাল সামান্য কিছু আছে কিন্তু দাম তালগাছেব ওপর উঠে বসে আছে। এশিয়ার প্রাচীনতম হোটেল আমাদের এই শহবেই বয়েছে, কিন্তু তার সেই রমরমা নেই। দিল্লী, বম্বে এমন কি মাদ্রাজ পর্যন্ত যখন তারায় তাবায় ভরে উঠছে, তখন কলকাতায় পঁয়ত্রিশতলা দেশলাই বাক্স হোটেল বানালেই ফুডের আভিজাত্য হয় না। খানার ব্যাপারে এখনও "হোয়াট ক্যালকাটা ইটস টু ডে ইণ্ডিয়া ইটস টুমরো।"

পটলদা আরও শোনালেন, "কেউ কেউ বলেন, কলকাতার অনেক নামকরা খাবারের দোকান নাকি তেমন সাজানো গোছানো নয় এবং বেশ নোংরা। আমার উত্তর ভাল খাবার-ওয়ালা ভাল রান্না ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাবার ফুরসত পান না। এইসব আর্টিস্ট লোক পাবলিসিটির তোয়াক্কা রাখেন না। চেনা বাউনের পৈতে লাগে না, চেনা ময়রার গেঞ্জির ওপর পাঞ্জাবি চড়াতে হয় না, চেনা কাবাবওয়ালার লুঙি ছেড়ে ইউনিফর্ম পরতে হয় না, চেনা চাইনীজ দোকানে মেয়ে গাইয়ে বসিয়ে খদ্দের জমাতে হয় না। রান্নার রহস্যটি

যদি তোমার জানা থাকে তাহলে বিলেত, আমেরিকার থেকে নেমে রসিকজনরা পায়ে হেঁটে চীনেপট্টি, চিৎপুর অথবা সত্য-নারায়ণ পার্কের গলিঘুঁজিতে তোমার দোকান খুঁজে বার করবে।"

বলতে বলতে গভীর ভাবে বিভোর হয়ে পটলদা চোখ বুজে ফেললেন। বললেন, "কলকাতার খানাপিনার যারা বদনাম করে তারা জেনে রাখুক একমাত্র এখানেই এমন দোকান আছে যেখানের বেঞ্চিতে দশ মিনিটের বেশী বসা বারণ, এমন রেস্তোরাঁ আছে যেখানে ঝাঁপ খোলবার আগে খদ্দের লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যেখানে মেনু সিলেকশনের স্বাধীনতা খদ্দেরের নেই। মালিক বলেন, আমার দোকানে এসেছেন আমি ঠিক করবো আপনি কি খাবেন?

পটলদার একমাত্র দুঃখ এলিয়ট রোডের 'সুরুচি' ছাড়া বিলিতী স্টাইলে বাঙালী ছানার রেস্তোরাঁ একটাও নেই। পটলদার ইচ্ছে টরিস্টদের জন্যে কলকাতার একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁ চালু হোক সেটা দূর থেকে দেখলে কুঁড়েঘর মনে হবে। দোকানে ঢুকবার মুখে থাকবে লাউগাছের মাচা, লাউডগা হাতে সরিয়ে অতিথিকে ভিতরে ঢুকতে হবে। সেখানে ওয়াশ বেশিল থাকলেও একটি লোক জগ থেকে হাতে জল ঢেলে দেবে। প্রতি টেবিলে কয়েকটি হাত-পাখা থাকবে, এবং কলাপাতার উপর গরম ভাতে সোনালী গাওয়া ঘি ঢালতে ঢালতে এবং বাঁ হাতে পাখার হাওয়া করতে করতে ধবধবে সাদা থান পরিহিতা শুভ্রবেশিনী বিধবা খাঁটি বাংলায় বিদেশীকে সস্নেহে জিজ্ঞেস

করবেন, "আর কি দেবো বাছা? শুকতো? না মূলো ঘণ্ট?" আমি হাসি চেপে রাখতে পারিনি। তাই দেখে পটলদা বলে-ছিলেন, "হাসিস না। জাপানীদের মতো বিজনেশ বুদ্ধি থাকলে এই রকম রেস্তোরাঁ করেই আমরা লাল হয়ে যেতাম।"

"বিশ্বাস হলো না বুঝি?" পটলদা আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। "তবে শোন বিশ্বজোড়া এক কোম্পানি মালিকের আদরের কনিষ্ঠ পুত্র একবার ইণ্ডিয়াতে এসেছিলেন।

"বম্বে, দিল্লীর অনেক পাঁচতারা, ছ' তারা হোটেলের খানা খাওয়ার পরে তিনি হাজির হলেন আমাদের কলকাতায়। এয়ার কণ্ডিশন বার-এ সমস্ত দিন কলকাতা ঘুরিয়ে সায়েবকে এলিয়ট রোডের স্থরুচিতে বেগুন ভাজা, আলুপোস্ত আর মাছের ঝোল খাইয়েছিলাম। বেঙ্গলী ডিশ সায়েবের ভাল লাগছে দেখে সাহস করে লাস্ট মোমেণ্টে এক ডিশ ছ্যাঁচড়ার অর্ডার দিলাম। ওয়ার্লড ট্যুর শেষ করে দেশে ফিরে গিয়ে ছোকরা লিখেছিল, পৃথিবীর সব জায়গায় যত খাবার খেয়েছি ভুলে যেতে পারি, কিন্তু চিরদিন মনে থাকবে স্থরুচি হোটেলের সেই স্পেশাল ডিশ। সামনের শীতে আমার বাবা যখন ইণ্ডিয়াতে যাবেন, তখন অবশ্যই তাকে 'চ্যানচারা' খাইও।"

কলকাতার বেগম

অতুল সুর

ময়ূরের মতন পেখম মেলে, দুর্দান্ত দাপটের এই শহরের সামাজিক জীবনে বিজয় নাচন নেচে গেছে 'কলকাতার বেগম' অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে, চার চারবার বিয়ে করে, ও ছয় সন্তানের জননী হয়ে, এই মহিলা বেঁচে ছিলেন ৮৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত। কোনদিন নিভে যেতে দেন নি তাঁর জীবনের রঙিন আলো। স্তব্ধ হতে দেন নি তাঁর সবুজ মনের গতি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আসর সাজিয়ে গেছেন তিনি তাঁর গঙ্গার ধারের প্রাসাদোপম বাড়ির বৈঠকখানায়। দেশী কায়দায় বিছানো ফরাসের ওপর তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে গল্প করতেন তাঁর রামধনু রঙে রাঙানো দীর্ঘ জীবনের কাহিনী। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতো কলকাতার বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা। আদর-আপ্যায়নের তিনি ছিলেন প্রতীক। সকলের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন ভালবাসা, সম্মান ও মর্যাদা। কলকাতার লোক যে তাঁকে কতটা ভালবাসত তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর সময়ে। তাঁর শবানুগমন করে ছিলেন কলকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কলকাতা কাউনসিলের সদস্যবৃন্দ, সুপ্রিম

কোর্টের জজেরা, এমন কি ছ' ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে আনুষ্ঠানিক ভাবে তৎকালীন বড়লাট। কেল্লার একদল রেজিমেণ্টও সঙ্গে গিয়েছিল। তার আগে কলকাতার ইতিহাসে কোনদিন অনুষ্ঠিত হয়নি, এমন রাজকীয়ভাবে কোন নাগরিকের শেষকৃত্য।

কলকাতার বেগম কিন্তু প্রকৃত ছিলেন না কোন নবাবের ঘরণী। বন্ধুত্ব ছিল তাঁর সিরাজের দিদিমা নানীবেগমের সঙ্গে। তিনি তাঁর মজলিসে বসে খোস গল্প করবার সময় কথায় কথায় উচ্চারণ করতেন নানীবেগমের নাম। সে জন্যই কলকাতার লোকেরা গুণপরিবৃত্তিতে আদর করে তাঁকে অভিধা দিয়েছিল 'বেগম'। ১৭২৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে এই মহিলার জন্ম হয় মাদ্রাজে। আর ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর মৃত্যু হয় কলকাতায়। ইংরেজ আমলের এই ৮৭ বৎসরের ইতিহাস এবং ওই সময়কালের মধ্যে কলকাতা শহরের বিরাট পরিবর্তন পরিব্যাপ্ত করেছিল তাঁর জীবনকালকে। অতীতের মূককণ্ঠকে ভাষার যাদুতে রূপান্তরিত করবার জন্য যে উপাদানের প্রয়োজন, তার অভাব ছিল না তাঁর। ক্লাইভ থেকে মিণ্টোর আমল পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে ছিল। আলিবর্দিখান ও সিরাজকে তিনি আকছার দেখেছেন। সিরাজের দিদিমা নানীবেগমের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বাঙলার লোককে সন্ত্রস্ত হতে দেখেছেন, ক্লাইভ ও ওয়াটসনের সঙ্গে সংলাপ করেছেন, হোলকার, সিন্ধিয়া ও মারাঠাদের গৌরব রবির অস্তাচল দেখেছেন, নন্দকুমারের ফাঁসি দেখেছেন, বাঙালী বড়লোকদের বাড়া দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পাল-

পরবের ঘটা দেখেছেন, ফ্রানসিসের সঙ্গে হেষ্টিংসকে ডুয়েল লড়তে দেখেছেন, নীলকুঠির পত্তন দেখেছেন, ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের মর্মান্তিক ক্রন্দন শুনেছেন, ছাপাখানার সূত্রপাত দেখেছেন, ব্যাঙ্ক ও ইনস্যুরেনস কোম্পানির প্রতিষ্ঠা দেখেছেন, শহরে ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন দেখেছেন, রাজভবন ও টাউন হল তৈরী হতে দেখেছেন, ময়দানে নূতন দুর্গ নির্মাণ দেখেছেন, এ সব ঘটনার তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। এক কথায়, মজলিশ জমাবার মত মালমশলা সব সময়ই তাঁর জিহ্বাগ্রে ছিল।

'কলকাতার বেগম'-এর দীক্ষিত নাম ছিল ফ্রানসেস্। পিতা ছিলেন মাদ্রাজ উপকূলে অবস্থিত ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড দুর্গের গভর্নর। নাম এডওয়ার্ড ক্রুক। ফ্রানসেস্ ছিল তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা। পিতাকে বৃত করতে চেয়েছিল কোম্পানি বাহাদুর মাদ্রাজের ফোর্টসেণ্ট জর্জের কুঠির গভর্নর হিসাবে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি এই পদ, বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যের কারণে। অবসর নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ইংলণ্ডে, ছেলেমেয়েদের রেখে গিয়েছিলেন ভারতে।

ফ্রানসেস্ চলে আসে কলকাতায়। উনিশ বছর বয়সে ৩রা নভেম্বর ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে বিয়ে করে তৎকালীন বাঙলার গভর্নরের ভাই কিংবা বোনের ছেলে প্যারী পারপল টেমপলারকে। এই স্বামীর ঔরসে তাঁর দুটি পুত্র হয়। কিন্তু দুটিই মারা যায় শৈশবে। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়াতেই বিধবা হন। মাত্র ন'মাস পরে ২রা নভেম্বর ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে আবার বিবাহ করেন জেমস্ আলথেন নামে এক ব্যক্তিকে। বিয়ের দশদিন পরেই মারা যায় তার

দ্বিতীয় স্বামী বসন্ত রোগে। তারপর আবার বিবাহ করেন কলকাতা কাউনসিলের জ্যেষ্ঠতম সদস্য উইলিয়াম ওয়াটসকে। এবার বোধ হয় শিখেছিলেন বাংলা ভাষা, কেননা ওয়াটস্ সাহেব ভাল বাংলা বলতে পারতেন।

এই উইলিয়াম ওয়াটসন-ই কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির অধিকর্তা নিযুক্ত হন। আলিবর্দি খান তখনও জীবিত। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা যখন কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ ও লুণ্ঠন করে, তখন সস্ত্রীক ও তিন নাবালক পুত্রকন্যাসহ (কন্যা এমেলিয়ার বয়স ছয়, পুত্র এডওয়ার্ডের বয়স চার ও কনিষ্ঠা কন্যা সোফিয়া এক বছরের শিশু) ওয়াটস্ সাহেব বন্দী হন। শ্রীমতী ওয়াটস ও তাঁর তিন সন্তানকে রাখা হয় সিরাজের দিদিমা নানী বেগমের অভিভাবকত্বে। সিরাজ যখন কলকাতা আক্রমণে ব্যস্ত, নানী বেগম তখন শ্রীমতী ওয়াটস ও তাঁর ছেলেমেয়েদের সুপ্রহরায় পাঠিয়ে দেন চন্দননগরে ফরাসীদের কাছে। চন্দননগরের ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

কলকাতা আক্রমণের পর সিরাজ যখন মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি ওয়াটস্ সাহেব ও অন্যান্য ইংরেজ বন্দীদের মুক্তি দেন। এটা নাকি নানী বেগমের আদেশেই ঘটেছিল।

পরের বছর ইংরেজরা যখন কলকাতা শহর পুনরুদ্ধার করে সিরাজের সঙ্গে একটা সাময়িক সন্ধি হয়, ওয়াটস্ সাহেবকে তখন মুরশিদাবাদের নবাব দরবারে রেসিডেন্ট করে পাঠানো হয়।

এ সময় ওয়াটস্ সাহেবকে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে মুরশিদাবাদে থাকতে হয়েছিল, কারণ ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজের আপস-মীমাংসা সম্পর্কিত আলোচনার সময় তাঁকে প্রায়ই সিরাজের রোষে পড়তে হচ্ছিল। অবস্থা বিপজ্জনক দেখে ওয়াটস্ সাহেব গোপনে মুরশিদাবাদ থেকে পালিয়ে আসেন। তারপর পলাশীর যুদ্ধ উদ্বোধন করে বাঙলায়। ইংরেজ আধিপত্যের সূত্রপাত। এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন শ্রীমতী ওয়াটস্। এ ঘটনাগুলিকেই তিনি তাঁর বর্ণালী ভাষায় বর্ণনা করে যেতেন তাঁর ক্লাইভ স্ট্রীটের অদূরে গঙ্গার ধারে অবস্থিত বৈঠকখানায়।

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ওয়াটস্ সাহেব তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে বিলাত চলে যান, এবং পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়! দীর্ঘকাল ভারতে থাকার দরুন, শ্রীমতী ওয়াটস্ রপ্ত করে ফেলেছিলেন ভারতের আচার ব্যবহার। ইংলণ্ডে তার অভাব দেখে, ইংলণ্ডে থাকতে তাঁর মন টিকল না। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। ভারতে ফেরবার আগে তিনি বিলাতে তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দিলেন ও পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন। তাঁর বড় মেয়ের ছেলেই ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৮১২ থেকে ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

৪৯ বৎসর বয়সে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় আবার বিয়ে করলেন সেণ্ট জন চার্চের অন্যতম প্রধান যাজক রেভারেণ্ড উইলিয়াম জনসনকে! বোধ হয় পাদরী সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহটা মধুর হয়নি। কেননা এর কয়েক বছর পরে পাদরী

জনসন যখন বিলাতে গেলেন, 'কলকাতার বেগম' তখন অস্বীকৃত হলেন তাঁর সঙ্গে যেতে, এবং কলকাতাতেই থেকে গেলেন।

গঙ্গার ধারে তাঁর প্রাসাদপুরীর বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বসালেন তিনি কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য এক বেশ গুলজারা আসর। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আতিথ্য সৎকার ছিল প্রশ্নাতীত। ফরাসের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়েও ক্রীতদাসীদের দ্বারা পরিবৃতা হয়ে, গড়গড়া থেকে তামাক টানতে টানতে, অভ্যাগতদের শুনাতেন তিনি পুরানো কলকাতার অজস্র রঙীন কাহিনী। সেণ্ট জন গির্জায় তখন সমাধি দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলীর কাছ থেকে তিনি অনুমতি পেয়েছিলেন যে ওখানেই তাঁর সমাধি হবে। যদিও ওয়েলেসলী চলে যাবার পর লর্ড মিণ্টোর আমলে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল, তা হলেও তিনি ওয়েলেসলী প্রদত্ত অনুমতি থেকে বঞ্চিত হন নি। সেণ্ট জন গির্জায় তাঁর সুন্দর সমাধি স্তম্ভের ওপর লেখা আছে—'The oldest British resident in Bengal universally beloved respected and revered.'

ডালহৌসি

আনন্দ বাগচী

চারখানা ইস্পাতের ধারালো রেখা বিপরীত বৃত্তে ঘুরে গিয়েছে লালদিঘিকে এক চক্কর। ট্রাম লাইন। হরেক রকম যানবাহন নয়, বাস আর মোটর-ট্রাম-ট্যাক্সিতে সরগম এই চতুর্ভূজ রাস্তা; যার পুব গায়ে স্টিফেন হাউস, পশ্চিমে জি. পি ও., উত্তরে রাইটার্স বিল্ডিংস আর দক্ষিণে ডেড লেটার অফিস, টেলিফোন ভবন, কত কী। ওটা আবার অক্টোপাস, আটটি রাস্তা রয়েছে এ থেকে বেরোবার। চার কোণায় চারটি এবং প্রতি দিকে একটি করে।

বিচিত্র চরিত্র এই ডালহৌসি স্কোয়ারের। বইয়ের দোকান থেকে বন্দুকের দোকান পর্যন্ত এখানে আছে। পিছনে স্টক এক্সচেঞ্জ। সামনে রয়েছে দাবার ছক পেতে বিরাট বিরাট অফিস। গজ-বাজী-নৌকো, রাজা-মন্ত্রা-বড়ে, সবাই আছেন।

এক্ষুনি হাইকোর্ট দেখাচ্ছি না, সেটা রয়েছে একটু পিছন আড়ালে। তবে উঁকি-ঝুঁকি মারলে লাট-ভবন নজরে পড়ে বইকি! আটতলা টেলিফোন ভবন, চোখে না পড়ে উপায় নেই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ! বেকার ভাগ্য-বিধাতা। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সামনে খবরের কাগজ পেতে বসেছে গণক ঠাকুরের দল। জায়গাটি ঠিকই বেছেছে। বোর্ড আর ইউনিভার্সিটি প্রতি বছর যে লাখ খানেক করে ছেলে ছাড়ছেন বাজারে, তাদের ফেটলাইন একদা এই ডালহৌসি স্কোয়ারের উপর দিয়ে ফুটে উঠেছিল। তারপর দিনে দিনে কালকেতুর মত যে কলকাতা শহর বেড়ে উঠল সে ডালহৌসি স্কোয়ারেরই প্রসাদে। এখন যার আদুরে নাম লালদিঘি সেটা সাবর্ণ চৌধুরীদের দোলোৎসবের দিঘি ছিল, আবিরে কুঙ্কুমে একেবারে লাল চেলির মত হয়ে যেত ওর জল, তাই ত ওই নাম। পশ্চিম পাড়ে ছিল এ-অঞ্চলের একমাত্র পাকা বাড়ি, চৌধুরীদের কাছারি।

ইংরেজরা কিনে নিয়ে দিঘি সারাল ৫৪ টাকা খরচ করে। গাছ বসাল চারপাশে। এইটেই ছিল খাবার জলের বলতে গেলে একমাত্র উৎস। কাছে পিঠে পুকুর থাকলেও কারও নাকি এত মিঠে জল ছিল না। নাম পাল্টে সাহেবরা রাখলেন "ট্যাঙ্ক স্কোয়ার"। পরে "গ্রীণ বিফোর দি কোর্ট"। সাহেব মেম হাওয়া খেতেন সন্ধে বেলা। স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপরে তখন গঙ্গা, জেনারেল পোস্ট অফিসের ভিটেয় তখন পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম উত্তর পুব কোণে মনোরম ডোরিক পিলারে দাঁড়ান অ্যাণ্ড্রুস চার্চ বা লাল গির্জে অনেক পরের সৃষ্টি, ১৮১৫ সনের। আগে ওখানে ছিল পারস্য রাজের দূতাবাস, পরে মেয়র্স কোর্ট। যে কোর্টে হয়ে ছিল মহারাজ নন্দকুমারের অবিচার। হেস্টিংসের

প্রতিদ্বন্দ্বী। মাডাম গ্রাণ্ডের প্রণয়ী ফিলিপ ফ্রান্সিসের কাহিনীও যার সঙ্গে জড়িত।

অফিস বাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে ছায়া বড় হতে থাকে। টেলিফোন ভবনের পিছনের অগুন্তি ফোয়ারা কুলকুচো করে জল ছিটোতে থাকে অবিশ্রাম। স্কোয়ারের ভিতরের কিছু স্ট্যাচু উঠে গিয়েছে অনেক আগেই। এখন স্ট্যাচুর মত বসে থাকা স্থানু মূর্তিগুলি বাড়ি ফিরবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে! তারা সবাই বেকার, কেউ সাময়িক কেউ চিরকালের। মায়া কাটাতে না পারা রিটায়ার্ড বৃদ্ধও আছেন, যাঁরা প্রতিদিন একটুও লেট হন না, লিস্টের কিউয়ে গিয়ে দাঁড়াতে। গা ধোয়া বিকেলের কাছাকাছি সময়ে সোফারদের দিবানিদ্রা ভাঙবে। নানা জাতের শিকারী কুকুরের মত সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা নানা মডেলের গাড়িগুলো ফিরে যাবে দুপুরের রোদ গা থেকে মুছে ফেলে।

প্রতিদিনের মত রাত হবে তারপর, প্রতিদিনের মত রবিবারের রাতও আসবে। ধূসর সস্‌ কাগজের স্কেচের মত ঝাপসা হয়ে আসবে ডালহৌসি স্কোয়ার। অফিস বাড়ির স্তব্ধ উঠোনে কেউ তুলসীদাসী রামায়ণ খানা খুলে বসবে ভক্তদের নিয়ে। পুকুরের ধারে আড় বাঁশি সাধবে বাহাদুর সিং। সমস্ত আকাশ জুড়ে স্তব্ধতা আর অবসাদ। না বলা বাণীর ঘন যামিনী জমবে চারপাশে। বঙ্গোপসাগরের জলদস্যু হাওয়া এসে লুঠ করে নেবে নির্জন ডালহৌসি স্কোয়ারকে। কেউ জেগে নেই। শুধু বাঘরাজের মত দূরের এক বাড়িতে জেগে বসে আছে লালবাজার, দশটা পাঁচটার ব্রেন ব্যাঙ্কগুলো এখন লাস-কাটা ঘরের মতই

হিমস্তব্ধ। আর টোপ গেলা মাছের মত সদ্য পাতা ট্রাম লাইনের বাঁকা বঁড়শি বুকে নিয়ে ছটফট করছে চিরচেনা লালদিঘি। রাত্রির ইতিহাস এই রকমই।

হাইকোটেশ্বর

অরবিন্দ গুহ

হাইকোর্ট চেনে না, এমন মানুষ কলকাতায় নেই। কিন্তু হাইকোটেশ্বরকে চেনা ত দূরের কথা, হাইকোটেশ্বরের নাম শুনেছে, এসব মানুষ কতজন, জানতে হলে বিস্তর মেহনত লাগবে।

না, ঠাট্টা নয়। সত্যি-সত্যি হাইকোটেশ্বর আছে—না না—আছেন। হাইকোর্ট পাড়াতেই আছেন। বহাল তবিয়তে আছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে চলে যান হেস্টিংস স্ট্রীটে কিংবা চার্চ লেনে। হেস্টিংস স্ট্রীট আর চার্চ লেনে যেখানে কাটাকুটি, সেখান থেকে বাঁ-হাতি ফুটপাথ ধরে গঙ্গার দিকে দু-পা হাঁটলেই জলজ্যান্ত হাইকোটেশ্বরের দেখা পাবেন।

'ওঁ হাইকোটেশ্বর নাথ মহাদেব'। রামের জন্মের পরে যেমন রামরাজা, হাইকোটেশ্বরের জন্মের পরে তেমনি হাইকোর্ট হয়নি। এ বেলা কিঞ্চিৎ অন্যথা দেখা যাচ্ছে। আগে হাইকোর্ট, পরে, অনেক পরে হাইকোটেশ্বর

হাইকোর্টের বাড়িখানা হয়েছে ১৮৭২ সনে। এখন যেখানে হাইকোর্ট, আগে তার একাংশে ছিল সুপ্রীমকোর্ট। বেশ কিছু-কাল আগেও তার সামনে ছিল একটা বাগান, তার মাঝখানে এক টুকরো পুকুর, পুকুরের মাঝখানে একটি ফোয়ারা। আব পুকুরের জলে অসংখ্য সোনালী মাছ।

হাইকোর্টের এই বাড়িখানার নক্‌শা করে দিয়েছেন ওয়াল্টার গ্রাবভিল সাহেব। গথিক ধরনের বাড়ি। পুরো পাকা একশো আশি ফুট উঁচু। অক্টারলোনি মনুমেণ্ট হাইকোর্টের চেয়ে পনেরো ফুট খাটো।

মনুমেণ্টের চেয়ে হাইকোর্ট শুধু লম্বায় নয়, সব হিসেবেই বড়। সে বাবদে সব হিসেব দাখিল করার কোন মানে হয় না। হাইকোর্ট যদি মনুমেণ্টের চেয়ে তেজী না হত, ত ঈশ্বর মনুমেণ্টের এলাকা ছেড়ে কিছুতেই হাইকোর্টের চৌহদ্দিতে আসতেন না, তাহলে হাইকোর্টেশ্বর রূপে না এসে নির্ঘাত তিনি মনুমেণ্টেশ্বর রূপে আসতেন।

উকিল-ব্যারিস্টার, জজ-এটর্নিতে হাইকোর্টপাড়া—ছুটিছাটা বাদে - দিনদুপুরে জমজমাট, ছুটির দিনের অষ্টপ্রহর কিংবা কাজের দিনের সকাল, সন্ধে আর রাত্রে হাইকোর্টপাড়া আর একরকম হয়ে যায়। ওপাড়ার সকলেরই ছুটি-ছাটা আছে, সুখ-অসুখ আছে, দেশ-বিদেশ আছে, কিন্তু হাইকোর্টেশ্বরের সে সব বালাই নেই। তিনি সারাক্ষণ একরকম।

ভুল বলা হল। সারাক্ষণ হাইকোর্টেশ্বর একরকম আছেন কেমন করে বলি। চব্বিশ ঘণ্টায় দু-বার পূজো হয় হাইকোর্টে-

শ্বরের—সকালে আর সন্ধ্যায়। পুরুতঠাকুর হেজিপেজি মনিষ্যি নন, কাশীর বামুন। কথাটা অবশ্যি আমার স্বয়ং পুরুতঠাকুরের মুখে শোনা।

সব সময়ের কথা বলতে পারি না, অন্তত কাশীর বামুনের হাতে পুজো পাবার সময়ে হাইকোর্টেশ্বর যে পুলকিত হন, একথা হলপ করে বলতে পারি। এ পাড়ার কয়েকজন রক্তমাংসের দেবতা—ব্যারিষ্টার-উকিল-এটর্নি ইত্যাদির ছদ্মবেশে বিরাজমান —তাঁরা মক্কেলের হাতে যথাবিধি পুজো পেলে দিব্যি রূপালো হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ পুজো পেলে খুশী হওয়া সব পাড়ার দেবতাদেরই আইন। ওপাড়ার বাসিন্দা হয়ে হাইকোর্টেশ্বর আইন অমান্য করতে পারবেন না। তাই বলছিলাম, পুজো পেলে হাইকোর্টেশ্বর আইনমাফিক তুষ্ট থাকেন।

হাইকোর্টেশ্বর পাথরের দেবতা। ওপাড়ার কোন কোন দেবতা শুনেছি, পারলে একেক জন মক্কেলের নশ্বর দেহখানা ছাড়া বাদবাকি মাল নিজেদের ব্যাঙ্কে নিয়ে আসতেন, কিন্তু হাইকোর্টেশ্বর সেখানে দু-চার আনা কিংবা দু-চার টাকার ভোগ পেলেই খুশী। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাথরের বলে হাইকোর্টেশ্বরের প্রাণে বোধ করি কিঞ্চিৎ দয়া-মায়া আছে।

পুরুতঠাকুরের মুখের কথা যদি অসত্য না হয় ত হাইকোর্টে-শ্বরের বয়স প্রায় দু-যুগ হল। বারো দুগুণে চব্বিশ বছর যখন ভালয় ভালয় কেটেছে, তখন হয়ত যুগ-যুগান্তরও মহানন্দে কেটে যাবে।

হাইকোর্টেশ্বরের মাথার উপরে একখানা সাদা পাথরে

খোদাই করা আছে : 'ওঁ হাইকোটেশ্বর নাথ মহাদেব। শুধু বাংলা নয়, 'ওঁ হাইকোটেশ্বর নাথ মহাদেব' পর পর ইংরেজী আর হিন্দীতেও খোদানো।

পুরুতঠাকুরের মুখে শুনলাম, হাইকোটেশ্বরের এখনকার আস্তানাটি অস্থায়ী। তা সেই রকমই মনে হল দেখে-শুনে। মাথার উপরে ত্রিপলের মত কি একটা টাঙানো, একদিকে একটা পাকা দেওয়াল, দু' দিকে কাঁচা বেড়া, একটা দিক ফাঁকা। অঢেল গাঁদাফুল আব বেলপাতা। এক পাশে ফাটা ভাঙ্গা টবে একটা তুলসীচারা। তুলসীচারাটার চেহারা দেখলে মনে হয়, যেন ওটা সদ্য হাইকোর্ট থেকে ফাঁসির হুকুম পেয়েছে।

ভক্তের সমাগম হয় বৈকি। ভক্তের যদি দুর্ভিক্ষ থাকত, তাহলে একা পুরুতঠাকুরের সাধ্য কি যে, তিনি হাইকোটেশ্বরকে দু-যুগ আহার-আশ্রয় জুগিয়ে যান! হাইকোটেশ্বরকে পুজো করলে নাকি মামলায় জিত হয়! পুরুতঠাকুর বলেন,—হাই-কোটেশ্বর নাথ মহাদেও আপকা মনস্কামনা পূরণ করেগা।

পাকা খবর অবশ্যি জানি না, কিন্তু আমার ঘোরতর সন্দেহ, হাইকোটেশ্বর সব ভক্তকে মামলায় জিতিয়ে দিতে পারেন না। তা বলে হাইকোটেশ্বরকে অবিশ্বাস করলে ভুল হবে। বিধান রায়ের মত ডাক্তারও সব রোগী বাঁচাতে পারেননি। সেজন্যে কি আপনি শেষনিশ্বাস ফেলবার আগে সুযোগ পেলে একবার ডাক্তার রায়ের দ্বারস্থ হবেন না? নিশ্চয়ই হবেন। মোদ্দা কথা, হাইকোর্টের পাল্লায় পড়লে বারেক হাইকোটেশ্বরের চরণামৃত না নিয়ে আর কোন কথা নয়।

না, আব মাত্র একটা কথা। হাইকোর্টেশ্বরের ঘরে একটা উগ্র গন্ধ কিসের? ভেবে-চিন্তে বুঝেছি, বড় তামাকের। ও বস্তুব রসিক কি পুরুতঠাকুর, না।

—জয় বাবা হাইকোর্টেশ্বর।

সৈয়দ বাবার দরগা

অমিতাভ চৌধুরী

হঠাৎ আজানের ডাক শুনে চমকে যাবেন না। কিংবা হঠাৎ সাত-আটশো পায়রা কাছাকাছি গাছের শাখা থেকে উড়তে শুরু করলে। এইখানেই সৈয়দ বাবার দরগা। ঐ যে দরগা ঘিরে ঝুলছে সারি সারি, ওগুলো উটপাখির ডিম। হজরত সৈয়দ আলী শাহর দেশ ছিল আরব মুলুক। মুসলমানরা যখন দিল্লির বাদশাহ, তখন তিনি আসেন হিন্দুস্তান। তারপর শতাধিক বর্ষের পুণ্য জীবন সমাপ্ত করে আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন এইখানে—এই ঝুরিনামা শান্ত-শীতল বটের তলায়। খিদিরপুর পুলের কাছে হেস্টিংস ময়দানে।

সামনেই গড়গড় করে চলেছে খিদিরপুর, বেহালার ট্রাম। ট্রাম লাইনের ঐ পারে রেসকোর্স। শনি-রবিতে হাজার হাজার টাকার খেলা, গাড়ির ভিড়, লোকের ঠেলাঠেলি। ডাইনে বাঁয়ে মিলিটারীর গুদাম, পিছনে বস্তি। আর উথালপাতাল

জনসমুদ্রের মাঝখানে হেস্টিংস ময়দানে দ্বীপের মতন দাঁড়িয়ে আছে শান্তি আর পবিত্রতায় ঘেরা সৈয়দ বাবার দরগা। কর্ম-ব্যস্ত রাজপথে কান পাতলে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে এই দরগা থেকেই সন্ধে সকাল শোনা যায় আজানের ডাক।

কলকাতায় মন্দির মসজিদের কমতি নেই। কিন্তু সৈয়দ বাবার এই দরগা অনেকের হয়ত নজরে পড়ে না। 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আলয়, নিরাড়ম্বর পবিত্রভূমি পথ-চলতি লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি নজরে পড়ে তাহলে দু'দণ্ডের জন্যেও আপনাকে এইখানে থামতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে দরগার দিকে। এমন চমৎকার জায়গা কলকাতায় বড বেশী নেই। ট্রাম-স্টপ থেকে দু-পা এগিয়েই সবুজ ঘাসে ছাওয়া ছোট্ট মাঠ। এককোণে ঝুরিনামা অতিবৃদ্ধ বট। তার তলায় শুয়ে আছে ক্লান্ত পথিক. একতারাতে গুনগুনোচ্ছে কোন বৈরাগী কিংবা নামাজ পড়ছে কেউ, আর পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাত আটশো পায়রা। বটগাছের কোলেই তাদের স্থায়ী আস্তানা। সবই বাবার নামে মানত করা, পুণ্যকামীরা এসে এসে এদের রোজ খাইয়ে যায়। আর ওরা স্বস্তির ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিহ্ন ডানায় মেখে অবাধে ঘুরে বেড়ায়।

আরও একটু এগোলেই দেখবেন বাবার কবর। একপাশে 'জেনানাকে লিয়ে' বিশ্রাম ঘর। অন্য পাশে মর্মর চত্বরে ঘেরা কবরস্থান। বাবা শুয়ে আছেন উত্তর দিকে মাথা রেখে। বাবার ইচ্ছেতেই কবরের উপর শুধু মাটির প্রলেপ। তার উপরে

অজস্র ফুলের বাহার। ভক্তরা, পুণ্যকামারা রোজ ফুল দিয়ে যায়। কবরের চারধারে নূতন তৈরী মর্মরবেদী, তোরণ। তার গায়ে কোরাণের বাণী খোদাই করা। অসংখ্য লোকের অবিরাম আসা যাওয়া। হাতজোড় করে সকলেই চাইছে বাবার 'দোয়া'।

কবরের চারধারে ঝুলছে সারি সারি উটপাখির ডিম। জাহাজীরা বিদেশ থেকে ফিরেই সটান চলে আসেন দরগায়। তাঁরাই ঝুলিয়ে দিয়ে গেছেন ঐ ডিম। এক পাশে নামাজের জায়গা, অন্যপাশে মোহাফিজের থাকার ঘর। ধূপের গন্ধ আর ফুলের সৌরভের মাঝখান থেকে সরে যেতে ইচ্ছে করে না।

দরগার মোহাফিজ সুলতান আহাম্মদ। তার বাবাও ছিলেন মোহাফিজ। তাদের বাড়ি ছিল গাজীপুরে। এখন কলকাতার লোক।

সুলতান সাহেব একগাল হেসে বললেন—বাবুজা সৈয়দ বাবার মতোন এমন রাগী আদমী বহুৎ কম আছে। বাবার নামে কুছু খারাব কথা বলেছেন তো জান খতম। আর বাবার দোয়া হলো তো কাম হাসিল।

এই দেখুন না, গত লড়াইয়ের সময় মিলিটারী আদমীরা একরোজ এসে বললো—'দরগা উঠাও।' হামরা বল্‌লাম 'কভি নেহি', চলল হাঙ্গামা হুজুত। বড়ি গোলমাল। হামরা সাফ জানিয়ে দিলাম—বাবার কবর উঠবে নাই। জান কবুল

মিলিটারী আদমীরা রোজ রোজ হুজ্জত করে। দরগায় ঢুকে হাল্লা করে। হামরা নামাজ পড়ি, কাওয়ালী গাই, আজান

দিই। উরা বলে—'উসব চলবে নাই।' মাহা মুশকিল। লেকিন সব ফয়সালা করে দিলেন খোদ 'বাবা'।

এক রোজ হয়েছে কি এক হাওয়াই জাহাজ দরগার উপর উড়বার সময় বদাম্ করে গিরে গেল। আগুনে আগুনে সব কাবার। হামরা সমঝালাম, ঠিক হইয়েছে, বাবা গোসা দেখিয়েছেন। তারপর হামরা মিলিটারী আদমীদের কাছে গেলাম, ধরাধরি করলাম। বললাম, 'হুজুব বাবাকে শান্তিতে থাকতে দেন।' উরা রাজী হয়ে গেল। তারপর কুছ গোলমাল নাই।

এখন হিন্দু, মুছলমান, খিরিস্তান লোক সব আসে, সিন্নি নেয়, মানত করে। সিন্নির খরচে হামাদের চার পাঁচ আদমীর খরচ চলে।

আমি জানতে চাইলাম বাবার জীবন-ইতিহাস। মোহাফিজের বক্তব্যে সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা হল না। শুধু অসংখ্য কিংবদন্তী আর অলৌকিক কাহিনী। মোহাফিজ স্বীকার করলেন, বাবার ঠিক ঠিক ইতিহাস তাঁদের কারও জানা নেই। শুধু জানেন, আরব মুলুক থেকে এসে হিন্দুস্তান ঘুরতে ঘুরতে তিনি আসেন এই বাংলা মুলুক মারাও গেলেন এইখানে। বাবা বেঁচেছিলেন একশ বছরের বেশী। মারা যান ১১১৭ হিজরীতে। এখন ১৩৭৯ হিজরী।

প্রতি হপ্তায় বৃহস্পতিবারে-বৃহস্পতিবারে দরগার সামনের মাঠে মেলা বসে। বৃহস্পতিবার মানত দেবার, সিন্নি দেবার দিন। তাছাড়া নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতি বছর দুদিন
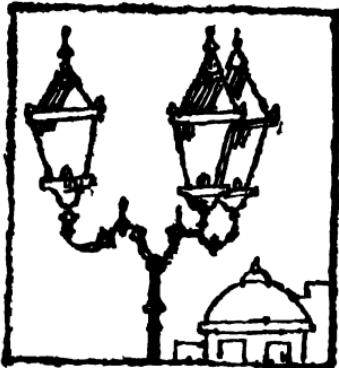
ধরে বসে খুব বড় মেলা। বাবার উর্স্। ২৬শে ও ২৭শে জমাদিওল আউল তারিখে। এইদিন একেবারে মহোৎসব।

বিদায় নেবার আগে স্থলতান সাহেব বললেন—আদাব বাবুজী, আসবেন আবার।

ওদিকে তখন সন্ধে আজান শুরু হয়ে গেছে।

একটি পরিচিত মূর্তি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রাম থেকে সদ্য কলকাতায় আসা ভ্রাতুষ্পুত্রকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন শহুরে খুল্লতাত। চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, মনুমেণ্ট ইত্যাদি। দোতলা বাসে যেতে যেতে বড় বড় থামওয়ালা সিনেট হলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ, ঐ দেখ, ইউনিভার্সিটি। সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়তে আসা কিশোর সেদিকে অত্যন্ত উৎসাহ ভরে তাকাবে এবং স্তম্ভগুলির ফাঁক দিয়ে একটি প্রস্তর মূর্তির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলবে, ওটা কার মূর্তি? এ প্রশ্ন শহুরে খুড়ো মহাশয়কে একেবারে বিচলিত করে দেবে। আমতা আমতা করে তিনি নিজেই ভাল করে তাকিয়ে দেখবেন সেই দিকে। পুষ্টকায় এক প্রৌঢ়ের মূর্তি। প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু, দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ওষ্ঠ। হাতে একখানি পৃষ্ঠা-খোলা বই, পরনে উনবিংশ শতাব্দীর জমিদারদের মত পোশাক, মাথায় পাগড়ি।

অর্বাচীন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রশ্নে আমাদের পূর্ববর্ণিত খুল্লতাত প্রথমে একটু নার্ভাস হয়ে পড়বেন, তারপরই বলে উঠবেন,

মাথায় পাগড়ি, ও নিশ্চয়ই বঙ্কিমবাবুর স্ট্যাচু। জানিস নে, উনি আমাদের দেশের ফার্স্ট গ্রাজুয়েট।

বলাবাহুল্য, সিনেট হলের সম্মুখের মূর্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। কিন্তু অমন উল্লেখযোগ্য স্থানে থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহু লোকেই মূর্তিটি কার তা জানেন না। মূর্তিটির নীচের লেখাগুলি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিছুদিন পর হয়ত একেবারে মুছে যাবে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন ঠিকই, তবে আমাদের দেশের শিক্ষার অগ্রগমনের জন্য যাঁরা স্মরণীয়, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম, কিন্তু প্রধান নন। তবু, এই মূর্তিটি স্থাপনের জন্য কলকাতা শহরের এক সময়ের একটি চাঞ্চল্যকর কাহিনী জড়িত।

সে অনেক কালের কথা, তখন এই সিনেট হল তৈরীই হয়নি। এখন যেখানে সিনেট হল—তখন সেখানে ছিল একটা মাংসের হোটেল। গরম গরম শিককাবাব পাওয়া যেত। উল্টো দিকে গোল দিঘি। সেখানে বসে হিন্দু কলেজের ছেলেরা মদ্যপান করত, আর রেলিং টপ্‌কে ছুটে গিয়ে কাবাব কিনে আনত।

হিন্দু কলেজে তখন একসঙ্গে পড়েন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, আনন্দকৃষ্ণ বসু, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি। বহু ছাত্রেরই প্রধান কাজ ছিল অমিত পরিমাণ মদ্যপান, হঠাৎ আবেগের বশে ক্রীশ্চান কিংবা ব্রাহ্মধর্ম

অবলম্বন করা। কিন্তু একদিক দিয়ে এঁরা সেকেলে হিন্দুদের আদর্শ মেনে চলতেন, সেটা হচ্ছে—বাল্যকালে বিবাহ। কলেজে পড়বার সময়ই এঁরা বিবাহ করে ফেলতেন।

প্রসন্ন ঠাকুরের একমাত্র ছেলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। প্রসন্নকুমারের সেকালে শুধু ধনী বলেই খ্যাতি ছিল না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ। বহু বিষয়েই তাঁর ছিল প্রগাঢ় জ্ঞান, বিশেষ করে তিনি ছিলেন নিপুণ আইনজ্ঞ। এজন্য গবর্নমেণ্টকেও বহুবার তাঁর সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু প্রসন্নকুমার ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। আবার সাগরদাঁড়ির জমিদার রাজনারায়ণ দত্তের আদুরে ছেলে মধুসূদন দত্ত। রাজনারায়ণও ছিলেন দুর্দান্ত ব্যক্তি, গোঁড়া হিন্দু।

তখন কলকাতা শহরে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত কুখ্যাত এবং বিখ্যাত। তাঁর মত গোঁড়া ক্রীশ্চান তখন মিশনারীদের মধ্যেও বিরল ছিল। কৃষ্ণমোহনের দুই মেয়ে —তার মধ্যে এক মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে গেলেন মধুসূদন দত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। একদিকে চঞ্চল, অস্থিরমতি কবি মধুসূদন, অন্যদিকে স্থির, দীপ্তবুদ্ধি যুবক জ্ঞানেন্দ্রমোহন। কিন্তু মধুসূদন যদিও ধনীর সন্তান, তবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্রের সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। কৃষ্ণমোহন প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে ক্রীশ্চান করলেন, তারপর তাঁর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন।

এ খবর শুনে ক্রোধে আগুন হয়ে উঠলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ছেলের মুখদর্শন করবেন না প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁকে

সমস্ত বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন। নিজের ভাই-এর ছেলে যতীন্দ্রমোহনকে সব কিছু দান করলেন।

স্বয়ং প্রভূত ধনের অধিকারী হলেও প্রসন্নকুমার ছিলেন কর্মিষ্ঠ পুরুষ। আজীবন দেশের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতি ছিল, সংস্কৃত চর্চার জন্য, সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষার জন্য অনেক দান করেছেন। শুঁড়োর বাগান বাড়িতে সেকালে তিনি উত্তররামচরিতের অনুবাদ এবং সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অভিনয় করিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকার একখানি চেক দান করেন, যার সুদে টেগোর ল—লেকচারারের খরচ চলছে। নিজের বাড়িতে দুর্লভতম গ্রন্থের সংগ্রহ ছিল তাঁর।

কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য প্রসন্নকুমারের জীবনী রচনা নয়। সিনেট হলের সামনে তাঁর মূর্তি স্থাপনের কারণ এখনকার অনেকেরই অজানা।

প্রসন্ন ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মধ্যে মামলা শুরু হল। সে-আমলের এক বিখ্যাত মামলা। ন্যায়ত জ্ঞানেন্দ্র মোহনই সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু পিতার ক্রোধ তাঁকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করেছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন নিজেও কৃতী ছিলেন, উত্তরকালে বিখ্যাত ব্যরিস্টার হয়েছিলেন, লণ্ডনে হিন্দু-আইনের অধ্যাপক হয়েছিলেন, বহু বৎসর সপরিবারে সেখানেই কাটিয়েছেন।

মামলায় আপাতত যতীন্দ্রমোহনেরই জয় হল। ঠিক হল,

যতীন্দ্রমোহনই সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করবেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর জ্ঞানেন্দ্রমোহনের ছেলে পুনরায় সমস্ত বিষয় পাবেন।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অনেকের কাছেই এখনও পরিচিত। মাইকেল মধুসূদনের তথা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মামলায় জয় লাভ করে তিনি তাঁর সাফল্য ভালভাবে উদ্‌যাপন করেন। প্রসন্নকুমারের মর্মর-মূর্তি নির্মাণ করে, কলকাতার বিখ্যাত স্থানে, সদ্য প্রস্তুত সিনেট হলের সম্মুখে স্থাপন করে নিজের উত্তরাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন তদানীন্তন গর্ভনর জেনারেল লর্ড রিপন।

এখন প্রসন্নকুমারের নাম প্রায় বিস্মৃত। তাঁর মূর্তির গায়ে ধুলো জমছে। কিছুদিন পর সিনেট হল ভেঙ্গে যখন সেখানে বিশাল প্রাসাদ উঠবে—তখন প্রসন্নকুমারের মূর্তি যদি স্থানান্তরিত হয়, তবে কলকাতার এক সময়ের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই থেকে যাবে।

গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউস

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

মিউজিয়মের পাশ দিয়ে কোনদিন যদি সদর স্ট্রীটে ঢুকে পড়েন, তাহলে ঐ রাস্তা দিয়ে সোজা পুবমুখো হাঁটতে হাঁটতে বাঁ-হাতি লিটন হোটেলের সামনে একবার দাঁড়াবেন। লিটন হোটেলের পরিচ্ছন্ন পাম্‌বীথির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে চোখের সামনে ভেসে উঠবে "গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউস", ১৮৬৭ সন। বাঁ দিকের সমস্ত বাড়িগুলোর মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটাই কলকাতার প্রাচীনতম অপেরা হাউস। বাড়িটার ছাদ মস্ত উঁচু। মাথাটা করগেটেড সীট দিয়ে ঢাকা। অপেরা হাউসের অভ্যন্তরে যাতে নির্জন কণ্ঠে উচ্চারিত কথাটিও দর্শকের কানে এসে পৌঁছায় তাই এই সুবন্দোবস্ত। অপেরা হাউস থেকে একটু দূরে সদর স্ট্রীট ধরে এগোলেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বাড়ি—রবীন্দ্র জীবনস্মৃতির পাতায় যার উল্লেখ আছে। এই অপেরা হাউসের প্রথম সৃষ্টি হয় ১৮৬৭ সনে। তার নতুনতর পর্যায় শুরু হয় আবার ১৯০৮ সনে। দেয়ালের গায়ে এ দুটো সনেরই উল্লেখ আছে। সে কথায় আসার আগে

পূর্ব ইতিহাস একটু আলোচনা করা যাক। এই অপেরা হাউসটির পত্তন করেছিলেন চার্লস ম্যাথু বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক। ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পিছনে তাঁর কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিল না এ কথা বলা বাহুল্য। ইউরোপে বা বিলাতে ভ্রমণরত ভারতবর্ষীয়েরা বহু অর্থ ব্যয় ও কষ্ট করে যে সব অপেরা-থিয়েটার দেখতেন সেই সব বিখ্যাত বিদেশী অপেরা-থিয়েটার কলকাতাতে বসে দেখানোর সুযোগ করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল কিন্তু এর জন্যে বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁকে। কেননা তখনকার দিনে বিদেশী অপেরা দলের ভারত ভ্রমণের পথ এত সুগম ছিল না এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্যে পূর্বেই বহু মোটা অঙ্কের আর্থিক প্রতিশ্রুতি না দেওয়া হলে কোনো দল ঘড়ি ঘড়ি আসতে রাজী হতো না। চার্লস ম্যাথু অবশেষে স্থানীয় ইংরেজ, এদেশীয় সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ও দু' একজন দেশীয় রাজাকে নিয়ে একটি সিণ্ডিকেট গঠন করেন, তাঁদের চাঁদায় এই অপেরা হাউস চালু করার ব্যবস্থা হয়। সিণ্ডিকেটের সদস্যদের কাছ থেকে বার্ষিক চাঁদা আগাম নিয়ে বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। সিণ্ডিকেটের সদস্যদের জন্যে কিছু সীট রিজার্ভ করা থাকতো। আর বাকি সীট সন্ধ্যেবেলায় ঘণ্টি বাজিয়ে নীলাম করা হতো।

এই অপেরা হাউসের দ্বারোদ্ঘাটন হয় তদানীন্তন ইতালীর প্রসিদ্ধ পেশাদারী দলের "ফাউস্ট" অপেরা দিয়ে। এই পেশাদারী

দলের অপূর্ব অভিনয় তখনকার দিনের গণ্যমান্য অভিজাত মহলে সাড়া তুলেছিল। অভিনয় হৈ-হৈ করে কিছুদিন চলেছিল। পূর্বতন মালিকের নব্বই বৎসর বয়স্ক পুত্র জানালেন, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তও এক সন্ধ্যায় হাজির হয়েছিলেন "ফাউস্টের" অভিনয় দেখতে। মেফিস্টোফেলিসের অভিনয় তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষও সম্ভবত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অপেরার ইতিহাসে কলকাতার এই সন্ধ্যা স্মরণে রাখার মত। প্রসিদ্ধ ইতালীয়ান কম্পোজার গুনোভ-এর অর্কেস্ট্রা জাদুময় পরিবেশ রচনা করেছিল। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা পরস্পরকে যে বক্স থেকে সম্ভাষণ জানাতে পারেন সেই বক্সের টিকিটের দাম চড়েছিল ১৫০ টাকায়। অন্য সীটে যেখান থেকে অপেরা গ্লাস চোখে দিয়ে বিদগ্ধ শৌখিন নাগরিকেরা প্রেক্ষাগৃহের সামনের দিকে অর্কেস্ট্রা স্টলের কাছে অর্ধবৃত্তাকারে উপবেশন করতে পারেন তার দাম ছিল ২৫ টাকা। অন্যান্য সীটের দাম ১৫ টাকা ও ১০ টাকা ধার্য করা হয়েছিল।

এর পরে অপেরা হাউসের বাজার কিছুকাল মন্দা যায়। কিছুকালের মধ্যে আবার তখনকার প্রিন্স অব ওয়েলসের (৭ম এডওয়ার্ড) কলকাতা আগমন উপলক্ষ্য করে ১৮৭৫ সনে অপেরা হাউস আবার জাঁকিয়ে ওঠে।

তখনকার গবর্নর জেনারেল লর্ড লিটনও কলকাতায় এসে অপেরা হাউসের সিণ্ডিকেটের সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস দেন।

প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনের দিন অপেরা হাউসের রয়াল সার্কেলের সীটের দাম এক হাজার ওঠে। ভারতীয় শিল্পীদের নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান ও অপেরা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন প্রিন্স অব ওয়েলস নিজে পিয়ানোয় মোৎর্সাটের সিম্ফনির একটি গৎ বাজিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করেন।

১৮৯৯ সনে তখনকার দিনের পুলিস কোর্টের সেরা আইনজীবী ভি. ই ক্রেনবার্গ অপেরা হাউসটি পরে কিনে নিয়ে ফের পেম্বারটন ও ক্লিফোর্ড উইলার্ড এণ্ড কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেন। রয়্যাল থিয়েটার ছেড়ে এসে খ্যাতনামা মরিস ব্যাণ্ড ম্যান এই হাউসে অপেরার অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯০৮ সন, কোহেন বলে এক ইহুদী ভদ্রলোক এই অপেরা হাউস কিনে নিয়ে এর নতুন নামকরণ করেন "গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউস।"

এই ভাবে অপেরার দিন ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসতে লাগলো আরও বছর তিনেক পরে এলো রূপালী পর্দার দিন।

রীতিমত "হিট" অপেরা—ভারত সন্তানকে বহুদিন অপেক্ষা করে যার টিকিট সংগ্রহ করতে হতো, বিলেতে গিয়ে দিনের পর দিন তারই অভিনয় চলেছে এই গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসে। যাই হোক, দর্শক মন যেই মজলো সাইলেণ্ট পিকচারের মোহে অমনি রূপালী পর্দার আড়ালে ছলছল চোখে অপেরা মুখ লুকালো। শরীরীণী নায়িকার স্থান দখল করে নিলো ভাষাহীন রহস্যময়ী অশরীরী নায়িকা। ফাউস্ট ও তার নীলনয়না মার্গরিটার প্রেমকাহিনী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। যন্ত্রযুগের মেফিস্টো-

ফেলিসের কাছে বিক্রীত হয়ে গেল ফাউস্টের আত্মা। ১৯২২ সনে পাকাপাকি ভাবে লর্ড লিটন একদিন সান্ধ্য অনুষ্ঠানে এই প্রেক্ষাগৃহের নতুন নামকরণ করে দিলেন "গ্লোব গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউস"। সেই থেকে এই অপেরা হাউস চিরদিনের জন্যে সিনেমা হাউসে রূপান্তরিত হলো। গৌরবময় অতীত নিয়ে কলকাতার সেই প্রাচীনতম অপেরা হাউসটি আজও শুধু "দি গ্লোব" নামটি ধারণ করে একই জায়গায় লিণ্ডসে স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু সিনেমা হাউসের পিছন দিকের দেওয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে ইতিহাসের স্মৃতিফলক।

একটি পাথরের ফলক

কুন্তল সরকার

লোয়াব সাকুর্লার বোড ধরে হেঁটে চিড়িয়াখানা গিয়েছেন কখনও কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অথবা রেসকোর্স? তাহলে জায়গাটা চিনতে মোটেও অসুবিধা হবে না আপনার। পি. জি. হসপিটাল-এর নাম শুনেছেন নিশ্চয়। হালে যাকে বলে —সুখলাল কারনানি হাসপাতাল তার কথাই বলছি। চৌরঙ্গী রোডের পর ক'পা যেতে না যেতেই বাঁ দিকের ফুটপাথ ঘেঁষে কারনানি হাসপাতালের লৌহ-ঘের। এখান থেকেই শুরু হাসপাতালের সীমানা। এগিয়ে যান আরও কয়েক পা। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে ক্ষতি নেই। সঙ্গে যদি ছোট ছেলেমেয়ে থাকে তবে সেই টেনে ধরবে আপনার জামার কোণটা।

থামলেই দেখবেন আপনার সামনে একটা লাল রঙের তোরণ, তাতে এক টুকরো সাদা পাথরে লিখিত কয়েকটি ছত্র। তোরণশীর্ষে কাল পাথরে খোদাই করা একটি আবক্ষ মূর্তি।

ঘটনাটা একদিক থেকে কিছু নয়। তোরণটি চন্দননগব বা মহীশূরের কোন বিজয় তোরণ নয়। লাইন কয়টিও ক্লাইভ ওয়াটসন বা আউটরাম লরেন্স-এর মত কোন বীরত্ব-গাথা নয়।

সামান্য কথা। ছোট্ট একটি সংবাদ। বাংলা করে বললে যার মানে দাঁড়ায়—এখান থেকে, এই তোরণটি থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরের ঐ ছোট্ট গবেষণাগারটিতে এই ভদ্রলোক একদিন আবিষ্কার করেছিলেন—মশা ম্যালেরিয়ার বাহন।

মশা থেকে ম্যালেরিয়া, আপনার নয় বৎসর বয়স্ক পুত্রটি হয়ত হেসে ফেলবে খবরটি শুনে। কে না জানে আজ মশা ম্যালেরিয়ার বাহন? হয়ত, মনে মনে একটু বিস্মিত হবেন আপনি নিজেও। আবিষ্কারটা তুচ্ছ বলে নয়, ঘটনা এখানে ঘটেছিল বলে। মশা এবং ম্যালেরিয়ার যোগাযোগ না জানে পৃথিবীতে আজ এমন শিক্ষিত লোক নেই। কিন্তু আপনার মত তাদের অনেকেরই জানা নেই এই যোগাযোগটা আবিষ্কৃত হয়েছিল আপনারই শহরে। এই কলকাতায়।

'রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতায় আছি'। —কলকাতার সঙ্গে মশার যোগাযোগ অনেকদিনের। এ-শহরে থাকতে হলে মশা মাছি নিয়ে থাকতেই হবে। ঈশ্বর গুপ্ত তা-ই ছিলেন। আমরাও তাই আছি। কিন্তু যাকে বলে সেই থাকার মত থাকা, সে ছিলেন মাত্র একজনই। আপনার সামনে ঐ কাল পাথরের মূর্তিটি যাঁর, তিনিই।

কত সাহেব-ই ত এসেছে কলকাতায়। রাতের পর রাত মশার অত্যাচারে তারা ছটফট করেছে বিছানায় পড়ে। কখনও ঘরময় ছুটে বেড়িয়েছে মশা-শিকারের ব্যর্থ-চেষ্টায়। কিন্তু, পরিবর্তে এই ছোট্ট কীটটির মৃত্যু-কামড়ে শিকার হয়েছে নিজেরাই। মুরদের চেয়েও ইংরেজরা বেশী ভয় করত মশাকে।

মরে মরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল নেটিভরা। কিন্তু ইংরেজরা তখনও এভাবে মরতে শেখেনি। ফলে মশা ছিল তাদের কাছে আতঙ্ক। কোকিল নিয়ে ইংরেজ কবিরা কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ কবির অন্যতম বিষয় ছিল সেদিন মশা। "মশা" নিয়ে কত কবিতা কত গান যে আছে 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান' সাহিত্যে তার ইয়ত্তা নেই।

সবই হয়েছে গান, গালাগালি, মশারির উদ্ভাবন—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটি সেটি হল অনেক, অনেক দিন পরে। অবশেষে সার্ রোনাল্ড রস যেদিন কলকাতায় এলেন সেদিন।

সাধারণতঃ লোকে জানে এনোফেলিস মশা যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেহ থেকে দেহান্তরে বয়ে নিয়ে যায় রোনাল্ড রস এই তত্ত্বটিরই আবিষ্কারক। এ-কারণেই অবশ্য ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। 'মার' থেকে আরও পঞ্চাশটি সম্মান পদকের কারণও অবশ্যই তাই। কিন্তু জীবনী পড়লে মনে হয় রোনাল্ড রস-এর জীবনে এ আবিষ্কারটা নেহাৎই আকস্মিক ঘটনা নয়।

জন্মেছিলেন তিনি ভারতেই। আলমোড়ায়। ১৮৫৭ সনের ১৩ই মে। বারটা ছিল শুক্রবার। একে থার্টিনথ্, তার উপর ফ্রাইডে! মা বাবা ভেবেছিলেন ছেলেটা বোধ হয় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মাল।

কিন্তু ক'বছর বাদেই দেখা গেল ব্যাপারটা উল্টো। যাতে হাত দেন রস্ তাতেই তিনি বিজয়ী। ইচ্ছে ছিল চিত্রকর

হবেন। কেম্‌ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড ড্রয়িং-এর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রমাণ করলেন—ইচ্ছাটা স্বপ্ন মাত্র নয়।

লিওনার্দো না হয়ে বিটোফেন?—তাও যে একেবারে আকাশ কুসুম কল্পনা তাঁর কাছে, তাও নয়। শেলি বায়রনের কবিতায় রস অহরহ সুর যোজনা করতেন। কবিতাও লিখতেন নিজে। শুধু কবিতা নয়, ছোটগল্প, নাটিকা,—এমন কি উপন্যাসও। তাঁর একখানা উপন্যাস 'চাইল্ড অব ওসান'কে সমালোচকেরা একদিন ঠেলে দিয়েছিলেন ক্ল্যাসিকের তালিকায়।

বহু দেশ ভ্রমণকারী রস্‌ বহুভাষী ছিলেন। ইতিহাস, দর্শন, গ্রীক এবং রোমান ও ইউরোপীয় সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। কিছুকাল লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন তিনি।

কিন্তু শেষপর্যন্ত চাকরি হল জাহাজে সার্জনের চাকরি এবং অবশেষে ভারতে 'আর্মি মেডিকেল সার্ভিসে'। ভারতের বাইরে এশিয়া আফ্রিকার বহু দেশে যেমন কাজ করেছেন রোনাল্ড রস্‌, তেমনি কাজ করেছেন কলকাতা ছাড়াও ভারতের আরও আরও অঞ্চলে। কিন্তু কলকাতার গর্ব—এখানে জন-চক্ষে সাফল্যলাভ করেছিলেন অলুক্ষণে শুক্রবারে জাত এই লোকটি।

এই তোরণটি থেকেই তাকিয়ে দেখুন ঐ আটপৌরে বাড়িটিকে। মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখুন সেই চিত্রটি। অপরিসর ঘরে, সাবেকি যন্ত্রপাতি নিয়ে একাকী

সাধনায় মগ্ন আছেন এই বিজ্ঞানী। টিউবে টিউবে রকমারী মশা, নরদেহের রক্ত।

১৮৯৭ সনের ২০শে আগস্ট ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সার্জন, প্রথমে খবরটা শুনতে পেল সহকর্মীরা। তারপর ক্রমে বিশ্ববাসী। মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার লক্ষ লক্ষ জ্বর-কাতর রোগী কাঁপতে কাঁপতে শুনতে পেল পৃথিবীতে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুদূতকে চিহ্নিত করে ফেলেছেন জনৈক মানবহিতৈষী। কোথায়? না, কলকাতায়। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে,—ঐ ছোট্ট ঘরটিতে

ডুয়েল অ্যাভিনিউ

সনাতন পাঠক

স্ট্রীট গাইডের পাতা ওলটাতে ওলটাতে ডুয়েল অ্যাভিনিউর নাম চোখে পড়বে। এবং রাস্তাটি শুধু স্ট্রীট গাইডের পাতাতেই আছে বলা যায়। কারণ অ্যাভিনিউ শুনলেই যেমন দু'পাশের গাছের সারবাঁধা প্রশস্ত পথের কথা মনে হয়—ডুয়েল অ্যাভিনিউ নামে সেরকম রাস্তা কলকাতায় কোথাও নেই। একপাশে বেলভেড়িয়ার, চিড়িয়াখানা, অন্যদিকে ডায়মণ্ডহারবার রোড—এর মধ্যে যে বিশাল চত্বর—যার মধ্যে নতুন নতুন সব সরকারী বাড়ি উঠছে, যার একপ্রান্তে আবহাওয়া অফিস—তারই মধ্যে সরু এক-চিলতে এক রাস্তার নাম ডুয়েল অ্যাভিনিউ—যে নামের সঙ্গে একশ আশী বছর আগেকার বাংলাদেশের এবং ইংলণ্ডের এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায় জড়িয়ে আছে।

সে রাস্তা এখন খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়। সেই শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজির কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বলাই বাহুল্য, মাঠের মধ্যে নানান্ রাস্তার মধ্যে আলাদা করে সে রাস্তা খুঁজে বার করা শক্ত। সেই ঐতিহাসিক কাহিনীর কোন চিহ্ন নেই

কোথাও, 'ভয়ঙ্কর বটগাছ' কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু পোস্ট অফিসের পিয়ন হাত দেখিয়ে বলবে, এই যে ডুয়েল অ্যাভিনিউ রিজিওনাল মিটিরিওলজিকাল সার্ভে অফিসের চিঠি আসে চার নম্বর ডুয়েল অ্যাভিনিউ, এই ঠিকানায়। যে ব্যক্তি সেই সময়ের ইতিহাস জানে—এই ক্ষুদ্র নির্জন পথে দাঁড়ালে তার শরীরে তবু রোমাঞ্চ হবে।

১৭ই আগস্ট ১৭৮০ সন। সার ফিলিপ ফ্রান্সিস ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় এখানে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছেন। ক্রোধে তার সমস্ত শরীর কাঁপছে, ঘড়ি দেখছেন ঘন ঘন। তবে কি হেস্টিংস ভয়ে আসবেন না ?

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসকে চিনতে তিনি ভুল করেছিলেন। হেস্টিংস ছিলেন বিচিত্র পুরুষ। ভালমন্দের সংমিশ্রণে আদর্শ রাজনীতিবিদ। নন্দকুমারের ফাঁসি, অযোধ্যার বেগমদের অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া—এ সমস্ত অপবাদ তাঁর আছে—অপরদিকে প্রবল সব প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে তিনি ক্ষমতার লড়াই করেছেন। সংস্কৃত ভাষার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। চিত্রশিল্পে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। নিজের স্ত্রীকে সুন্দর চিঠি লিখতেন তিনি।

বিলেতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস তাঁর হাত-পা বেঁধে দিয়েছিল। চারজন সদস্য নিয়ে তৈরী হয়েছিল এক কাউন্সিল—তাদের মতামত নিয়ে হেস্টিংসকে সব কিছু করতে হত। বারবার কাউন্সিলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তাঁকে। আর এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন হেস্টিংস-এর আজীবন শত্রু

স্যার ফিলিপ্ ফ্রান্সিস। স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হেস্টিংস কিছুতে কাউন্সিলকে সহ্য করতে পারতেন না।

ফিলিপ্ ফ্রান্সিস যেমন নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন—তেমনি অপরের ক্ষমতাকে তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। বিলাসী, জেদী, সারা কলকাতার এক সময় প্রধান আলোচ্য ব্যক্তি ছিলেন ফ্রান্সিস। মাদাম্ গ্র্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর প্রণয়কাণ্ডের কথা অনেকের জানা আছে। ধরা পড়ে গ্র্যাণ্ডের স্বামীর কাছে তিনি তখনকার দিনে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা, এই স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারেই ফ্রান্সিস্-হেস্টিংস ডুয়েল হয়েছিল। ধারণাটি ভুল। পিছনে অনেক কারণ থাকলেও আসলে হয়েছিল দুজন পৃথক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের মধ্যে পুরুষকারের দ্বন্দ্ব।

১৭৭৪ সনে ফ্রান্সিস যখন জাহাজ থেকে প্রথম কলকাতায় পা দিলেন, তখন ১৭ বার তোপ দাগা হয়েছিল। কথা ছিল ২১ বার। বনেদী পরিবারের ছেলে ফ্রান্সিস এতে অত্যন্ত চটে গেলেন। তারপর থেকে নানান ঘটনায় অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। হেস্টিংসের যুদ্ধনীতির উপর ফ্রান্সিস বারে বারে হাত দিতে লাগলেন।

চরম বিরোধ দেখা দিল ১৭৮০ সনে। শিগগিরই কাউন্সিলের মিটিং-এ হেস্টিংস্ তাঁর মিনিট পড়লেন। তাঁর আগে ফ্রান্সিস পড়লেন অসুখে—হেস্টিংস গেলেন গঙ্গার উপর দিয়ে পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে চুঁচুড়ায় বেড়াতে। বিলেত থেকে সকলেই পরবর্তী

ডেসপ্যাচের অপেক্ষা করছেন ; সম্ভবত হেস্টিংস আর গভনর জেনারেল পদে থাকবেন না।

১৫ই আগস্ট হেস্টিংস তাঁর বিখ্যাত নোট পড়লেন। বিরাট বক্তৃতা। ফ্রান্সিসের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে অনেক কথা তাতে ছিল। তিনি বললেন—

"I Judge of his public conduct by my experience of his private, which I have found to be void of truth and honour. এর অনেক প্রমাণ তাঁর হাতে আছে। তিনি লজ্জিত যে, এমন একজন লোকের উপদেশ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়।

ফ্রান্সিসের মুখ লাল হয়ে উঠল, একটি কথাও তখন বললেন না। বক্তৃতা শেষে হেস্টিংসকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনার বক্তৃতার একটি উত্তর আমি দেব। কিন্তু কোন কথায় এর উত্তর হতে পারে না একমাত্র শারীরিক আঘাতেই এর উত্তর হতে পারে। হেস্টিংস চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের স্থান এবং সময় ঠিক হয়ে গেল।

আলিপুর ব্রিজের পাশে স্থান ঠিক হয়েছিল। দিন ও সময় নির্ধারিত হয়েছিল ১৭ই আগস্ট ভোর সাড়ে পাঁচটায়। ফ্রান্সিস আগে থেকেই উপস্থিত। তাঁর সেকেণ্ড ছিলেন কর্নেল ওয়াটসন—যিনি তখনকার বাংলা দেশের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার। হেস্টিংস আসতেই ফ্রান্সিস অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, ছটা বেজে গেছে। হেস্টিংসের সঙ্গী বললেন, না, সাড়ে পাঁচটাই বাজে— ওদের ঘড়ি ভুল !

দ্বৈরথের স্থান অনেক বাছাবাছি হল। একজনের যেটা পছন্দ—অন্যজনের সেটা পছন্দ নয়। হেস্টিংস খুব শান্ত, তাঁর মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, দরকার হলে তিনি বড় রাস্তার উপর দাঁড়িয়েও লড়াই করতে পারেন। সকলে ইলাইজা ইম্পের বাড়ির দিকে এগুতে লাগলেন। পথে, মাঠের মধ্যে বটগাছের তলায় ফাঁকা জায়গা দেখে সেটাই পছন্দ হল।

সে সময় বিলেতে ফক্স আর অ্যাডাম্‌সের মধ্যে বিখ্যাত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধের নিয়মকানুন দুজনেই মেনে চলতে রাজী হলেন। চোদ্দ পা দূরে লাইনে দাঁড়াতে হবে—হেস্টিংস বললেন, বড় দূর, গুলি ঠিক লাগবে না।

ফ্রান্সিস পিস্তলটা পরীক্ষা করলেন। বারুদ জ্বলল না। সঙ্গে সঙ্গে বদলে নিলেন। তারপর সংখ্যা গুণে, দুজনেই নিয়ম। মেনে গুলি ছুঁড়লেন।

ফ্রান্সিস হাঁটু তুমড়ে পড়ে যেতে যেতে বললেন, আই অ্যাম এ ডেড ম্যান্।

হেস্টিংস বললেম, গুড্ গড্, আই হোপ্ নট্।

সকলে ছুটে এলেন ফ্রান্সিসের কাছে। হেস্টিংস তখনও শান্ত। তিনি বললেন, আমি এরকম আশা করিনি। আমি আশা করি, আপনার আঘাত গুরুতর হয়নি। যদি আপনার মৃত্যু হয়—আমি প্রধান শেরিফের কাছে আত্মসমর্পণ করব।

ফ্রান্সিস বললেন, এর আগে কখনও তিনি জীবনে পিস্তল ছুঁড়ে দেখেননি।

বাড়ি ফিরে হেস্টিংস্ চুঁচুড়ায় স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসলেন।

ফ্রান্সিস অল্পেই বেঁচে গেলেন। চলে গেলেন বিলেতে। কিন্তু তাঁদের শক্রতা শেষ হয়নি। হেস্টিংস্ যখন দেশে ফিরলেন, তখন তাঁকে লর্ড উপাধি দেবার কথা উঠেছিল। ফ্রান্সিস্ তার বিপক্ষে দাঁড়ালেন এবং বার্ক, সেরিডন্ প্রভৃতি বিখ্যাত বক্তাদের দলে টানলেন। তারপরই শুরু হল 'ইমপিচমেণ্ট অব ওয়ারেন হেস্টিংস্'। যে ইতিহাস সকলেরই জানা।

আজ কলকাতার মাত্র কয়েক শ' ফুট লম্বা একটা রাস্তার নামে সেই ইতিহাস এখনও জড়িয়ে আছে।

একটি দশটাকার কবর

নিখিল সরকার

নাঃ পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজি হল, কিন্তু কিছুতেই পাওয়া গেল না কবরটাকে। দশ টাকার চুন-বালি-ইটের সেই করুণ ইতিহাসটাকে।

পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপো অথবা বেগবাগান থেকে কাসিয়াবাগানের পথে কাসিয়াবাগান কবরখানা। ইংরেজদের যেমন সাউথ পার্ক স্ট্রীট সিমেট্রি, মুসলমানদেরও তেমনি কাসিয়াবাগান। দুই জায়গায় মাটির নীচে ইতিহাসের দুটি অধ্যায়। একই যুগ একই দেশ। শুধু দুটি ভিন্ন জাতি। একটি বিজয়ী, অন্যটি বিজিত। সাউথ পার্ক স্ট্রীট কবরখানায় নিদ্রিত সেই বিজয়ীদলের নায়কেরা, কাসিয়াবাগানে পরাজিত নবাবেরা।

সাহায্য করতে এগিয়ে এল দীন মহম্মদ। পাশের বস্তির একটি ছেলে। কবরখানাটা সে চেনে। এখানে যে নবাবদের মাটি দেওয়া হয়েছে তাও জানে। কোথাকার নবাব তা অবশ্য তার জানা নেই, কিন্তু দীন মহম্মদ উর্দু পড়তে পারে। সুতরাং উৎসাহের সঙ্গেই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সে আমাদের।

কাসিয়াবাগান কবরখানা। বলতে গেলে কলকাতার আদি

বনেদী মুসলিম কবরখানা। কিন্তু আজ তার দিকে তাকিয়ে কারও মনে হবে না সেকথা। মনে হবে না, এখানে মাটির নীচে ঘুমুচ্ছেন মহীশূরের নবাবজাদারা, অযোধ্যার খোদ নবাবেরা এবং এমনি আরও বড় মানুষেরা।

বিরাট এলাকা। কিন্তু কবর মোটে কয়টি। নবাবদের বেওয়ারিশ কবরখানায় আজ অবহেলার রাজত্ব। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্লাইউড-এর শয্যা বিছিয়েছে পাশের করাতকল, ফাঁকে ফাঁকেঘুঁটের আলপনা দিয়েছে প্রতিবেশী বস্তিবাসীর দল। দীন মহম্মদমাথা নাড়ল। সে বুঝতে পেরেছে, এর নীচ থেকে কোন নবাবকে খুঁজে বের করা তার কাজ নয়।

তবুও খুঁজলাম। খুঁজতে খুঁজতে ভোরের সূর্য এসে পৌঁছল অফিস-টাইমে। কিন্তু তবুও পাওয়া গেল না দশ টাকার সেই ঐতিহাসিক ইমারতটিকে। হয়ত এই সামান্য অর্থের বলে দেড়শ বছর একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি বেচারা। অস্বাস্থ্য আর অবহেলায় ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কোন কালে। কিংবা এমনও হতে পারে, হয়ত এই সামান্য কয়টি জীবিত কবরের মধ্যেই সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে আজও বেঁচে আছে সেই ঐতিহাসিক অবজ্ঞাটি।

ওয়াজির আলীর বিয়ের খরচা হয়েছিল তিরিশ লাখ টাকা, আর শেষকৃত্যে মাত্র সত্তর টাকা। কবর খরচা বেশী হলে দশ টাকা।

১৭৯৪ সন। মহা ধুমধাম করে নবাব আসফউদ্দৌলা বিয়ে দিলেন ওয়াজির আলীর। ওয়াজির তার ছেলে নয়, পোষ্যপুত্র।

তাই বলেই বা কেন কম খরচা করবেন নবাব আসফউদ্দৌলা। ওয়াজির আলী তাঁর উত্তরাধিকারী। অযোধ্যার ভবিষ্যৎ নবাব। সুতরাং, মাস ভরে উৎসব হল। দেশ-বিদেশের লোকেরা নেমন্তন্ন পেল। ওয়াজির আলীর বিয়েতে পাকা তিরিশ লাখ টাকা খরচ হল।

তিন বছর পরে, ১৭৯৭ সনে বিদায় নিলেন আসফউদ্দৌলা। অযোধ্যার সিংহাসনে বসলেন তরুণ নবাব ওয়াজির আলী। হয়ত, নবাবের মতই বেঁচে থাকতেন তিনি, হয়ত মৃত্যুর পর কবরস্থ হতেন রাজকীয় মর্যাদায় কিন্তু ওয়াজির আলী ছিলেন সিরাজ-উদ্দৌলার মতই অসহিষ্ণু নবাব।

সুতরাং, সিংহাসনে ভাল করে বসতে না বসতেই ইংরেজরা জানতে পেলেন, ওয়াজির আলী তাদের শত্রু। ইংরেজদের পরাজিত করতে না পারলেও অপদস্থ করাই তাঁর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

সময় থাকতে ইংরেজরা সাবধান হলেন। তাঁরা ওয়াজির আলীকে সহসা সিংহাসনচ্যুত করলেন। বিগত নবাবের পুত্র সাদত আলী এ ব্যাপারে সহায়ক হলের তাঁদের। পুরস্কার স্বরূপ সাদত আলী অযোধ্যার সিংহাসন পেলেন, ওয়াজির আলী পেলেন নির্বাসন দণ্ড।

অসহায়ের মত ওয়াজির আলী মেনে নিলেন সে দণ্ড। লখনউ থেকে তিনি বেনারস এলেন। বেনারসের রেসিডেন্ট মিঃ জর্জ চেরীর দরবারে ডাক পড়ছে এর পর তিনি কোথায় যাবেন!

যথাসময়ে মিঃ চেরীর দরবারে ডাক পড়ল পদচ্যুত নবাবের।

সেদিন ১৪ই জানুয়ারী, ১৭৯৯ সন। ওয়াজির আলীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য মিঃ চেরী বাইরে এসেছেন। এসেই চমকে উঠলেন তিনি। ওয়াজির আলী একা আসেনি তাঁর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। সঙ্গে এসেছে রাশি রাশি 'সোয়ারী', নবাবের অনুগত ফৌজ। পালাবার আর তখন পথ নেইসামনে। মিঃ চেরী সোয়ারীদের হাতে প্রাণ হারালেন—মারা গেলেন, ক্যাপ্টেন কনওয়ে এবং মিঃ গ্রাহাম।

ওয়াজির আলীর ক্ষিপ্ত অনুচরেরা চলল তখন জজ সাহেবের কুঠীর দিকে। অসীম বীরত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র একটা বর্শা দিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন বিচারপতি মিঃ ডেভিস। অনুচরদের নিয়ে ওয়াজির আলী পালিয়ে গেলেন বেরার।

বেরারেই ইংরেজদের হাতে অবশেষে বন্দী হলেন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে চালান দেওয়া হল কোম্পানীর রাজধানীতে কলকাতায়। তারপর শুরু হল সেই লজ্জাকর শেষকৃত্যের প্রস্তুতি।

ইংরেজদের তথাকথিত বিচারে কলকাতায় অযোধ্যার ভূতপূর্ব নবাবের স্থান হল ফোর্ট উইলিয়ামের একটা অন্ধকার ঘরে, একটা লোহার খাঁচায়। চরম অবহেলার মধ্যে আজন্ম ঐশ্বর্যলালিত নবাব বন্দী জীবন যাপন করে চললেন। রাজকীয় বন্দীর জন্যে সামান্য মানবিক কর্তব্যগুলোও পালন করা সঙ্গত মনে করলেন না ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। এমনকি, সময় মত পাহাহারের বন্দোবস্তটুকুও করেননি তাঁরা। ওয়াজির আলী পেট ভরে খেতে পেতেন না,—বরাদ্দের বেশী এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেওয়া হত না তাঁকে।

তবুও ইংরেজদের তৎকালীন বর্বরতার সাক্ষী হয়ে দীর্ঘ সতের বছর কয়েক মাস ফোর্ট উইলিয়মে বেঁচে ছিলেন আসফ-উদ্দৌলার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী। অবশেষে ১৮১৭ সনের মে মাসে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে লোহার খাঁচাটিকে ফাঁকি দিয়ে চিরকালের মত ইংরেজদের নাগালের বাইরে চলে গেলেন বিদ্রোহী নবাব।

মৃত্যুর পরেও যেন ইংরাজরা শান্ত হলেন না। ওয়াজির আলীর উপর তাঁদের প্রতিশোধের তখনও কিছু বাকী। কাসিয়াবাগান কবরখানায় এই সেদিন অবধিও ছিল তাঁদের সেই শেষ নৃশংসতার সাক্ষীটি। দীন মহম্মদ জানে না—সেটিকে মুছে ফেলে ইংরেজের কত উপকার করেছে তারা।

মৃত্যু সংবাদ শোনা মাত্রই ফোর্টউইলিয়ম কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন ওয়াজির আলীর শেষকৃত্যে যেন সত্তর টাকার বেশী খরচা না হয়। ইংরেজেরা জানত, তেইশ বছর আগে—এই তরুণটি যখন বিয়ে করে, তখন খরচ হয়েছিল নগদ তিরিশ লাখ টাকা। অনেক বড় বড় সাহেব নেমন্তন্নও পেয়েছিল সেই বিয়েতে। সুতরাং, এবার হুকুম হল, সত্তর টাকার বেশী নয়! —অর্থাৎ আর আর খরচ মিটিয়ে কবরের জন্য শেষ পর্যন্ত দশটা টাকাও থাকবে কিনা সন্দেহ।

অযোধ্যার নবাবকে দশ টাকায় কেন কবর দিতে চেয়েছিলেন ইংরেজরা? মানুষকে মানুষের নিয়তির কথা শেখাতে চেয়েছিলেন কি তাঁরা? অথবা মর্ত্যে ঈশ্বরের বিচার দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁরা?-কিংবা ইতিহাসকে নিজেদের হীনতা দেখাতে!

কাসিয়াবাগানের কবরখানা অনেকদিন অনেক মানুষকে দেখিয়েছে তা। আজ যদি একান্তই তা নজরে না পড়ে আপনার, তাতেও বোধ হয় ক্ষতি নেই তেমন। কেননা, ওয়াজির আলীর সেই দশ টাকার কবরটি না থাকলেও তাঁর ইতিহাসটি আছে আজও।—হয়ত থাকবে চিরকাল।

গরুর পুকুর

হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অবাক হলেন নাকি। বিশ্বাস করতে পারছেন না বুঝি যে, গরুর জন্য পুকুর হতে পারে। অস্বাভাবিক মনে হলেও অবাস্তব নয় কিন্তু। এই কলকাতাতেই আপনার অতিপরিচিত স্থানেই আছে সেই পুকুরটি।

ছুটির দিন কাঠ-ফাটা রোদ্দুর। দুপুরবেলা ঘর থেকে বের হতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বের হতে হল—কারণ চৌরঙ্গী চত্বরে একটা বিশেষ জরুরী কাজ ছিল। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ফুটপাত দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি কিছু লোক এদিক ওদিক ছুটছে। এধার ওধার তাকাতেই দেখি যে, এক বিরাটকায় ষাঁড় শিং উঁচিয়ে কান খাড়া করে ছুটে আসছে। আর লোকগুলোও চারিদিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে ষাঁড়টি ফিরলো হোটেলের ঠিক বিপরীত দিকে যে বড় পুকুরটি আছে, তাতে নেমে পড়ল। কৌতূহলী জনতার সঙ্গে আমিও পুকুর ধারে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে, ষাঁড়টি তার তৃষ্ণা নিবারণের জন্যই জলে নেমেছে। কয়েক সেকেণ্ড ধরে প্রাণভরে জল খেয়ে ষাঁড়টির স্থান ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই

আশপাশের ভিড় কেটে গেল। আমি কিন্তু জনতার সঙ্গে এলেও তার সঙ্গে গা ভাসিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারলাম না। পুকুরটির চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে একপাশে একটি প্রস্তর ফলকে দেখতে পেলাম স্পষ্ট করে লেখা আছে "মনোহর দাস তড়াগ।"

বলা বাহুল্য, এই বৃহৎ পুকুরটির ধার দিয়ে ট্রামে করে বা পায়ে হেঁটে যে কতবার গেছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোন-দিন ঐ ফলকটির দিকে তেমন করে তাকাইনি যেমন করে তাকিয়েছিলাম সেদিন। এখনো তো কত হাজার হাজার লোক সেই পথ দিয়ে ট্রামে উঠে বা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে—কিন্তু ক'জনই বা খবর রাখে যে, এই পুকুরটির সঙ্গে এক অবজ্ঞাত জীবের জন্য এক পূণ্যকামী পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে?

বস্তুতান্ত্রিক পৌর-জীবনের পৌর-প্রতিষ্ঠান তার নগরবাসী নিয়েই ব্যস্ত। তার সুখশান্তি ও আনন্দবর্ধনই হচ্ছে নগর পিতাদের একমাত্র চিন্তা! কিন্তু মহানগরীর জীবনে অবলা জীবের কথা কি মোটেই ভাববার বস্তু নয়! সত্যই তাদের তো কোন প্রতিনিধি নেই যে, তাদের হয়ে কথা বলবে। তাই হয়তো জীবের সেই করুণ আর্তনাদ শুনেই আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর পূর্বেই শ্রীমনোহর দাস নামে এক পূণ্যবান ব্যবসায়ী কলকাতার ময়দানে যাদুঘরের বিপরীত দিকে এই বৃহৎ পুষ্করিণীটি কাটিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, গরুরা এই পুকুরে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। সরকারী নথি-

পত্রে প্রকাশ যে, গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়েই শ্রীমনোহর দাস এই পুকুরটি খনন করান। কারো কারো মতে, এখানে নাকি আগেই একটি ছোট ডোবার মত ছিল। কিন্তু একথা ঠিক যে, বর্তমান বৃহদাকার পুকুরটি মনোহরবাবুই নিজ খরচায় খনন করিয়েছিলেন জীবের কল্যাণের জন্য।

ব্যবসায়ী হিসাবে মনোহরবাবু ছিলেন সুপরিচিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে তিনি ছিলেন তাদের ব্যাঙ্কার। কাশী নিবাসী গোপাল দাস সাহের পুত্র ছিলেন মনোহরবাবু। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি গরুর জল খাওয়ার জন্য প্রায় দুই বিঘা জমির উপর এই পুকুরটি খনন করেন।

কেবল জল পানই নয়। শহর জীবনে তৃণভোজী প্রাণীর খাদ্যের কি দুর্দশা হবে তা তিনি তার দিব্যদৃষ্টিতে তখনই বেশ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই পুকুরের চারপাশে একশত বিঘা জমি কিনে তাতে গো-চারণের জন্য ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আজ তার অধিকাংশই বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের তাঁবুর শোভা বর্ধন করছে। কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকে এখনও কিছু ফাঁকা জায়গা আছে। তবে সেখানে এখন গোচারণ অপেক্ষা মনুষ্য বিচরণই প্রধান। মুক্ত বায়ু সেবন করে অজ্ঞাত দাতার নামে দমবন্ধ শহরবাসী সকাল-বিকাল সেখানে মাঝে মাঝে হয়তো প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করে। ভক্তপ্রাণ মনোহরবাবু পুকুরের চারকোণে ছোট ছোট চারটি মন্দির করে তাতে শিব, বিষ্ণু, দেবী ও সূর্যের মূর্তিও স্থাপন করেছিলেন। তখন পূণ্যার্থী শহরবাসীর নিয়মিত পূজাও লাভ করতেন দেবতারা। আজও সেই চারকোণে

মন্দির কটি চোখে পড়বে—পড়বে না কেবল বিগ্রহগুলি। আজ আর সে স্থান প্রস্তরনির্মিত দেবমূর্তির আশ্রয়স্থল নয়—তা হয়েছে রৌদ্রে তপ্ত শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি নিবারণের শীতল নীড়। মনোহরবাবুর পূণ্য কীর্তি কেবল এই কলকাতার ময়দানেই সীমাবদ্ধ নয়—কাশী, বৃন্দাবন, গয়া প্রভৃতি তীর্থ-ক্ষেত্রেও বহু মন্দির, কুণ্ড ও ফলক নির্মাণে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি।

পূর্বেই বলেছি, ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর নাম ভারতে সুপরিচিত। কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে 'মনোহব দাস কাটরা' তাঁরই তৈরী। এই 'মনোহর কাটরাই' হচ্ছে আসল বড়বাজার। বড়বাজারে মনোহর দাস স্ট্রীট তাঁরই নামে। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে আজ বড় বড় কাটরা স্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তির স্বার্থ ছাড়া সমষ্টির স্বার্থও দাস পরিবারের কাছে অনাদৃত হয়নি। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও দাস পরিবারের সক্রিয় সাহায্য ছিল। ডাঃ ভগবান দাস ও তাঁর পুত্র শ্রীশ্রীপ্রকাশ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। অতীতের এই পুকুরটির শ্রী আজ বিলুপ্তপ্রায়। সংস্কারের অভাবে পুকুরটি মজে যাচ্ছে। এখন গরুর চাইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষই এর প্রধান ব্যবহারকারী। তাপদগ্ধ পথচারী ও পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের এটি হচ্ছে স্নানাদি করবার প্রধান

অবলম্বন। মাঝে মাঝে রৌদ্রতপ্ত সারমেয়রাও জলের সন্ধানে এ-পুকুরে এসে তৃষ্ণা নিবারণ করে। সেদিনকার গরুর পুকুর আর আজ কেবল গো-পুকুরই নেই—জীব জগতের সকলের কল্যাণেই সে ব্যবহৃত হচ্ছে—কি মানুষ, কি জন্তু। এ পুকুরেব জল যেন আজ বলছে যে, সে বহুজন হিতায় ও বহুজন সুখায়।

টাওয়ার অব সাইলেন্স

অশোক ভট্টাচার্য

নির্জন দুপুরে এখানটায় এই বেলেঘাটা মেন রোডে এসে বসে থাকতে থাকতে কেমন গা ছমছম-করা একটা রহস্যময় আবহাওয়া ঘিরে ধরে। তবু আসি কেমন যেন নেশার আমেজ লাগে। সময়টাও বেছে নিয়েছিলাম দুপুরবেলা, যখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পিচগলা রাস্তার দু-পাশের অশ্বত্থ আর কৃষ্ণচূড়ার নতুন-গজানো পাতায় হাওয়ার কাঁপন লাগে আর জনবিরল পথের ধারে বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে সাঁ করে সরকারী বাসগুলো ছুটে যায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নতুন তৈরী বাড়িটার দিকে ঠিক তখনই বেরিয়ে পড়ি—প্রচণ্ড সূর্যটাকে মাথায় রেখে এসে দাঁড়াই 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এর অনতিউচ্চ প্রাচীরটার সামনে।

মস্ত ফটকটা একটুখানি ফাঁক করা। ভিতরে প্রবেশ—নিষেধ। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়েই কল্পনার তৃতীয় নেত্রে দেখি ওপারে সীমাহীন রহস্যের গোপন ভাণ্ডার। টাওয়ারের চূড়াটা চোখে পড়ে। দূরের বটগাছটার ওপর এক ঝাঁক শকুন নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এর মৌনতাকে আরও নিঃশব্দ করে তুলছে ওরা। কখন একটি মৃতদেহ আসবে,

নীরবে সেটিকে তুলে দেওয়া হবে টাওয়ারের চূড়ায়। তারপর সেই মৃতদেহের সৎকার ঘটাবে শকুনকুল।

'টাওয়ার অব সাইলেন্স-এর মৌনতা ভেঙে খান খান হয়ে যাবে শকুনের ডানার ঝাপট আর অবিশ্রান্ত চিৎকারে। পরিতৃপ্ত হয়ে ওরা ফিরে যাবে নিজেদের আস্তানায় আর কয়েকটি জীবিত প্রাণীর দেহ ধারণের জন্য আপন দেহটিকে উৎসৃষ্ট হতে দেখে একটি মৃত আত্মা হয়তো পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে পঞ্চভূতে।
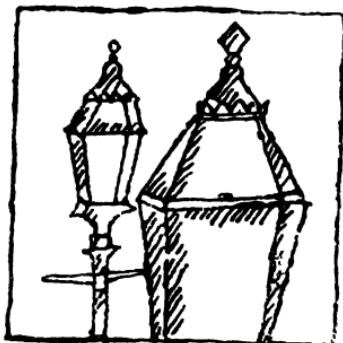
কল্পনাটিকে আরও অতীতের দিকে প্রসারিত করে দেওয়া যেতে পারে। স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় কোম্পানী বাহাদুরের কলকাতা থেকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতা গড়ে উঠছে ঐশ্বর্যে-বাণিজ্যে-বিদ্যায়। দুনিয়ার যাবৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় এসে বাসা বেঁধেছে কলকাতায়। কলকাতা এখন 'কসমোপলিটান'। ভারতবর্ষের বিত্তবান উদীয়মান বণিক-শ্রেণীর বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতা আদর্শস্থল। এঁদের মধ্যে অগ্নি-উপাসক পার্শী সম্প্রদায় যেমন বিত্তে তেমনি বিদ্যায়ও অগ্রসর। কলকাতার পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতের হার ইংরেজদের পরেই শতকরা প্রায় ষাট জন। সোরাবজী পরিবার দীর্ঘকাল বাংলাদেশের বাসিন্দে। বাংলা দেশের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগটা এত ঘনিষ্ঠ যে তাঁদের পদবীর শেষে 'বেঙ্গলী' শব্দটা যোগ হয়ে গিয়েছিল। সোরাবজী শাপুরজী বেঙ্গলী ছিলেন গত শতকের অষ্টম দশকে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার বিশিষ্ট সদস্য। তাঁর পিতামহ নওরোজী সোরাবজী বেঙ্গলী ছিলেন কলকাতার পার্শী

সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যবসায়ী এবং প্রচুর অর্থের মালিক। তাঁরই প্রচেষ্টায় এই 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'টি গড়ে ওঠে, কলকাতার পার্শী-সম্প্রদায়ের বিত্তশালী বহু ব্যক্তিরই অবদান রয়েছে এর পিছনে, তবে মূলতঃ নওরোজীরই ভূমিকা ছিল প্রধান। ১৮২৯ সালের ২৮শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিক ভাবে 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এর উদ্বোধন হল বেলেঘাটায়। পূর্ব এশিয়ায় এই প্রথম এবং সম্ভবতঃ পার্শীদের একমাত্র শেষকৃত্য ভূমি। আজও সুদূর রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, মালয় থেকে পার্শীদের শবদেহ বহন করে আনা হয় এই কলকাতায়, কলকাতার এই নিস্তব্ধ গম্বুজটির শীর্ষে।

এই দীর্ঘ একশো একত্রিশ বছর ধরে 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এর স্তব্ধ প্রাচীরে কলকাতার বিবর্তনের অনেক চিহ্ন আঁকা হয়ে আছে। আজকের বেলেঘাটা হয়ে উঠেছে জনবহুল : টাওয়ারের চারপাশ বেষ্টন করে তৈরী হয়েছে অ্যাসফল্টের দীর্ঘ পথের সারি, আধুনিক ছাঁদের অগুনতি বাড়ি গড়ে উঠেছে টাওয়ারের উল্টো দিকে, তৈরী হয়েছে বৃহদায়তন হাসপাতাল। এই নিতান্ত আধুনিকেরা কি করে জানবে একশো তিরিশ বছর আগেকার বেলেঘাটার বিরল-বসতি, জলা-জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলের শেয়ালের ডাক আর দিনমানের রাহাজানির সংবাদ? 'টাওয়ার অব সাইলেন্স' তা দেখেছে। শেয়ালদা পেরোলেই বেলেঘাটার ভুতুড়ে রাজত্ব। নতুন খালটিও তখন পর্যন্ত কাটা হয়নি। ৩০শে মে ১৮২৯-এর সংবাদ : "সম্প্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের রাজপথের শোভা করিবার জন্য মোকাম পূর্ব অঞ্চল হইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া পুরাতন বেলেঘাটা পর্যন্ত যাইয়া

মিলিবে শুনিতে পাই যে ঐ খাল নূতন বেলেঘাটা দিয়া অনায়াসে যাইতে পারিবেক— ।” ‘বৃহৎ খাল’ অর্থাৎ বেলেঘাটার এপার-ওপারের মাঝখানের খালটি কাটা হয়েছিল, বলাই বাহুল্য, জলপথে যাতায়াতের সুবিধের জন্যে। খালের ওপারে তখন পুরাতন ‘বেল্যাঘাটা’র অনড় স্তব্ধতা। এপারে নূতন বেল্যাঘাটা মুখরিত হয়ে উঠেছে, ‘টাওয়ার অব সাইলেন্স’ পুরাতন বেল্যাঘাটার পুরাতন অধিবাসী। অনেক দেখা-অদেখা, অনেক জানা-অজানা ইতিহাসের সাক্ষী।

‘টাওয়ার অব সাইলেন্স’-এর আশেপাশে যদি ঘোরেন তাহলে সেই অতীত ইতিহাসের একটু পরিচয় পেতে পারেন।

একটি মুদির দোকান

অমরেন্দ্র দাস

সর্বদেশীয় মেয়েদের নামের মিলন যদি দেখতে চান—তাহলে চলে আস্থন এই স্টীমার ঘাটে। দেখবেন, থরে থরে গঙ্গার বুকের উপর সাজানো আছে—আপনাদের বাড়ির গীতা থেকে ও দেশের কেটি পর্যন্ত। গীতার পাশে কেটি, কেটির পাশে মার্গারেট। কোন শ্রেণীবিভাগ নেই, সবাই এক। সবাই পাশাপাশি গঙ্গার বুকের উপর দুলছে। দুলতে দুলতে নাচতে নাচতে বাঁশি বাজিয়ে জল কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে বহুদূর। গঙ্গার এপার ওপার। যাত্রীদের পৌঁছে দিচ্ছে তাদের গন্তব্যস্থানে। আবার ফিরে আসছে এক বোঝা নিয়ে। নামিয়ে দিচ্ছে এসে এই ঘাটে। এই চাঁদপাল ঘাটে। ঘাটের পুরনো কাঠের পাটাতনের উপর। যাত্রীরা চলে যাচ্ছে জুতো মচমচিয়ে ঘাটের হেলান সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির মুখে টিকিট-কালেক্টর। টিকিট চেয়ে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে যাত্রীদের। যাত্রীরা কলকাতার জনারণ্যে মিশে যাচ্ছে।

এই চাঁদপাল ঘাট শিয়ালদহ স্টেশনের মত একটি স্টেশন। তবে রেল-স্টেশন নয়, স্টীমারের স্টেশন। এই স্টেশনের একটি

টিকিট-ঘর আছে। তার মাথার উপর লেখা আছে "ফেরি সার্ভিস বুকিং অফিস"। কয়েকটি ছোট ছোট ফোকর আছে, সেই ফোকরের ওধারে দুটি লোক সর্বদা যাত্রীদের সুবিধার্থে রয়েছেন। তাঁরা সর্বদা যাত্রীদের চাহিদা মিটিয়ে চলেছেন।

তারপর আছে দুটি গেট। হেলান সিঁড়ি সেই গেট থেকে কাঠের পাটাতন পর্যন্ত নেমে গেছে। গেটের মাথার উপর মাসিক টিকিটের সুব্যবস্থার জন্য প্যাসেঞ্জারদের নির্দেশ দেওয়া আছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে কাঠের পাটাতনের উপর কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক বেঞ্চি। বেঞ্চিতে বসতে ভয় করে। ভেঙে পড়ার ভয় আছে। তবু বসতে হয়। কারণ উপায় নেই, ফেরিস্টীমার আসার বিলম্ব আছে।

সেই বেঞ্চিতে বসে ঘাটের চারদিকে তাকালে একটা ঝরঝরে পুরনো দৃশ্যের উপর চোখ পড়ে। চারদিকে ধূসর আচ্ছাদনে বহু বর্ণের ছোপ-পড়া ফেরিস্টেশন। মাথার উপর কাঠ দিয়ে উঁচু করা দুটি গম্বুজ। গম্বুজের গায়ে শিল্পীর আঁকি-বুকি। কাঠের পাটাতনের উপর কয়েকটি ঝরঝরে মার্কাঘর। ঘরে অবশ্য ঘরণী নেই। ঘরবাসী আছে। ঘরবাসীরা গঙ্গার মাঝি। ঘরের মাথায় একটুকরো কাঠের উপর বিবর্ণ লেখা চোখে পড়ে—"চাঁদপাল ঘাট, দি স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড।"

তারপর সামনে দিগন্ত প্রসারিত আকাশ। নীলের সমারোহে। নীচের দিকে তাকালে উন্মুক্ত জলরাশি। অজস্র ঢেউ বুকে নিয়ে জাহাজ, স্টীমার, নৌকার সঙ্গে খেলা করছে।

বড় বড় নৌকা চলেছে মাল বোঝাই হয়ে। স্টিমার চলেছে মোটরের মত দ্রুত। তাদের বাঁশির শব্দে কানে তালা লাগে। গঙ্গার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে একটা প্রচণ্ড কলরোল ওঠে। বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে এই চাঁদপাল ঘাটেরই পিঠ ঘেঁষে। তাদের প্রচণ্ড দেহ দেখে ছোট্ট বুকে ভয়ের ছোঁয়া লাগে। কোন জাহাজটা জাপানের, কোনটা আমেরিকার, কোনটা ব্রিটেনের কিন্তু সব জাহাজের উপরই আমাদের জাতীয় পতাকা, আমাদের গর্ব।

এবার চলে আসুন আরএকবার এই চাঁদপাল ঘাটের কোল ঘেঁসে। পাশে বাবুঘাট। বাবুঘাটের মাথার উপর ইটের দেয়ালের বুকে লেখা আছে—১৮৩০ সন। বাবু রাজচন্দ্র দাস এই ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছেন। তাঁরই নামানুসারে এই ঘাটের নাম হয়েছে—বাবুঘাট। এ সব নাম ও সনের দিকে হয়ত কেউ লক্ষ্য করেন না। করলেও তাঁকে নিয়ে আর কোন চিন্তা এগোয় না। কিন্তু এই সন ধরে আর এক সনের গোড়ার দিকে যাওয়া যায়, তখন তৃতীয়বার জব চার্নক ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে এই কলকাতায় এসেছিলেন। জব চার্নকের শুভাগমনের পর থেকে কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলের ঠিকুজি পাওয়া যায়। তা না হলে সবই তো জঙ্গল। জঙ্গল আর বাদাভূমি। দিনে বাঘ, রাতে ডাকাত। কে থাকবে এই ভবিষ্যতের শহরে?

কিন্তু এই জঙ্গলময় দেশের এই জায়গাটিতে ছিল কয়েক ঘর তন্তুবায়। ছিল পর্ণকুটির। আর প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। ব্যবসা হত সম্ভবত গঙ্গা কাছে থাকার জন্যে। যেখানে

ব্যবসা, লেনদেন সেখানে লোকজন। সুখ, দুঃখ, হাসি-ঠাট্টা, কলস্বরে মুখর, নিশ্চয় তখন এখানে বহু লোকের সমাগম হত। বহুলোক এখানে এসে দিন-কয়েক বসবাস করে যেত। তাই তখনকার দিনে এই জায়গাটিকে অনেক লোকে চিনত। কান টানলে যেমন মাথা আসে, লোক থাকলেও প্রয়োজনীয় জিনিসের দরকার হয়। তাই একটি মুদির দোকান থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। একটি কেন অনেকগুলি থাকলেও থাকতে পারে, তবে একটি মুদির দোকানের কথাই শোনা যায়। সে দোকানের মালিকের নাম ছিল চন্দ্রনাথ পাল। চন্দ্রনাথ এই অঞ্চলে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বোধ হয় ধারে জিনিস দিত বলে এই সুনাম। তবু যা হক, তাতে যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—এই যথেষ্ট। ধার তো সবাই দেয়, কে কত বিখ্যাত হয় আজকাল ?

সেই চন্দ্রনাথ পালের নামানুসারে চাঁদ পাল ঘাট। একটু অবিশ্বাসও জাগে। সামান্য একজন মুদির নাম কলকাতা শহরের বুকে অমর হয়ে রইল ? কিন্তু অবিশ্বাস করলেও উপায় নেই। অবিশ্বাস করলে মুদি চন্দ্রনাথ পালকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায়। উড়িয়ে দেওয়া যায় না চাঁদ পাল ঘাট। কারণ চাঁদ পাল ঘাট এখনও বর্তমান। তাই সেই মুদির নামকেই মনে মনে জপ করে তাকে বিখ্যাত করতে হবে। হোক সে মুদি। তবু সে এই শহরের একজন বিখ্যাত লোক।

গঙ্গার এই কূলে এই চাঁদ পাল ঘাটই ছিল সেদিন জাহাজ

ভিড়াবার একমাত্র জায়গা। বলতে গেলে, সেকালের 'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া'।

এখানেই এসে নেমেছিলেন একদিন ভারতে কোম্পানি রাজত্বের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। দূরে, ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের কেল্লা থেকে তোপ দেগে অভিবাদন জানান হয়েছিল তাঁকে।

কিছু পরে কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিসও এসে নেমেছিলেন এখানে। এই চাঁদ পাল ঘাটে দাঁড়িয়ে—মনে মনে 'এক দুই' করে তিনি গুণেছিলেন, দূরের কেল্লার তোপধ্বনি!—কৈ হেস্টিংসের সমান হল না ত? কেন কম তোপ দাগান হবে তাঁর বেলায়? তিনি কি কম সম্মানী?

শোনা যায় হেস্টিংস আর ফ্রান্সিসের ঐতিহাসিক শত্রুতার সেই শুরু।

এমন আরও অনেক ইতিহাসের শুরু ও শেষ এখানে। এই চাঁদ পাল ঘাটে।

কিন্তু সেই চন্দ্রনাথ পালের মুদির দোকান কোথায় ছিল? চাঁদপাল ঘাটের পাশে রাস্তার ধারে ওড়িয়া পাণ্ডাদের চালা-ঘরের ভিতর উঁকি দিয়েও মিলল না তার অস্তিত্ব? মিলল শুধু কতকগুলি স্নানযাত্রীদের কপালে ছাপ দেওয়ার দোকান আর পান, বিড়ি, ডাবের দোকান। তবু বিশ্বাস করতে হবে যে, মুদির দোকান ছিল। সে দোকান প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, আর ছিল চন্দ্রনাথ পাল। কারণ প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসে আছে তার নাম।

খালাসীটোলা কোথায় জানেন ?

বিনায়ক হাজরা

কলুটোলা, বেনিয়াটোলা, আহেরীটোলা, শাঁখারীটোলা, কপালীটোলা ইত্যাদি ইত্যাদি কলকাতার যাবতীয় 'টোলা' হয়ত আপনারা চেনেন। এ শহরের বাল্যজীবন সম্পর্কে যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা হয়ত এটাও জানেন যে, আজকের ওয়েলিংটন স্কোয়ার ছিল এককালে ব্যাপারীটোলা এবং মার্কুইস স্ট্রীটের নাম ছিল সেকালে জোড়াটোলা। জেলিয়াটোলায় অবশ্য জেলেরাই থাকত তখন, এবং চুনারী টোলায় হয়ত চুনের কারবারীরা, কিন্তু জোড়াটোলায় নিবাস ছিল যাদের তারা দুটি যমজ পুকুর! 'তড়াগ' থেকে 'টোলা' শুনে চমকে উঠবেন না যেন। কেননা, এ শহরে এমনটাই রীতি। এখানে ফাঁসী ফ্যান্সি হয়, রস পাগল নাম নেয় রসা রোড এবং আরও আরও কত কি?

সবই হয়ত জানেন ইতিহাসের পাঠক। কিন্তু খালাসী-টোলা কোথায় জানেন কি কেউ? জানেন না। কেউ কেউ হয়ত শুদ্ধ অনুমানের উপর ভর করেই বলে বসেন—খালাসী-টোলা খিদিরপুরে নিশ্চয়, কেননা, খিদিরপুর কলকাতার বন্দর এবং খালাসীরা নিশ্চয় বন্দরের বাইরে থাকবে না।' হাতে একখানা

স্ট্রীট ডাইরেক্টরি নিয়ে হয়ত এগিয়ে আসবেন কলকাতার গাইড-বাবু। বলবেন, অনুমান তোমার ঠিক।—এই দেখ খালাসী-টোলা রোড রয়েছে ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে। অর্থাৎ ওয়াটগঞ্জে। পাশেই রয়েছে 'খালাসী টোলা' বস্তি লেন।—হুঁ!

সত্য কথাই বলেছেন তিনি। খিদিরপুরে খালাসীটোলা বস্তি লেন পর্যন্ত আছে একখানা। সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী সেটি তারকা চিহ্নিত লেন। অর্থাৎ কোন জনবসতি নেই সেখানে।

কিন্তু যে খালাসীটোলার কথা বলছি আমরা, সেখানে মানুষের সমুদ্র। এবং সেই জনসমুদ্র খিদিরপুরের বন্দর ছাড়িয়ে অনেক দূরে,—খাস ডাঙ্গায়। অর্থাৎ খাস কলকাতায়। দিনরাত তার উপর দিয়ে চলেছে ট্রাম-বাস, মোটর, মানুষ। কিন্তু কেউ জানে না, খালাসীটোলার বুকের উপর দিয়ে চলেছে তারা। এমনকি বোধ হয় এ এলাকার আজকের খালাসীরাও জানেন না সে খবর।

কারণ, জানবার কোন পথ নেই। কলকাতার ইতিহাসে ফেনউইক বাজার (Fenwick Bazar) পুরানো এলাকা। কর্পোরেশনের খাতায় আজও আছে তার নাম সবাই জানে, ফেনউইক বাজার মানে তেরো নম্বর ওয়ার্ড। ওয়েলেসলির এবং চৌরঙ্গীর টুকরো নিয়ে গড়া একটা অঞ্চল। এটাও জানেন অনেকে যে, এই ওয়ার্ডে অদ্ভুত অদ্ভুত নামের রাস্তা আছে। (যথা কোরা-বরদার লেন), তেমনি আছে একাধিক মরা রাস্তাও (যেমন—বেটরাম স্ট্রীট)। কিন্তু সেই অদ্ভুতের তালিকায়

কোথায়ও নেই—কোন খালাসীটোলা স্ট্রীট, লেন কিংবা বাই লেন। এমনকি খুঁজে হয়রান হয়ে গেলেও মিলবে না তাকে মৃতের তালিকায়। কেননা কলকাতার পুরাকাহিনীতে কিছু বাঙালী লস্করদের উল্লেখ থাকলেও কোথাও নেই ওয়েলেসলি স্ট্রীটের কোলে এই খালাসীটোলার কাহিনী। কটন, বাস্টাডের ইয়া-ইয়া বই ; বেইলি আপনজনের বিস্তারিত মানচিত্র—কোথায়ও না।

অথচ, ওয়েলেসলিতে সত্যিই আছে খালাসীটোলা, আজও আছে। ট্রাম থেকে নেমে পড়ুন একবার। কিংবা দাঁড়িয়ে যান ব্রেক কষে। দেখবেন, কলুটোলা বা বেনিয়াটোলা আজ যে অর্থে সত্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য, অনেক বেশি স্পষ্ট এই খালাসীটোলা।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের সামনে যদি নামেন আপনি, তাহলে উল্টোদিকের বাড়িগুলোর একটি অন্তত আপনাকে জানাবে যে, সে জাহাজীদের আড্ডাখানা। পরিচয়লিপি অনুযায়ী বাড়িটি সী-মেনস অ্যাসোসিয়েশনের একটি আপিস।

কিন্তু এহ বাহ্য। একটি আপিসের জন্য একটা গোটা এলাকাকে খালাসীটোলা বলে ধরে নিতে বলছি না আমরা। এগিয়ে চলুন আরও দক্ষিণে মুসলিম ইনস্টিটিউটের দিকে। মুসলিম ইনস্টিটিউটের উল্টোদিকে যেকোন গলিতে ঢুকুন, যতদূর খুশি চলে যান ভেতরে। দেখবেন, আপনার ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্র খালাসীটোলা। রাস্তার নেমপ্লেটে নয়, শত শত মানুষের চোখে মুখে এবার আপনি পড়তে পারেন সে পরিচয়লিপি।

এই এলাকায় যত বাড়ি, তার চেয়ে বেশি হোটেলখানা। দু' পা চলতে না চলতে সরাই। সরাইখানায় অসংখ্য মানুষ। অন্তরঙ্গ আড্ডা। গ্রামোফোনে বোম্বাইয়ের গান। লোকগুলোর মুখে মুখে ভিন দেশের গল্প। কারও ছুটি শেষ হয়ে এল। এবার যেতে হবে কেপটাউনে। কেপটাউনে শুনেই চমকে উঠল কোণের বুড়োটা ঃ ক্যাপটোন-এ যাত্তিছ বাই, বড় বদ জাইগা! দ্বিতীয় একজন আপত্তি জানাল ঃ বদ যদি হয় তবে সে পোর্টসৈদ নয়ত আলেকজান্দ্রিয়া।—কেপটাউন নয় চাচা।

আফ্রিকা থেকে মুহূর্তে চলে যায় ওরা ইউরোপে। ইউরোপ থেকে আমেরিকা। এলিপো থেকে কখনও লণ্ডন, কখনও আবার সিঙ্গাপুর। ওয়েলেসলির পুকুরে স্নান করতে করতে ওরা গল্প করে সুয়েজের 'পানি' সম্পর্কে। মার্কুইস স্ট্রীটের হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে বিবরণ দেয় মাদাগাস্কারের কোন হাসপাতালের। সুতরাং ওয়েলেসলির উদরে এই দ্বীপটি খালাসীটোলা বইকি। কেউ সন্থ নেমেছে। এবার 'ত্মাশে যাবে'। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে। কেউ চলে যাচ্ছে আগামী সপ্তাহে। আসা-যাওয়ার পথে ওয়েলেসলিতে কিছুদিনের বিরতি। কেউ কেউ স্থায়ী ভাবেই আছে। কারও কারও বাসনা—ভবিষ্যতে স্থায়ী ভাবেই থাকবে।

খালাসীদের এই আনাগোনা আর বাসনার এ অঞ্চলটি যে যোগ্যার্থেই খালাসীটোলা, সে কথা কেউ না মানলেও একজন মানেন। তিনি খালাসীটোলার একজন দোকানী। পঁয়ষট্টি

বছর তাঁরা দোকান করছেন এ পাড়ায়। এবং ইতিমধ্যে কোন দিন পাড়াটিকে খালাসীহীন দেখেননি তাঁরা।
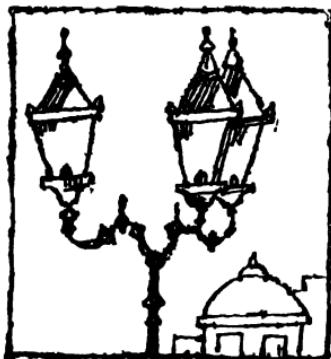
আজকের মত তখনও এটি খালাসীদেরই পাড়া। সুতরাং কর্পোরেশনের অপেক্ষা না করে এই বিচক্ষণ দোকানীটি তাঁর সাইনবোর্ডে ঠিকানার জায়গাটিতে লিখিয়ে দিলেন—'খালাসী-টোলা, কলিকাতা'।

ট্রামের জানলা দিয়ে উঁকি দিলে দেখবেন মুসলিম ইনস্টিটিউটের পরে তামিল চার্চটির উল্টোদিকে খাস ওয়েলেসলি স্ট্রীটের কপালে আজও ঝুলছে সেই পরিচয়পত্র। হাজী মহম্মদ সৈয়দের কিতাবের দোকানে বিচিত্র সাইনবোর্ডটির নিচে আজও লেখা আছে—'খালসীটোলা, কলিকাতা।'

বন্দরের সীমানার বাইরে খাস কলকাতার বুকে খালাসী-টোলার অলিখিত ইতিবৃত্তের এইটিই—এই নিঃসঙ্গ সাইনবোর্ডটিই বোধহয় একমাত্র আক্ষরিক স্মারক।

একটি গ্রীক মন্দির

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

"এখানে ঈশ্বর বাস করেন"—গ্রীক হরফে লিখিত ওল্ড টেস্টামেণ্ট উদ্ধৃত ক'টি পঙক্তির এই বাংলা ভাবার্থ প্রবেশদ্বারের উপরের ফলকে উৎকীর্ণ আছে। দরজার দুপাশে আরও দুটি মর্মরফলক। কাছে গেলে তার একটিতে দেখতে পাওয়া যাবে, নির্মাণের জন্য অর্থ, সাহায্যকারীদের, যার মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস অতি পরিচিত, অন্যটিতে ভারত সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। একটু দূর থেকে সামগ্রিক ভাবে দৃষ্টিপাত করলে নির্মাণ-কৌশলে প্রাচীন গ্রীক স্থাপত্যের "ডোরীক" রীতির প্রভাব স্পষ্ট হবে। ১৮২৪ সনে আমড়াতলা স্ট্রীট থেকে বিখ্যাত গ্রীক চার্চটি যখন এখানে উঠে আসে তখন এর গঠন পরিকল্পনা বর্তমান অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড এ এন এলেক্সিয়াস আর্চম্যানড্রাইট-ই করেছিলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত চার্চটির প্রার্থনা-পরিচালনার ভার নিয়ে তিনি এখানেই আছেন।

কালীঘাটের অন্তর্গত এই অনতিবিস্তৃত ভূখণ্ডটির কিছুদিন আগেও নাম ছিল সাহেব বাগান। জনৈক অবস্থাপন্ন সাহেবের একটি বৃহৎ বাগান-বাড়ির ফলশ্রুতি এই নাম। সপ্তাহ অন্তে

সাহেবসুবোরা এখানে আসতেন, তাঁদের আনন্দ-উৎসবে শহরের এই সুদূরপ্রান্ত মুখরিত হয়ে উঠত।

কিন্তু স্বদেশে রক্ষণশীল ইংরেজ জাতি বিদেশ প্রবাসে ব্যয়বাহুল্য ও মাত্রাজ্ঞানে কতদূর অরক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে স্বল্পকালেই তা বোঝা গেল। আনন্দনিকেতনের পৃষ্ঠপোষক সেই সাহেবের সাজানো বাগান ক্রমে শুকিয়ে এল। অবশেষে তিনি নামমাত্র মূল্যে একদিন বাগানটিকে বিক্রী করে দিলেন। আজ কালীঘাট ট্রাম ডিপোর পাশে লাইব্রেরী রোড ও রসা রোডের সংযোগস্থলে সমগ্র এশিয়ার একমাত্র যে গ্রীক চার্চটি চোখে পড়ে (গির্জার মূল ঠিকানা—২এ, লাইব্রেরী রোড) ১৯২০ সনেও সেখানে একটি শূন্য প্রান্তর ছিল। শোনা যায় যে, প্রায় দু বছর ধরে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খোঁজবার পরই বর্তমান স্থানটি গির্জা-কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত করেছিলেন।

গ্রীক চার্চটির পুরনো ইতিহাস জানতে আমাদের এবার সপ্তদশ শতকে ফিরে যেতে হবে। সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে হেডী এলেক্সিয়াস আরগীরি নামে এক গ্রীক ভদ্রলোক ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেনের ব্যাপারে দোভাষীর কাজ করবার জন্য এদেশে আসেন। প্রয়োজন অনুসারে তাঁকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হতো। এমনি এক প্রয়োজনে একবার তাঁর মোচা ও জেণ্ডা নামক স্থানদ্বয়ে যাওয়া দরকার হয়ে পড়ল। জলপথে আলেকজান্দ্রা নামের একটি জাহাজে তিনি রওনা হলেন। কিন্তু যাত্রা শুভ ছিল না তাঁর। পথে ভীষণ ঝড় উঠল। একদিকে

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উল্লাস, অন্যদিকে বিরতিহীন অশনিসম্পাতের মধ্যে প্রাণরক্ষায় ব্যাকুল আরগীরি মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। সেই মুহূর্তেই স্থির করলেন, নিরাপদে মোচা পৌছতে পারলে কলকাতায় গ্রীকদের জন্য একটি ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত করবেন।

ঝড় থামল, কিন্তু আরগীরি থামলেন না। কলকাতা ফিরেই চার্চ প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তুতি হিসাবে কিছু জমিসহ একটি দালান ক্রয় করলেন। কিন্তু কাজ বেশিদূর এগিয়ে যাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হল। আরগীরির মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্য কলকাতার গ্রীকসম্প্রদায় ও কিছু স্থানীয় ব্যক্তি তৎপর হলেন। তিন বছর পরে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে আমড়াতলা স্ট্রীটে পুরনো চার্চটির ভিত্তি স্থাপিত হল। জমির দাম এবং গির্জার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করতে মোট তিরিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। মোট খরচের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করে আরগীরি-পরিবার। হেডী আরগীরির আত্মার যোগ্য স্মৃতিতর্পণ করলেন। কলকাতায় তৎকালীন অভিজাত নাগরিকবৃন্দ বাকি টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছিলেন। গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস দিয়েছিলেন দু-হাজার টাকা। চাঁদা হিসাবে তাঁর দানই ছিল সর্বাধিক। এ ছাড়া চার্চটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জর্জ মাইকেল, মাভ্রাদিস, বাইরাখতারোহলুস, ক্রিসতোহলুস, লিয়ন ডিউ প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ছিলেন। বলা-বাহুল্য, অধিকাংশই গ্রীক সম্প্রদায়ের।

আমড়াতলা স্ট্রীটের মূল গ্রীক চার্চটির আশেপাশে এখন

বড়ো বড়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকাশছোঁয়া প্রাসাদ। আসলে রাতারাতি এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠার ফলেই চার্চ কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভজনালয়টি অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রাচীন মারহাট্টা ডিচ্ বা অধুনা সারকুলার রোড পর্যন্তই ছিল শহর কলকাতার মূল কর্মাঞ্চল। সুতরাং কালীঘাটের এই পূত প্রান্তভূমিতে তার কোলাহল পৌঁছুত না।

বর্তমান কলকাতায় গ্রীকবাসীদের সংখ্যা দশকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষেও শতাধিক গ্রীক নেই। কলকাতায় র‍্যালি ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠানের ও অন্যত্র কর্মরত কয়েকজনকে নিয়ে একটি ট্রাস্টির ওপরে এর ভরণপোষণের ভার ন্যস্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, র‍্যালী গ্রীক দেবী।

রেভারেণ্ড এ. এন এলেক্সিয়াস আর্চম্যানড্রাইট প্রতি রবিবারের প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। গড়ে সাত থেকে দশ জনের বেশি প্রার্থনাকামী জড়ো হয় না। কথা প্রসঙ্গে সত্তর উত্তীর্ণ বৃদ্ধ পাদ্রী দুঃখ করে বললেন, সমগ্র এশিয়ায় এই ধরনের চার্চ এই একটি মাত্র হওয়া সত্ত্বেও এর কথা অনেকেই জানেন না। অন্যান্যদের কথা বাদ দিলেও দক্ষিণ কলকাতারও বহু লোকই জানেন না, ট্রাম ডিপোর পাশের এই বাড়িটি এশিয়ার একমাত্র গ্রীক মন্দির।

সবচেয়ে পুরনো রাস্তা চিৎপুর

পথিক

কলকাতার অলিগলির ইতিহাসে চিৎপুরের নাম সর্বাগ্রে। কারণ প্রাচীনত্ব আর ঐতিহ্যে এই রাস্তাটি শহরের পথ-কুলে মুখ্য কুলীনের স্থান অধিকার করে রয়েছে। চিৎপুর যেন কোন বনেদী ঘরের বড়বাবু। কালের গতিতে আজ তার জৌলুস ম্লান হলেও চেহারার আভিজাত্য চাপা পড়েনি।

চিৎপুরের জন্মলগ্ন অর্থাৎ কবে রাস্তাটি প্রথম তৈরি হয় তার সঠিক হিসেব পাওয়া মুশকিল। প্রাচীন মঙ্গলকাব্য, ১৪৯৫-৯৬ সালে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে চিৎপুরের উল্লেখ আছে। তবে ঐ অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত বলে অনেকের ধারণা। এরপর আজ থেকে সাড়ে তিনশ বছর আগে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' চিৎপুরের উল্লেখ পাই। সেখানে দেখি সাধু শ্রীপতির নৌকো ভাগীরথীতে তরতর করে ভেসে চলেছে—

> ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
> চিৎপুর সালিখা এড়াইয়া যায়॥

শুধু জলপথে নয়, স্থলপথেও মোগল আমল থেকেই রাস্তাটি

কালীঘাটে যাবার প্রধান পথ ছিল। তাই এর আরেকটি নাম হয় 'তীর্থযাত্রার পথ'।

'চিৎপুর' এই নামকরণ সম্পর্কে সকলেই প্রায় একমত। কাশীপুর অঞ্চলে শাক্তদের আরাধ্যা চিত্রেশ্বরা অথবা চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির আজও বর্তমান। ঐ দেবীর নাম থেকেই নাকি চিৎপুর নামের উৎপত্তি। অনেকে অবশ্য বলেন চিত্রপুর থেকে চিৎপুর। তবে মঙ্গলকাব্য গুলিতে যে ভাবে চিৎপুরের উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় চিৎপুর সে যুগে একটি গ্রামেরই নাম ছিল। জনশ্রুতি অনুসারে 'চিতে' নামে এক ডাকাত নাকি ঐ দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু জনৈক ঐতিহাসিক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, টোডরমল্লের রাজস্বের মুহুরী মনোহর ঘোষ এই চিত্তেশ্বরী মূর্তি স্থাপন করেন।

এককালে চিৎপুর ডাকাত ও কাপালিকদের আড্ডা ছিল। ঐ দেবীর সামনে নাকি বহু নরবলি হয়। আর চিৎপুরের রাস্তায় যে বাঘের সাক্ষাৎ মিলত, ১৮২৫ সালে 'সমাচার দর্পণে'র এক খবরেই তার উল্লেখ রয়েছে।

চিৎপুর অনেক ইতিহাসেরও সাক্ষী। ইংরেজদের উপর তিতি বিরক্ত হয়ে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা ১৭৫৬ সালে যখন সসৈন্যে কলকাতা আক্রমণের জন্য আসেন তখন চিৎপুর খালের কাছে ইংরেজরা নবাবকে বাধা দেয়। নবাবের সেনাপতি মীরজাফর নাকি চিৎপুরে সৈন্য স্থাপন করে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেন। বাংলার সেই দুর্দিনের ইতিহাসের স্মৃতি জড়িয়ে আছে চিৎপুরের পথে। আর চিৎপুরের ধুলোয় মিশে আছে অসংখ্য সতীর পুণ্য

দেহাবশেষ। ১৮২৮ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার আগে এই পথের ধারেই নাকি ধু-ধু জ্বলেছে অসংখ্য সতীদাহের চিতা।

কিন্তু শুধু তো সতীর কান্না নয়। নটীর নূপুরনিক্কণ মিশে রয়েছে চিৎপুরের হাওয়ায় হাওয়ায়। কান পেতে শুনলে আজও জনাকীর্ণ রাস্তার প্রচণ্ড আওয়াজ ছাপিয়ে তা শোনা যায়। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ বহুগুণী ওস্তাদ ও বাঈজীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরই দৌলতে কলকাতার চিৎপুর রোড প্রভৃতি এলাকায় নাকি বাইজীদের বসবাস শুরু হয়।

চিৎপুরের গরানহাটা অঞ্চলে কীর্তনের একটি বিশেষ ধারার (গরান হাটি) উৎপত্তি। শুধু গানবাজনা নয়, চিৎপুরকে কেন্দ্র করে শোভাবাজার বটতলাতে কবি-গান, যাত্রা, হাফ আখড়াইয়ের এবং শখের থিয়েটারের চর্চা শুরু হয়। চিৎপুরের মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোনে ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক "নীল দর্পণ" অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা দেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত হয়। সে হল ১৮৭২ সালের কথা।

হিন্দু কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এই চিৎপুরে। আদি ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাতও ঐখানে। চিৎপুর রোড আর তাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ আমলে যে 'কলকাতা-কালচার' এর জন্ম হয়, আশপাশের ধনী শিক্ষিত পরিবারের কৃতী ও উৎসাহী পুরুষরা ছিলেন সেই সংস্কৃতির পুরোধা। আজ বালীগঞ্জ বা

নিউ আলিপুরে আর এক ধরনের বাঙালী 'কালচার' গড়ে উঠছে বটে; কিন্তু চিৎপুর কালচারের বনেদীয়ানা তাদের নাগালের বাইরে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক সময় চিৎপুর রোডের এক বাড়িতে বাস করেন এবং তাঁর অনেক সাহিত্যকীর্তি ঐ বাড়িতেই রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায়ও চিৎপুর অঞ্চলের টুক্‌রো টুক্‌রো নানা ছবি পাওয়া যায়। চিৎপুরকে ভালবেসে তিনি "আমাদের চিৎপুর" বলে গেছেন 'ছেলেবেলা'র এক জায়গায়। চিৎপুরের প্রাচীন বিদ্যালয় 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'তে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন ছাত্র ছিলেন।

তবে প্রায় একশ বছর আগেকার চিৎপুরের খাঁটি রূপ যদি দেখতে চান তো যেতে হবে 'হুতোম'-এর কাছে। তাঁর নক্সায় চিৎপুরের রূপ আলোকচিত্রের মত ফুটে উঠেছে:—"এদিকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় শহর আবার গুলজার হয়েছে। মধ্যাবস্থ গৃহস্থরা বাজার কত্তে বেরিয়েছেন, সঙ্গে চাকর ও চাকরানীরা ধামা ও চাঙ্গারি নিয়ে পেছু চলেছে। চিৎপুর রোডে মেঘ কল্লে কাদা হয়; সুতরাং কাদার জন্যে পথিকদের চলবার বড়ই কষ্ট হচ্চে। কেউ পয়নালার উপর দিয়ে, কেউ খানার ধার দিয়ে জুতো হাতে করে কাপড় তুলে চলেছেন।"...

বৃষ্টি হলে প্রায়-ফুটপাথহীন চিৎপুর রোডে কাদার হাত থেকে আজও পথিকের নিস্তার নেই। আর বাজার কর-নেওয়ালাদের সাক্ষাৎ আজও চিৎপুরে যথেষ্ট মিলবে।

'তীর্থযাত্রার পথ' চিৎপুর আজ 'বাজার পথে' রূপান্তরিত

হয়েছে। ঐখানে নতুন বাজার, টেরিটি বাজার, অ্যালেন মার্কেট ইত্যাদি তো আছেই; তাছাড়া লালবাজার—লোয়ার চিৎপুর রোডের শুরু থেকে বাগবাজারের খালধারের আপার চিৎপুরের শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত অবিছিন্ন ধারায় চলেছে দোকানের সারি।

কি পাওয়া যায় না চিৎপুরে?

খাবার-দাবার ওষুধ-পত্র সব কিছুর দোকান ত আছেই চিৎপুরে, তাছাড়া ভাল সটকা চান ত যেতে হবে চিৎপুরে, বাড়ি করতে চান ঐখানেই পাবেন ইট-সুরকি-বালি। প্রতিমা কিনতে যেতে হবে কুমোরটুলিতে, ধর্মপুস্তকের দরকার হলে যেতে হবে চিৎপুরে। আর পুজোপার্বণ উপলক্ষে যাত্রা গানের আসর বসাতে চাইলে চিৎপুরে না গিয়ে উপায় নেই।

হিন্দুদের নানা মন্দির; মুসলমানদের নাখোদা মসজিদ, ইমামবাড়া; দিগম্বর জৈন মন্দির চিৎপুরে অবস্থিত। আর হিন্দুদের 'মহাতীর্থ', কাশী মিত্র এবং নিমতলা ঘাটে যেতে হয় চিৎপুর পার হয়েই। 'পতিতোদ্ধারিণী' গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যায় চিৎপুরের অলিগলি।

বর্তমানে কলকাতা যে "কস্‌মোপলিটান সিটি" অর্থাৎ এই শহরে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের লোকই যে নীড় বেঁধেছে পাশাপাশি—তারও প্রকৃষ্ট পরিচয় চিৎপুর রোডের মত শহরের আর কোথাও মিলবে না। চিৎপুরে আজ নানা জাতি নানা ধর্মের মানুষ বসবাস করছে।

বৌবাজার, না বহুবাজার ?

তরুণ ঘোষ

রাস্তাটা শীর্ণ হলেও সুদীর্ঘ। উপেক্ষিত তো নয়ই, বরং বলা চলে কলকাতার কয়েকটি ব্যবসার কেন্দ্রস্থল এই বৌবাজার স্ট্রীট। ডালহৌসীর দিক থেকে হাঁটতে শুরু করলে সারি সারি কাঠের আসবাবপত্রের দোকান মিলবে। রেডি-মেড খাট আলমারী ড্রেসিং টেবিল এ-সব দোকানে রাশি রাশি তৈরী আছে এরই ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু চক্ষু চিকিৎসালয়, অর্থাৎ সবৈতনিক চোখ দেখানোর ও চশমা বানানোর দোকান। কলেজ স্ট্রীটের মোড় পার হতে না হতেই রাস্তার চেহারা বদলে যাবে। এবার কাঠ কিংবা কাঁচ নয়, রীতিমত খাঁটি সোনার কারবার। খ্যাত অখ্যাত অসংখ্য স্বর্ণকারের দোকানের শো-কেস থেকে উজ্জ্বল আলোর হাতছানি দিয়ে ডাকবে বিচিত্র সব সোনার অলঙ্কার, হীরে জহরতের জড়োয়া গহনা। এ রাস্তার পূর্বভাগে যত সোনার কারবার হয়। বোধহয় অন্য কোথাও এত হয় না। তেমনি এর পশ্চিম ভাগের ফার্নিচারের ব্যবসাও।

কিন্তু এতবড় একটা রাস্তা। যার প্রাচীনতাও

অবিসম্বাদিত। তার নামকরণের পিছনে কোন ইতিহাস নেই ? অবশ্য নতুন নামের কথা বলছি না।

নামকরণের ইতিহাস পরের কথা, আসল নামটা কি, সেইটুকুই তো আজ অজ্ঞাত। এখনও এ রাস্তার দোকানে দোকানে যে সাইনবোর্ড আছে, তার নীচে ঠিকানা ঃ বহুবাজার স্ট্রীট। শুধু সাইনবোর্ড নয়, আরও অনেক জায়গাতেই এই নাম। তবে কি অনেকগুলি বাজার ছিল এখানে. আর তাই নামকরণ হয়েছিল বহুবাজার ? বোধহয় না। লোকের মুখে মুখে যদি নামটা প্রচলিত হয়ে থাকে, তা হলে চৌমাথা বা পাঁচমাথার মোড়ের মত কোন একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বসতো বাজারের আগে, কিংবা সংখ্যাটা অত্যধিক হলে সেটা বড়বাজার হয়ে যেতো।

ইতিহাস এ বিষয়ে নীরব হলেও একটা ক্ষীণ ইশারা পাওয়া যায়।

বৌবাজারের নামকরণ হয় সম্ভবতঃ শোভারামের পুত্রবধূর স্মৃতি হিসেবে। আরেক জনের মত, বাজারটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্বনাথ মতিলাল, এবং তাঁরই পুত্রবধূর নামে বাজারের নামকরণ।

উভয়ক্ষেত্রেই অবশ্য কোন এক বধূর প্রসঙ্গ এসে পড়ছে। এবং যেহেতু শোভারাম একাধিক বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বৌবাজারের প্রতিষ্ঠাতা তিনি এমন মনে করা অন্যায় হবে না।

কিন্তু এই শোভারাম কে ছিলেন ? তাঁর পরিচয় জানতে হলে পলাশীর যুদ্ধেরও আগেকার দলিলপত্র ওল্টাতে হবে।

পলাশীর যুদ্ধেরও তিনচার বছর আগে কলকাতার কয়েকজন নামকরা ব্যবসায়ী ফোর্ট উইলিয়াম অ্যাণ্ড কাউন্সিলের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ও গভর্নর রোজার ড্রেকের কাছে একটি দরখাস্ত করেন। ঐ দরখাস্তে তাঁরা অভিযোগ করেন যে, ১৭৫৩ সালের পয়লা নভেম্বর কোম্পানীর নীলামে বেশ কিছু তামা কিনে তাঁরা ঠকে গেছেন। সুতরাং ঐ অভিযোগ সম্পর্কে 'যথারীতি তদন্তে'র জন্যে তাঁরা গভর্নর সাহেবকে বিনীত আর্জি জানাচ্ছেন।

ব্যবসায়ীরা জানান যে, 'উৎকৃষ্ট' বলেই ঐ তামা তাঁরা কিনেছিলেন, কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ তামা 'নিকৃষ্ট' ধরনের। কোম্পানীর গুদামে রক্ষিত খারাপ তামা নীলামের বাজারে উৎকৃষ্ট বলে চালানো হয়েছে।

সেই তদন্তের ফল কি হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। বোধকরি আরও পাঁচটা তদন্তের ফলাফলের মত সেটিও ধামা-চাপা পড়েছিল।

গভর্নর রোজার ড্রেককে আশা করি চিনতে পেরেছেন। সেই যে ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কলকাতা আক্রমনের সময় যিনি কেল্লা ছেড়ে পালিয়েছিলেন। তাঁর ঐ দরখাস্তে যে চারজন ব্যবসায়ী সই করেছিলেন তাঁদের একজনের নাম শোভারাম বসাক।

কলকাতার আদি বাসিন্দা বসাকদের অন্যতম শোভারাম পলাশীর যুদ্ধের আগেই সে যুগের কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী

এবং সুবিখ্যাত ধনী। বসাকরা সপ্তগ্রাম থেকে বাস উঠিয়ে সুতানটি বা একালের বড়বাজার অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। স্বঘরে বিবাহের উদ্দেশ্যে শেঠেরাই নাকি বসাকদের কলকাতায় আনিয়েছিলেন।

এই শোভারাম বসাক যে সে যুগের কলকাতায় কত প্রভাবশালী ছিলেন তার পরিচয় আজও আছে। তাঁর নামে কলকাতার একটি ঘাট এবং দুটি রাস্তা নামাঙ্কিত হয়। কলুটোলায় শোভারাম বসাক লেনের নাম এখন পরিবর্তিত হয়েছে বটে, কিন্তু বড়বাজার অঞ্চলে শোভারাম বসাক স্ট্রীট আজও রয়েছে।

কলকাতার বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী বসাকদের বড়বাজারের ঐ অঞ্চলে কত প্রতিপত্তি ছিল আজও তার পরিচয় রয়েছে বিভিন্ন রাস্তায়। যদিও শোভারাম বসাক স্ট্রীটের সরু গলিতে আজ লোহা-লক্কড়, কয়লা আর মনিহারির দোকান।

যাই হোক সে যুগে শোভারাম বসাকের প্রতিপত্তি আর দাপট যে কেমন ছিল একটি ঘটনাতেই তার পরিচয় মিলবে।

জন জেফানায়া হলওয়েল হঠাৎ একবার তাঁর খেয়াল মত শ্যামবাজারের নাম বদলে 'চার্লস বাজার' নাম রেখেছিলেন। শোভারাম হলওয়েলের ঐ নামকরণ নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁরই এক পূর্বপুরুষ শ্যাম বসাকের নামে আবার বাজারটির নাম দেন 'শ্যামবাজার।' আজও সেই নাম বজায় আছে।

প্রবন্ধের শুরুতে শোভারামের যে পরিচয় পাওয়া গেছে

তাতে জানা যায় অন্যায় তিনি সহ্য করতেন না। যথাস্থানে অভিযোগ করতেন প্রতিকারের জন্যে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, এই শোভারাম বসাকের বিরুদ্ধেই জাল-জুয়াচুরি এবং অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে।

ব্যাপারটা হল এই। সিরাজদ্দৌল্লার কলকাতা আক্রমনের সময় শহরের যে দারুণ ক্ষতি হয় তার জন্যে অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা হয় পলাশী যুদ্ধের পর। ঐ উদ্দেশ্যে মীরজাফরকে একটা মোটা টাকা তুলে দিতে হয় কোম্পানীর হাতে। বিচার বিবেচনা করে ঐ টাকা বিতরণের ভার পড়ে ১৩/১৪ জনকে নিয়ে গঠিত এক কমিশনের ওপর। শোভারাম বসাক ছিলেন সেই কমিশনের অন্যতম সদস্য।

ঐ কমিশনের নামজাদা সদস্যদের কেউ কেউ আত্মীয়-অনুগতদের প্রতিও ঝোল টানেন বলে অভিযোগ ওঠে।

শোভারাম মোট ৪,৪১,২৭৮ টাকা ৯ আনা ৭ পাই দাবি করেন এবং অবশেষে ৬৬,২৭৮ টাকা ৯ আনা ৭ পাই মাত্র ক্ষতি-পূরণ আদায় করেন।

ক্ষতিপূরণ যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই গরীব কলকাতাবাসীরা কিছুই পাচ্ছে না, এ প্রতিবাদ উঠলে শোভারাম বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, 'তবে আমাদের মত ধনীদের জন্যে কি আর থাকবে ?'

সে-কালের ধনীরা হয়তো, অর্থ প্রতিপত্তি সম্ভোগ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন, সমকালকে নিয়েই তাঁরা তৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু হয়তো

তাঁদের সকলের মনেই প্রশ্ন ছিলঃ 'তবে আমাদের মত ধনীদের জন্য কি আর থাকবে?'

তাঁরা হয়তো কল্পনাও করেন নি, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছেও কলকাতার অধিবাসীরা তাঁদের নামে নামাঙ্কিত পথে হাঁটবে, ঘাটে স্নান কববে, বাজারে সওদা করবে,—এমন কি কোনদিন হয় তো বৌবাজার স্ট্রীট দিয়ে (আজকের বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে ভাববে, কোন এক বিস্মৃত যুগের অজ্ঞাত পরিচয় সেই বধূটির কথা! যার সম্পর্কে ইতিহাস আজ সম্পূর্ণ নীরব।

ডিঙা ভাঙা লেন

কল্লোল

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পিছনে ক্রীক রো-র মুখে চলে আসুন। রাস্তার ওপর নিপুন দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখতে পাবেন রাস্তাটি যেন নতুন করে বানানো হয়েছে। নতুন। নতুন কালো পিচের রং। কিন্তু না, এ রাস্তা নতুন নয়—বহুদিন আগেই এ রাস্তা বানানো হয়েছে। তবে নতুন লাগে এইজন্যে যে, এ রাস্তা অন্যান্য রাস্তার মত অত পুরানো নয়। অন্যান্য রাস্তায় যেমন সর্বদা লোক চলাচল করে, গাড়ি ঘোড়া চলে, এ রাস্তা কিন্তু তেমন নয়। প্রায় সময়ই সঙ্গীবিহীন হয়ে নীরব সাক্ষীর মত, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সুসজ্জিত বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তবে ক্রীক রো রাস্তাটি প্রশস্ত, সুসজ্জিত, এখানে বর্তমানে বহু হালফ্যাশানের বাড়ি তৈরী হয়েছে। এবং সে সব বাড়িতে থাকেন অনেক কৃতী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবার। রাস্তাটি নীরব। নির্জন। শান্তিপ্রিয় হলেও যেন একটু পাশ্চাত্য ছোঁয়াচে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

সে যা হোক। প্রশ্ন হল, এর কোথায় ছিল উপরে

উল্লিখিত নামের গলিটি ? এবং কবেই বা তার চিহ্ন তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেল ?

আজকের সুসজ্জিত ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উদ্যানক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করুন। বৈকালী মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যে ঘর ছেড়ে বহুমানুষ আসে এই খোলা জায়গাটিতে। এখানে বিকেলের অনুকূল পরিবেশ মুখর হয়ে ওঠে শিশুদের কলরব, কিশোরদের উল্লাস, যুবকদের অহেতুক হাসি আর তরুণ ও তরুণীদের রসালাপে এবং বৃদ্ধদের বিগতদিনের স্মৃতি রোমন্থনে। এই বৃদ্ধদের দিকে তাকিয়েই যেন স্মৃতির আর একটা দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। ইতিহাসের ক'টি পাতার ওপর যেন চোখ দুটো সহসা স্থির হয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভূ-নিম্নের ট্যাঙ্ক ইংরাজদের জন্যেই হয়েছিল। ১৮৭৬-১৮৮৮ সালে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য-বিবরণীতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম্পিং স্টেশনে অধিকতর শক্তির যন্ত্র সংযোজনের সূত্র পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কলকাতার আদমসুমারী ইংরাজী গ্রন্থের সঙ্কলন কর্তা মিঃ এ. কে. রায় বলেছেন—সে যুগে স্কোয়ারে ছিল জলের ট্যাঙ্ক। আর এ যুগে আছে মিটিং ক্ষেত্র। পাম্পিং স্টেশনে মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদ আছে।

আজও সেই ভগ্ন মসজিদটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে স্কোয়ারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তারই স্মৃতি ধরে প্রমাণ মেলে সেকালের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একদা জলের ট্যাঙ্ক ছিল।

কিন্তু এ তো গেল আরও অনেক পরের কাহিনী। এর অনেক আগে আনুমানিক ১৭৩৭ সালের আরও আগে এখানে একটি খাল ছিল এবং এই খালটি কলভিন্ ঘাট বা কাঁচাগুড়ি ঘাট থেকে আরম্ভ হয়ে হেস্টিংস স্ট্রীটের পুরাতন সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তিনী হয়ে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ওপর দিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে পড়েছিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এই জায়গাটিতে খালটি একটু কোনাকুনিভাবে চওড়া ছিল এবং এখান থেকে ক্রীক রো'র ভিতর দিয়ে বেলিয়াঘাটা সল্ট লেক বা ধাপা পর্যন্ত প্রবাহিত হতো। এই খালটির নাম ছিল 'ক্রীক খাল।' 'কলিকাতা' সেটেলমেণ্ট প্রস্তাবে এই খালের নক্সা আছে। এই খালের ওপর দিয়ে বড় বড় মালের জাহাজ ও নৌকা যাওয়া আসা করত। তখনও এই জায়গাটির নাম ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানটি ক্রীক রো হয়নি।

১৭৩৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের রাত্রি। যেন কোন দৈত্য তার বিশাল বাহু দিয়ে শিশু কলকাতার চুলের মুঠি ধরে আছাড় মারল। এলো এক মহা প্রলয় ঝড়। মহা ঝটিকাময় সে রাত্রি। শিশু কলকাতার জীবনের সে রাত্রি আজও স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। আজও ভোলবার নয় সে রাত্রির ইতিহাস। বঙ্গোপসাগর থেকে ঝড় ওঠে। সে ঝড়ের যেমন ছিল বেগ তার সঙ্গে তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। ঝড়টা সমুদ্র থেকে উঠে ষাট লিগ্ পর্যন্ত দূরবর্তী স্থানে ধাবিত হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প। বাড়ি, ঘর কাঁপতে থাকে। যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টি, তেমনি মুহুর্মুহু বজ্রগর্জন।

সবারই মনে এক ভয়-বিহ্বল অবস্থা। এ রাত্রি যদি শেষ হয় তবে বহু পুণ্যের জোর। কোন গৃহের দোতলার জানলা, দরজা উড়ে গেল। ভেঙে পড়ল কোন বাড়ির দোতলা, তিন তলার ঘরদোর। শোনা গেল বজ্রনিনাদের সঙ্গে মানুষের আর্ত চিৎকার। এই সময়ে স্যার ফ্রান্সিস রসেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠির মন্ত্রণা সভার সদস্য ছিলেন। রসেলের বর্ণিত কাহিনী থেকেই সেদিনের মহাপ্রলয়ের একটি আনুমানিক চিত্র ফুটে ওঠে।

প্রভাত হলে দেখা গেল চারিদিকে যুদ্ধশেষের মর্মান্তিক দৃশ্য। যেদিকে চোখ পড়ে সেইদিকেই শুধু ধ্বংসের ভয়াবহ বিধ্বস্ত রূপ। কে যেন গতরাত্রে এসে আপন হাতে সবকিছু লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়ে গেছে। পূর্ব দিনের সন্ধ্যায় গঙ্গায় এসে ছিল উনত্রিশখানি ছোট বড় জাহাজ। তাদের একটিও অক্ষত অবস্থায় নেই। সব খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে কোন এক অজানা দেশে পাড়ি জমিয়েছে। শুধু 'ডিউক অব ডর্সেট' নামে জাহাজটির কিছু অংশ আস্ত অক্ষত ছিল। শুধু সেইটিই ধ্বংসের প্রতীক হয়ে নদী-বক্ষে শক্ত হয়ে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিনের ঝড় ও তার ধ্বংসের বিস্তারিত রূপ লিপিবদ্ধ করতে গেলে অন্য একটি কাহিনীর সূত্রপাত করতে হয়। তবে সেদিনের সেই মহা প্রলয় কলকাতার প্রথম জীবনের অভিশাপ। ক্ষতির পরিমাণ, চিন্তা করা যায় না। প্রায় বিশ হাজার জাহাজ বোট, জেলে ডিঙ্গি, নৌকা, ভড়, বজরা ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

গঙ্গার স্রোতের মুখ দিয়ে তোড়ে কতকগুলি ডিঙি ও নৌকা এই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মুখে এসে প্রচণ্ড বেগে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এমন কি এখানে একটি ঘূর্ণি থাকার জন্যে এর পার্শ্ববর্তী স্থানের নাম হয়ে ছিল ডিঙিভাঙা পল্লী। পরে যখন এই খাল মাটি দিয়ে ভবাট করে ফেলা হয়, তখন তার নাম হয়েছিল 'ডিঙি ভাঙা' লেন। অবশেষে তার অনেক অনেক পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারও তার পিছনের খাল বরাবর পথটির নাম হয় 'ক্রীক রো'।

এই ক্রীক রো দিয়ে লোয়ার সারকুলার রোডের দিকে যেতে গেলে একথা প্রচ্ছন্ন ভাবে মনে হয় যে,—হ্যাঁ, হয়ত এখানে একদিন একটি খালই প্রবাহিত হতো।

কিন্তু ডিঙা ভাঙা লেনের কথা মনে এলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফুল, ঘাস, গাছ ভর্তি বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে কলকাতার শহরের ইতিহাসের আর একটি বিস্ময়কর অধ্যায়েব সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

জব চার্নকের সমাধি

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

এই কলকাতায় তখন পাকাবাড়ি একটি কি দুটি। একটি সাবর্ণ চৌধুরীদের পাকা কাছারী বাড়ি—যেখানে তাদের নায়েব আণ্টুনি ফিরিঙ্গি কবিয়ালকে খাতা খুলে বসে থাকতে দেখা যেত। আর একটি ছিল পর্তুগীজদের প্রার্থনাগৃহ— সেণ্ট জন গীর্জা। তার পাশেই ছিল গোরস্থান। জলপথে হুগলীর কুঠি থেকে বালেশ্বর ও মাদ্রাজের কুঠিতে ইংরেজ কুঠিয়ালদের যাতায়াত ছিল এই পথে। কোনো ইংরেজ মারা গেলে তাকে এখানেই কবর দিয়ে যাওয়া হত। এখানেই কলকাতার স্রষ্টা জব জার্নকের কবর দেওয়া হয়েছিল। এখানকার হেস্টিংস স্ট্রিটে সেই সেণ্ট জন গির্জার চার্চ ইয়ার্ডে সে কবর আজও সুরক্ষিত রয়েছে। সেই কবরের ওপর জব চার্নকের জামাই চার্লস আয়ার সাহেব পরে একটি সুন্দর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তখনকার খড়ের চাল আর মাটির দেওয়ালের দিনে এ ধরনের গাঁথনির কাজ কল্পনাতীত। উচ্চতায় প্রায় বারো ফুট। দ্বিতল এই স্মৃতিসৌধের নীচের মহল অষ্ট ভুজবিশিষ্ট। এর প্রত্যেকটি কোণ এক একটি স্তম্ভের দ্বারা সমর্থিত। নীচের মহলে নয়টি

খিলান তার মধ্যে দিয়ে কবরের ওপর আলো এসে পড়েছে। কথিত আছে চার্নক ও চার্নকের হিন্দু স্ত্রীকে একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়। উপরের মহলও নীচের মহলের অনুরূপ। সর্বোপরি শোভন গম্বুজ। বহির্ভাগের দেয়ালের গায়ে খাঁজ কাটা কারু-কার্য বহির্ভাগে কার্নিশের মাথায় দ্বিতল ও একতলের মধ্যবর্তী স্থানে ইংরেজী V-এর আকারের সূক্ষ্ম কারুকাজ। মাথার ওপরে গোলাকার উঁচু সিলিং, জায়গায় জায়গায় নোনা ধরা। কথা বললে প্রতিধ্বনি ওঠে। এই স্থাপত্য সম্পূর্ণ মুঘল স্থাপত্য রীতির দ্বারা প্রভাবিত। কবরের শিখরে ল্যাটিন ভাষায় জব চার্নকের পরিচয় পত্র আঁটা।

সুতানুটি—গোবিন্দপুর আর কলকাতা। জলা আর জঙ্গলাকীর্ণ তিন গ্রাম; তাও আবার সেখানে ম্যালেরিয়ার মড়কে দিনের মানুষ রাতেই কাবার। চারদিকে ধু-ধু জলাভূমি, জঙ্গল আর জঙ্গল। এখানেই জব চার্নকের হাতে ভবিষ্যতের এক মনোরমা নগরীর গোড়া-পত্তন হয়েছিল। জঙ্গল কেটে সাফ্‌সুতরো করা হলো। রাতারাতি উঠলো সারি সারি বস্তি বাড়ি। ব্যবসায়ীদের খড়ের চালা আর গুদাম ঘর। শায়েস্তা খাঁর ফৌজদারের উৎপাতে হুগলী কুঠি থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে জব চার্নক নেমেছিলেন এই সুতা-নুটিতে। জায়গাটা ভালো লাগায় এখানেই আস্তানা গাড়লেন বণিকের মানদণ্ড নিয়ে।

উত্তর চিৎপুর থেকে গঙ্গার কোণ ঘেঁসে দক্ষিণ বরাবর এই সুতানুটি তুলোর ব্যবসায় ফেঁপে উঠেছিল। এখন যেখানে স্ট্যাণ্ড

রোড, সেখান দিয়ে কলনাদিনী গঙ্গা বয়ে যেত। এখন গঙ্গা পশ্চিম দিকে অনেকটা সরে গিয়েছে। সুতানুটির দক্ষিণে গঙ্গার কোল থেকে কিছু দূরে অবস্থিত উঁচু ঢিপি মত জায়গাটার নাম ছিল 'কলকাতা'। এখন সেটাই ডালহৌসী স্কোয়ার নামে পরিচিত। এখনকার হেস্টিংস স্ট্রিটের কাছে খালের জল জলাভূমিও ওপর দিয়ে বয়ে বয়ে এসে মিশেছিল গঙ্গার বুকে—সেই অবধি বিস্তৃত ছিল কলকাতার সীমারেখা। এখনকার শেয়ালদা ও বৌবাজার অঞ্চলের সংযোগস্থলে একটা বহুঝুরি বট ছিল। সেখানে বসে চার্নক গড়গড়া টানতে টানতে মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করতেন। বিশ্রামান্তে ব্যাপারীদের সঙ্গে ব্যবসা চলতো। আর ছিল নদীর বাঁকানো ধনুকে পরানো ছিলার মতন চিৎপুর রোড। যার নামকরণ হয়েছিল 'তীর্থযাত্রীর রাস্তা'।

জব চার্নকের শাসনকালে সেটলমেণ্টের বিশেষ উন্নতি না হলেও হিন্দু, মুসলমান, খেরেস্তান সকলেই বিভিন্ন কর থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। সবাই পেয়েছিল সুবিচার। পাটনার কুঠিতে থাকাকালীন সময়ে চার্নকের জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। চিরদিন লড়াই হাঙ্গামা বেচা-কেনার মধ্যে দিয়েই তাঁর জীবন কেটেছে। কোনদিন বিশ্রাম পান নি। হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে তিনি গল্প শুনেছিলেন। কোনদিন চাক্ষুষ দেখেন নি। পাটনার রাস্তায় এক সন্ধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে তাঁর চোখে পড়লো চতুর্দোলায় চড়িয়ে ঢাক পিটিয়ে বহু লোকজন এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ও একটি মৃতদেহকে নিয়ে আসছে। খবর নিয়ে জানলেন, ঐ পরমা সুন্দরী অল্প বয়স্কা

মেয়েটি ঐ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী। মেয়েটি মৃত স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় জীবন বিসর্জন দেবে। তাঁর চোখে পড়লো, এ ব্যাপারে মেয়েটির চাইতে আত্মীয় স্বজনের উৎসাহই অত্যন্ত বেশী। কুঠির সেপাইদের সঙ্গে শব বাহকদের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। চার্নক মেয়েটিকে এনে কুঠিতে আশ্রয় দিলেন। পরে মেয়েটির সম্মতি পেয়ে খ্রীস্টান মতে তাঁকে বিয়ে করে ফেললেন। এতদিনে পেলেন একটি জীবন সঙ্গিনী। ছত্রিশ বছর বিদেশের অস্বাস্থ্যকর জল হাওয়ার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে চার্নকের শরীর ভেঙে পড়েছিল। শেষের দিকে কোম্পানির কাছে কিছুই বিশেষ তিনি দেখতে পারেন নি। এর পরে নবাবের কাছ থেকে তাই বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে চুটিয়ে বাণিজ্য করার অনুমতি পেলেও ফ্যাক্টরী বসানো, জঙ্গল সাফ করা, নতুন বাড়িঘর, রাস্তা তৈরী কিছুই আর হয়ে উঠলো না। তখনকার বণিকরা খুবই ছন্নছাড়া জীবন-যাপন করতো। তাঁবু খাটিয়ে খড়ের ঘরে কিংবা নৌকায় মাথা গুঁজে কোনমতে দিন কাটাতো। সুরক্ষিত বাড়ি-ঘর গুদাম কিছুই তাদের ছিলো না—তখনকার ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দেয়। শেষ জীবনে নানান্ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জব চার্নককে দিন কাটাতে হয়েছে! ১৬৯২ সালে জবচার্নক মারা যান। সন্তানাদির মধ্যে জব চার্নকের তিন মেয়ে। সকলেরই বিয়ে হয়েছিল প্রভাবশালী স্থানীয় ইংরেজদের সঙ্গে। মারা যাবার সময়ে জব চার্নক তিন মেয়ে ছাড়াও নিজের সরকার ও দুজন প্রিয় ভৃত্যকে সম্পত্তি দিয়ে যান। তাঁর উইল ছিল এমনি অদ্ভুত। তাঁর অন্যতম জামাই কোম্পানীর পরবর্তী

এজেন্ট চার্লস আয়ার সাহেব জব চার্নকের সমাধির ওপর ওই সুন্দর স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করান। জন্মবার্ষিকী কিংবা মৃত্যু-বার্ষিকী ছাড়াও প্রতি বছর নভেম্বর মাসের ২রা তারিখে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয় কবর, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় দুটো মোমবাতি। আর খ্রীস্টান পাদ্রী ঘুরে ঘুরে কয়েক মিনিট এই সমাধির ওপর স্বস্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এই অশান্ত হৃদয় মৃত্যুর পরে যেন শান্তি পায়,—এই প্রার্থনা নিয়ে সারারাত টিম্‌টিম্ করে জ্বলে সাদা মোমবাতির দুটো কাঁপা কাঁপা শিখা। ভিতরের দেয়ালে জায়গায় জায়গায় অল্প নোনা ধরলেও আজ অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজ আমলের সর্ব প্রথম স্থাপত্যের এই নিদর্শন।

কলকাতায় সম্মোহন-চিকিৎসার হাসপাতাল

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই কলকাতা শহরে ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে এমন একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছিল যেখানে সব রোগের চিকিৎসা করা হত সম্মোহনের সাহায্যে। এ ধরনের বিচিত্র হাসপাতাল পৃথিবীর আর কোথাও ছিল বলে জানি না।

এর প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়ে ছিল হুগলীতে। ডাঃ জেমস্ ইসডেল তখন সেখানকার ইমামবাড়া হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। মদন কাওড়া নামে একজন কয়েদীকে ঐ হাসপাতালে আনা হয়েছে। তারিখটা ৪ঠা এপ্রিল, ১৮৪৫। ডাঃ ইসডেল তার দেহে অস্ত্রোপচার করবেন। কিন্তু তার আগেই মদন অসহ্য বেদনায় মুহ্যমান হয়ে বসে আছে। তখনও ক্লোরোফর্মের ব্যবহার শুরু হয়নি, অস্ত্রোপচার ছিল এক আসুরিক ব্যাপার। মদনের যন্ত্রণা দেখে ডাঃ ইসডেলের করুণা হল। তিনি ওর বেদনা উপশমের জন্য সম্মোহনের সাহায্য নেওয়া স্থির করলেন। মদনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত চালিয়ে সম্মোহনের প্রক্রিয়া শুরু করলেন। দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় মদন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে বেদনার সব চিহ্ন। ডাঃ ইসডেলের আমন্ত্রণে

হুগলীর জজ সাহেব রাসেল এবং কালেক্টর মানি সাহেব সম্মোহনের ফল দেখতে এসেছেন। তাঁরা মদনের ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য পিন ফোটালেন, চিমটি কাটলেন, নাকে ধোঁয়া দিলেন, এমনকি জ্বলন্ত কয়লার সেঁকা দেওয়া হল দেহের বিভিন্ন স্থানে, তবু মদন মড়ার মতো পড়ে রইল, চেতনার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। মদন মুক্তি পেয়েছে তার বেদনা থেকে। এই অচেতন অবস্থাতেই ডাক্তার প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারটি সেরে ফেলেছেন।

অনেক পরে চোখমুখে জল ছিটিয়ে সম্মোহনবিদ্যার রীতি অনুযায়ী হাত চালিয়ে মদনকে জাগিয়ে তোলা হল। প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল, অস্ত্রোপচারের কথা কিছুই টের পায়নি!

পূর্বেই বলেছি, সে যুগে অস্ত্রোপচার ছিল এক আসুরিক ব্যাপার। সার্জনের সঙ্গে থাকত জনাচারেক বলশালী লোক। তারা রোগীর হাত-পা ধরে রাখত, রোগী বেদনায় চীৎকার করত, ডাক্তারের কাজ চলত তারই মধ্যে। ক্লোরোফর্ম যদিও আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দে, অস্ত্রোপচারের জন্য রোগীর চেতনানাশের জন্য এর ব্যবহার শুরু হয় ১৮৪৭-এ স্কটল্যাণ্ড-এ। সুতরাং ডাঃ ইসডেল ভাবলেন, রোগীর কষ্ট দূর করবার জন্য সম্মোহনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মদনের উপর সম্মোহনবিদ্যার সফল প্রয়োগ তাঁকে এই পদ্ধতি অবলম্বনে উৎসাহিত করল। এপ্রিল ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৬-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ডাঃ ইসডেল ৩৭টি বেদনাহীন অস্ত্রোপচার করে ছিলেন ইমামবাড়া হাসপাতালে। সম্মোহনের সাহায্যে এ-সব অপারেশান হয়েছে। সম্মোহিত ব্যক্তির হাত, টিউমার, স্তন কেটে

বাদ দেওয়া হয়েছে বিনা যন্ত্রণায়। এছাড়া অর্শ, হাইড্রোসিল, সাইনাস, দাঁত প্রভৃতি অস্ত্রোপচার করে অনেক রোগীকে সুস্থ করে তুলেছেন ডাঃ ইসডেল।

শুধু যে অস্ত্রোপচারের জন্যই সম্মোহনবিদ্যার প্রয়োগ করা হত তাই নয়। ইমামবাড়া হাসপাতালে নানা রকম বাত, শোথ, মৃগী, মানসিক ব্যাধি প্রভৃতিরও চিকিৎসা করতেন ডাঃ ইসডেল। হাসপাতালে দরিদ্র লোকেরাই তখন আসত। ডাক্তার সাহেব যে ভাবে খুশি চিকিৎসা করবার অধিকার পেতেন। সম্মোহন-চিকিৎসা কিন্তু সমাজের উপর তলাতেও সাড়া জাগিয়েছিল। হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বর ঘোষাল। ইনি সে বছর পুরীর রথ ও মন্দিরের অশ্লীল ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি অপসারণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে একটু আলোড়ন সৃষ্টি করে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী খুব অসুস্থ। ৬ই মে (১৮৪৫), রাত ৮টায় ডাঃ ইসডেল ঈশ্বরবাবুর বাড়ি গেলেন তাঁকে দেখতে। সাংঘাতিক মৃগী। সমস্ত শরীরে একটু পরপরই খিচুনি ধরে যায়। অবস্থা দেখে ডাক্তার সাহেবও চিন্তিত। যাই হোক, এক ঘণ্টার চেষ্টায় ইসডেল রোগীকে সম্মোহিত করে চলে এলেন। ধীরে ধীরে কয়েকদিনের মধ্যে ঈশ্বরবাবুর স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ইমামবাড়া হাসপাতালে বহু রোগীর ভিড়, নানা ধরনের রোগ। অনেক চিকিৎসক। প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীর পরিবর্তন সেখানে সম্ভব নয়। ডাঃ ইসডেলের অনুরোধে সরকার ক্যালকাটা নেটিভ হসপিটালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি পৃথক ঘর দেন। দশজন রোগী নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। পরে তিনজনকে বিদায়

দেওয়া হয়। কারণ, তাদের সম্মোহিত করা যায়নি। বাকী সাতজনের শল্যচিকিৎসা করা হয়। হরানন্দ লাহার ১১২ পাউণ্ড ওজনের এক টিউমার কাটা হয়েছিল সম্মোহিত করে।

ডাঃ ইসডেলের কাজকর্ম খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবার জন্য সরকার সাতজনের এক কমিটি করেছিলেন। কমিটির সভাপতি ছিলেন ইনস্পেক্টর-জেনারেল অব হসপিটালস্। কমিটি ইসডেলের কাজের প্রশংসা করায় সরকার কলকাতার মট্ লেনে সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি পৃথক হাসপাতাল খোলেন। এক বছরের জন্য হাসপাতালের কাজ আরম্ভ হয় ১৮৪৬-এর নভেম্বর মাসে। হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল ডাঃ ইসডেলকে। তাঁর সহকারী হলেন সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন বদনচন্দ্র চৌধুরী। পাঁচজনের একটি পরিদর্শক কমিটি গঠিত হল। সভ্যদের মধ্যে ডাঃ মৌয়াট ও ও'শোনেসির নাম আমাদের নিকট পরিচিত।

ক্যালকাটা মেস্‌মেরিক হসপিটালের ছিল দুটি বিভাগ শল্য ও সাধারণ চিকিৎসা। শল্য-চিকিৎসার জন্যই অবশ্য রোগী আসত বেশী। কারণ, বেদনাহীন অপারেশানের আর কোনো উপায় তখন ছিল না। তাই অনেক দূর থেকেও রোগী এসে ভীড় করত। চট্টগ্রাম থেকে উত্তর প্রদেশ—সব জায়গা থেকে রোগী এসে ভর্তি হয়েছে হাসপাতালের রেকর্ড থেকে দেখা যায়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ইংরেজ, ফরাসী—সব রকম রোগীই এখানে চিকিৎসিত হয়েছে। শল্য-চিকিৎসা ছাড়া বাত, হিস্টিরিয়া, মানসিক বিকৃতি, প্যারালিসিস ইত্যাদির জন্য রোগীরা

আসত। অস্ত্রোপচার বেশী করা হত টিউমার ও হাইড্রোসিলের জন্য।

সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসা ছিলএক অভিনব ব্যাপার। ওষুধ খাওয়া নেই, অস্ত্রোপচারের বেদনা নেই। কেমন করে এই চিকিৎসা করা হয় তা দেখতে আসতেন কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকেরা। ভারতীয় ও য়ুরোপীয়ান দুই সমাজের লোকই। চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে তাঁদের বিশ্বাস হয়ে ছিল যে, এই রীতির চিকিৎসা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, কারণ স্নায়ুমণ্ডলী এতে শান্ত হয় ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না।

হাসপাতালে রোগীকে সম্মোহিত করবার জন্য পৃথক একটি ঘর ছিল। রোগী সম্মোহনে সম্পূর্ণ অচেতন হয়েছে কিনা তা ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে আঘাত দিয়ে নিশ্চিত ভাবে জেনে তাকে অপারেশান টেব্‌ল-এ পাঠানো হত। অনেক সময় একবারে রোগীকে সম্মোহিত করা যেত না। সাত আট দিন ক্রমাগত চেষ্টার পর হয়ত কোনো কোনো রোগীকে অচেতন করা সম্ভব হয়েছে। কাশীর দহমনির ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার ঘটে ছিল। ৯ই নভেম্বর ১৮৪৬, সে হাসপাতালে ভর্তি হয় স্তনের ক্যানসারের জন্য। সাত দিন যাবৎ তার উপর সম্মোহন পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিয়ে যাওয়া হল অপারেশান টেবিলে। অস্ত্রোপচার যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন দহমনির জ্ঞান ফিরে এল। শুরু হল চীৎকার আর দাপাদাপি।

এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা। তখন নতুন করে সম্মোহিত করে অস্ত্রোপচার নতুন করে শুরু করতে হয়! আবার এমন

দৃষ্টান্তও আছে যেখানে রোগীকে সম্মোহিত করা যায়নি বলে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্যালকাটা মেস্‌মেরিক হসপিটাল পরীক্ষামূলক ভাবে এক বছরের জন্য স্থাপিত হয়ে ছিল। অধ্যক্ষ ডাঃ ইসডেলকে প্রতি মাসে হাসপাতালের কাজকর্ম সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে হত। এইসব ছাপা রিপোর্ট থেকে রোগী ও রোগের বিবরণ এবং অন্যান্য তথ্য পাওয়া যাবে। পরিদর্শকরা এসে সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখতেন। এদের মধ্যে ও'শোনেসি ছিলেন সবচেয়ে সোচ্চার সভ্য। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জোর সমর্থক ছিলেন তিনি। কিন্তু হাসপাতালের কাজ শুরু হবার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির সমালোচক হয়ে উঠলেন। কয়েকবার তিনি দেখলেন অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ না হতেই রোগীর চেতনা ফিরে এসেছে। সুতরাং এক বছর পূর্ণ হবার পর ও'শোনেসি মেস্‌মেরিক হসপিটাল আরও চালাবার জন্য আর সুপারিশ করলেন না। তিনি ছিলেন সার্জারির অধ্যাপক তাঁর মতামতের মূল্য ছিল কর্তৃপক্ষেব কাছে। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি মেস্‌মেরিক হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যায়!

কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকরা ছিলেন সম্মোহন-চিকিৎসার পক্ষপাতী। তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন করলেন, হাসপাতালের কাজ যেন অব্যাহত থাকে। কিন্তু গবর্নমেণ্টের সম্মতি মেলেনি। আবেদনকারীদের জানিয়ে দেওয়া হল ইচ্ছা করলে তাঁরা চাঁদা তুলে হাসপাতাল চালাতে পারেন। সম্মোহন দিয়ে চিকিৎসার এতই ভক্ত ছিলেন তাঁরা যে, হাসপাতাল পরিচালনের দায়িত্ব

স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। জনসাধারণের চাঁদায় ক্যালকাটা মেস্‌মেরিক হসপিটাল আবার খোলা হয় ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। এভাবে চলেছিল বছর খানেক। অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ ইসডেল।

হাসপাতালটি বন্ধ হলেও সম্মোহন চিকিৎসা আরও কিছুকাল চালিয়েছিলেন ডাঃ ইসডেল। ১০ই এপ্রিল, ১৮৫১, তিনি সুকিয়াস লেন ডিস্‌পেনসারির সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট নিযুক্ত হন। এখানে তিনি চিকিৎসা করতেন সম্মোহনের সাহায্যে। ১৮৫১ পর্যন্ত এই চিকিৎসা চলে ছিল। তারপর ইসডেল অবসর গ্রহণ করে স্বদেশে ফিরে যান। ততদিনে ক্লোরোফর্ম এদেশে এসে গেছে। ইথারের ব্যবহারও কিছু কিছু শুরু হয়েছে। সুতরাং সম্মোহিত করবার প্রয়োজন ধীরে ধীরে কমে গেল।

ডাঃ ইসডেল 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিসিন অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সে' একটি প্রবন্ধে তাঁর সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ-দেশের রোগীদের বিশিষ্ট গুণাবলীর জন্যই আমি সফল হতে পেরেছি। আমার রোগীরা প্রকৃতির সন্তান, তারা সরল, কোনো ভাবনা নিয়ে মগ্ন হয় না, প্রশ্ন করে না, কৌতূহলী নয়, সুতরাং তাদের সহজে গভীর ভাবে সম্মোহিত করা যায়।

একটি পিতলের পাত

শ্রীপান্থ

সকালে মস্ত মস্ত বাড়ির দারোয়ানেরা এখানে বসে দাঁত মাজে আর দেহাতী গান গায়। দশটা বাজতে না বাজতেই এসে দাঁড়ায় সারি সারি গাড়ি। ফুটপাথ দিয়ে চলে সারি সারি পদাতিক। গা বাঁচিয়ে দেওয়ালটা ঘেষে পান সাজতে বসে একটি মেয়ে। একদল লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে তাবিজ-ওয়ালার। ছাড়া-পাওয়া ড্রাইভাররা পান চিবুচ্ছে রোদে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি নেই, কিন্তু ইস্টার্ন রেলওয়ের রেন-পাইপে বারো-মাসী বান। দর দর করে জল চলছে ফুটপাথ ভাসিয়ে।

আরও একটু সরে দাঁড়াতে হল ড্রাইভারদের। চার্টকে আরও একটু সরিয়ে নিয়ে গেল তাবিজওয়ালা, বাক্সটাকে একটু কোলের দিকে টেনে নিল পানওয়ালী। হয়ত জুতো বাঁচাতে আপনিও একটু বেঁকে গেলেন বাঁ দিকে।

কিন্তু কোথায় গেলেন জানলেন কি ? জানলেন কি, ইস্টার্ন রেলওয়ের এই বিরাট বাড়িটার এই ছায়াপুষ্ট ফুটপাথটি ছেড়ে যাওয়া মানে,—ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কয় কদম হটে যাওয়া।

হ্যাঁ, হটে যাওয়া ছাড়া কি ? লক্ষ করলেই দেখতে

পেতেন—ঐ পানওয়ালীটির সামনে, ঐ নোংরা জলাধারটির নীচে ধূলিমলিন ফুটপাথের বুকে আজও জ্বল জ্বল করছে একফালি পিতলের পাত, জ্যামিতির খাতায় মোটা লাইনে আঁকা একটি কোণ।

প্রতিদিন বহুজনের পদধূলি পড়ে এর ওপর। কিন্তু চোখ পড়ে বোধহয় অতি অল্পজনের। পড়লেই বা ক'জন ভাবতে পারেন—একদিন এখানেই ছিল ইংরেজের আদি কেল্লা, কলকাতার প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম। এইখানেই দাঁড়িয়ে একদিন লড়াই করেছিলেন আমাদের তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা, এবং এইখানেই দাঁড়িয়ে একদিন আত্মসমর্পনের নিশান দেখিয়েছিলেন হলওয়েল।

কলকাতার ইতিহাসে সে এক কাহিনী।

১৬ই জুন ১৭৫৬ সাল।

হৈ-হৈ করতে করতে নবাব সৈন্যরা এসে হাজির হল কলকাতায়। মারহাটা ডিচ-এর পাহারাওয়ালারা ভয়েই পথ ছেড়ে দিল তাদের। 'পেরিনস পয়েণ্ট'-এ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল কোম্পানীর নাবিকেরা, কিন্তু সেও বানের মুখে বালির বাঁধ।

পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে দেখতে দেখতে সিরাজউদ্দৌল্লা এসে দাঁড়ালেন ডালহৌসী স্কোয়ারে-এ। সামনে তাঁর ইংরেজের উদ্ধত কেল্লা ফোর্ট উইলিয়াম। কেল্লার বাইরের লড়াইয়ে তিনি জিতেছেন। এখন বাকী শুধু এই ফোর্ট উইলিয়াম। ফোর্ট উইলিয়াম দখল করা মানেই—ইংরেজের কেল্লা চিরকালের মত ফতে করে দেওয়া।

সিরাজউদ্দৌল্লা জানতেন, এই কেল্লাখানাই ইংরেজের সর্বস্ব। ওদের ধন দৌলত, বাণিজ্য সওদা যা আছে তা এই কেল্লার ভেতরেই। এমন কি, এটাও তাঁর অজানা নয় যে কলকাতায় যত ইংরেজ আছে তাদের সবাই আজ এখানে।

সুতরাং রাজদুর্লভের ওপর হুকুম হল—চল কেল্লা।

কেল্লার ভেতরে তখন জড়াজড়ি করে পড়ে আছে রাশি রাশি ভয়। গতকাল কোম্পানীর হিসেবের খাতাপত্তর সব জাহাজে চড়েছে। আজ উনিশে দশটার সময় পালিয়ে গেছেন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেণ্ট ড্রেক এবং বড় বড় সামরিক কর্তা-ব্যক্তিরা। এখন কেল্লায় আছে বলতে কয়েক হাজার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, পর্তুগীজ, আরমেনিয়ান মেয়ে-পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চা, আর সাকুল্যে সব মিলিয়ে পাঁচ শ পনের জন সৈনিক। এর মধ্যে আড়াই শ মাত্র পাল লড়িয়ে। বাদবাকীরা সব অ্যামেচার।

উপায়ান্তরহীন হলওয়েল বললেন, তিন-তিনটে সিন্দুক ভর্তি সোনাদানা, গিনি মোহর রয়েছে কেল্লায়। এগুলো তোমাদের সমানভাবে ভাগ করে দেব আমি। তোমরা লড়াই কর।

২০শে জুলাই, ১৭৫৬ সাল।

দুপুরের আগেই তিন-তিনবার কেল্লার গায়ে আছড়ে এসে পড়ল নবাব সৈন্যরা। বিকেলে কুণ্ডুলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠল কেল্লা থেকে। লক লক করে আগুনের শিখা উঠল অন্ধকার আকাশে। রাজবল্লভ আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দিলেন ইংরেজদের। এক শ' ছেচল্লিশটি নরনারীকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন হলওয়েল।

যুদ্ধ থেমে গেল। উত্তরের প্রবেশপথ দিয়ে বিজয়গর্বে সিরাজউদ্দৌল্লা ঢুকলেন বিধ্বস্ত ফোর্ট উইলিয়ামে।

ফোর্ট উইলিয়াম তখন একটা ধ্বংসস্তূপ মাত্র। ইংরেজের গর্ব যেন ইচ্ছে করেই গুঁড়িয়ে পড়ে আছে বাংলার নবাবের পায়ে!

এত বড় একটা ঘটনা হয়ে গেল খাস ডালহৌসী স্কোয়ারে—কিন্তু তার কোন সংবাদ রাখে না আজকের ডালহৌসী! নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার মত কলকাতার লড়াই, ফোর্টউইলিয়ামের পতন সবই তার কাছে ইতিহাসের স্মৃতি মাত্র। তার বেশী কিছু নয়।

নয় বলেই, ফেয়ারলি প্লেস দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডাল-হৌসীর পথিকদের কদাচিৎ আজ নজরে পড়ে ফুটপাথের গায়ে মিশে থাকা আড়াআড়ি এই পিতলের পাতটিকে। পায়ে পায়ে প্রতিদিন কত লোক মাড়িয়ে যাচ্ছে এটি, কিন্তু কৈ কারও তো মনে পড়ে না একবার সিরাজউদ্দৌল্লার কথা, কিংবা ডালহৌসীর সেই ঐতিহাসিক লড়াইটির কথা। এর ক'পা দূরে—উত্তরের সেই প্রবেশপথটি দিয়েই তো একদিন বাংলার নবাব ঢুকেছিলেন ইংরেজের কেল্লায়।

তাকিয়ে দেখুন উল্টো দিকের দেওয়ালটিতে একবার! ঈষ্টার্ণ রেলওয়ের বাড়ির দেওয়াল। মার্বেল পাথরে পরিষ্কার হরফে লেখা আছে "এইখানে এই পিতলের পাতটি বরাবর ছিল ফোর্টউইলিয়ামের উত্তর-পশ্চিম কোণ।" কেল্লার উত্তর সীমা। গায়েই ছিল কেল্লার বিরাট ঘাট। জোয়ারের দাগ পড়ত এর

দেওয়ালের গায়ে। পায়ে পড়ে থাকত ভাটার জলরাশি। নদী তখন স্ট্যাণ্ড রোডের ওপারে নয়। এখানে। ফেয়ারলি প্লেসের মাঝামাঝি।

কেল্লার পূর্ব সীমা ছিল নেতাজী সুভাষ রোড, দক্ষিণ সীমা জেনারেল পোষ্ট অফিস। জেনারেল পোষ্ট অফিসের ভেতরে ঢুকলে আজও দেখতে পাবেন গুটি কয়েক খিলান। ফোর্ট-উইলিয়ামের অবশেষ। এখানেও যথারীতি লেখা আছে পাথরের গায়ে সেই পরিচয়লিপি। কলকাতার স্মৃতিশক্তি কম। কার্জন সাহেব তাই লিখিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সে ১৯০০ সালের কথা। আজ তিনিও ইতিহাস।

কিন্তু আজও আছে—পিতলের এই স্মারকগুলো। এই ফেয়ারলি প্লেসের বুকে পর পর দু' জায়গায় চোখ মেলে তাকালে আজও দেখতে পাবেন জ্বল জ্বল করছে ফোর্টউইলিয়ামের উত্তর সীমা। ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের নীচে থেকেও এখনও উঁকি দিচ্ছে ইতিহাসের একটি আস্ত অধ্যায়। এইখানে এই ফেয়ারলি প্লেসের এই জায়গাটিতেই একদিন উদ্ধত হয়ে উঠেছিল একটি সাম্রাজ্য-সাধনা এবং এইখানেই এই পিতলের রেখাটি থেকে সামান্য কিছু দূরেই প্রথমবারের মত ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল সেই স্বপ্ন। এদিকেই ছিল ফোর্টের উত্তরের গেট। এবং সেই প্রবেশদ্বার দিয়েই বাংলার নবাব ঢুকেছিলেন একদিন ইংরেজের কেল্লায়।

কলকাতার গঙ্গা

কমলকুমার মজুমদার

মাধবায় নমঃ, জয় জয় মা কালী, জয় রামকৃষ্ণ! আমি অযুত পূর্বজন্মকৃত পুণ্যতে গঙ্গা বিষয় লিখিবারে আদিষ্ট হইলাম। মাগো আমি তোমার আমার প্রতি করুণার কথা প্রকাশিব!

গঙ্গায় অন্ধকার নাই!

গঙ্গায় আমার ভক্তি পাঁচসিকে পাঁচ আনা, এইরূপ এ দাসের হয় মতি যে যখনই ঐ অলৌকিক স্নেহময়ী ধারায় ডুব কাটিল সে তন্মুহূর্তে ঠাকুব ঘরে প্রবেশিবার শতেক বাধা উজাইল, এইরূপ এ কাঙালের বিশ্বাস, গঙ্গার জল মাথায় ছিটাইলে, তদীয় ডান হস্ত বাম হস্তের নিকট কিছুটি লুকায় না; যে এবং এইরূপ আমার জাগা ঘর, যে, গঙ্গার জল পান করিলে আমার ভিতর শুদ্ধ হয়।

হায়, ইহা কি আমার নিকট তিলক শোভা মাত্র! প্রত্যহ ত আমি গঙ্গাজল খাইয়াছি। তুলসী পাইয়াছি!—তবে নিশ্চয় আমাতে ভক্তি আছে। এবং ঈদৃশী সত্যে ছাড় নাই, বাঙালীর উচ্চবর্ণ বুঝি ও তাহা হইতে প্রত্যেকের, বংশ মর্যাদার সুন্দরটাই মা গঙ্গার; এখনও যে আমাদিগের কণ্ঠস্বর ঐ নিয়ত প্রবাহিনী

গঙ্গার সন্ধ্যার সকালের মধ্যরাত্রের ও বিবিধ ঋতুভেদের ধ্বনিমাত্রা দ্বারা নির্ম্মিত, আমরা ঐ গঙ্গার স্বরে কথা বলি। আমাদিগের যুগ্ম হস্তের গতি কপালের দিকে।

ঐ স্বরে কেশব সেন ডাকিয়াছেন, গঙ্গা তুমি অমৃত নদী… গঙ্গা তুমি বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধিকারিণী বলিতেছ, ভাই তোমাদের কবিত্ব রস আছে, আমি, মার নাম করি শুন, তোমরা মার নাম কর আমি শুনি, শান্ত স্বভাব গঙ্গে তুমি প্রাণকে টান। হে মোক্ষদায়িনী, আমরা তোমার স্তব করিতেছি। মহাপ্রভু বলিলেন, গৌড় দেশে আমার মা ও জাহ্নবী দেখিয়া যাইব। এইভাবে গঙ্গার সহিত আমার নাড়ীর টান। গঙ্গা আমারে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে দেয় নাই! ভূদেববাবু কহিলেন, আমরা ভাগীরথীর সন্তান! ইহা মদীয় নির্ভাবনা আনিল।

আমার মা কখনও নিগঙ্গার দেশে মরিতে চাহেন নাই। রাখিয়া হইতে গঙ্গা অনেক দূরে, ভাগলপুর! বহুলোক ছোট বাঁকে করিয়া, রাত বেরাত হাঁটিয়া, গঙ্গোদক আনিত; বাবা বৈদ্যনাথের মাথায় দিবে—আমরা বারান্দায় দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলাম—এখন, তাই, মা রিখিয়ার বাড়িতে—ছোট জালাতে গঙ্গাজল রাখিয়াছিলেন, এই জালার—এমনই এক গৃহস্থিত জালার, ইহাতে গঙ্গাজল, পাশে আসন করিয়া নাগ মহাশয় ধ্যান জপ করিতেন—কাছে আর একটি পাত্রে গঙ্গা মৃত্তিকা; ক্রিয়াকর্ম্মে অনেক চেঞ্জার আমাদের বাড়ী গঙ্গাজলের খোঁজে আসিতেন; আমরা গামছা পরিয়া হয় গঙ্গার জল বা মৃত্তিকা আনিয়া দিতাম; মার সহিত তর্ক হইয়াছে, গামছা পরিব কেন,

গঙ্গার জলে হাড়ি ডোম অবধি শুদ্ধ হয়! মা উত্তর করিলেন, আমি বলিতেছি! দেয়, মরিয়াছে বলিয়া কাঁড়িখানে মাটি যেন দিও না।

বিশেষত মৃত্যুতে গঙ্গাজলের প্রয়োজন হইবেই ; সকলে গঙ্গাতীর যেমন কামনা করেন , তেমনই চাহেন, মৃত্যুকালে, এই নশ্বর ওষ্ঠে যেন তুলসী বা বিল্বদল টুপাইয়া গঙ্গাজল পড়ে ; আমার ঠাকুমা যাইতেছেন, গঙ্গোদক দেওয়া হইতেছে এবং তৎসহ বিবিধ কণ্ঠে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ধ্বনিতে ঘর রণিয়া উঠিতেছে, আমি দেখিতে আছি, ঐ ঘরে উপরিভাগ বহু দূরে সরিয়া কোথায় যেন নিশ্চিহ্ন হইতে আছিল। বল, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম! মরণোন্মুখ যিনি, তদীয় মাটির ওষ্ঠদ্বয়ে তিনি নিত্য নাম অস্ফুটভাবে উচ্চারিতে প্রয়াসিলেন। ঐ জল বিন্দুতে কখনও বুদবুদ হয় নাই, এখন প্রদীপের আলো যাহারে পাচার করিয়াছে, আমি নাসিকা ঐ শব্দর নিকট লইলাম, আঃ এক অপূর্ব সৌরভ! ও যে ইহা, শ্রাদ্ধর চিঠিতে গঙ্গা কথাটি আমারে সম্মোহিত করিয়া থাকে—একশোবার যে মনেতে খেলিতেছে, আমি যেন গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিতে পারি!

আমি গঙ্গাযাত্রা দেখিয়াছি, আর যে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ধ্বনি কি বা পরমদ্ভুত বিস্ময়ের সূত্রপাত করিল ইহাও, গঙ্গাযাত্রীর স্বজনরা ঐ পদ অতীব সুললিত স্বরে বলিতেছিল, গঙ্গা উত্তর-বাহিনী হইতেছেন, মধ্যে মধ্যে নৌকার ক্বচিৎ আলোর চেকনাই, আড়পারে অন্ধকার কিছুদূরে মাঝি মল্লাদের গুন টানিয়া চলা-কালীন কথাবার্ত্তা, ঘাটে কেহ জপ করে, অন্য পার্শ্বে সন্ন্যাসী

ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া, এবং এমত সময় স্টিমারের দূরপাল্লার আলোকপাত গঙ্গার পাথুরে হিম ছড়াইয়া দিল ; নৌকার চোখ সকল কি পর্যন্ত ভয়ের হইল ; তীরস্থিত বৃষকাষ্ঠ নড়িয়া উঠিল ; অবিলম্বে এক মায়িক স্বরভেদে উহার ভোঁ বাজিয়া চলে ; ইহাতে আমার সর্বশরীরে সিঞ্চিড়া কাটিল, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ শব্দকে অনৈসর্গিক করিল, ফেরী বা খেয়া ঘাটের ডাক, পারে যাব হে ! নিশ্চয়ই গঙ্গাযাত্রী গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়াছে।

মহর্ষি যখন অল্পবয়সী তখন এমনটি দেখিলেন, সারাক্ষণ কীর্ত্তন হইতে আছে, তিনি কাঠের উপর বসিয়া আছেন, সমস্ত পরিবেশ তাঁহার মনকে বড় নাড়া দিল ; তিনি ঐ বয়সে অবশ্যই আদিঅন্তহীন এক মহাব্যোমের মধ্যে মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলেন। এই সনাতন হিন্দু অনুষ্ঠান তাঁহাকে ভাবুক করিল ! গঙ্গা তীরের এই ছবি তিনি আমরণ জাগ্রত রাখিয়াছিলেন।

এই গঙ্গার সহিত আমাদিগের জীবন দারুণ ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে ; কি হাত আমাদের গঙ্গাজল দরকার ; তাই দেখি, দূর দূর দেশে গঙ্গার জল যাইতেছে, কলিকাতার বড় জমিদার সকলের বাড়ী প্রায়ই দেখিতাম, গরু-গাড়ীতে বিরাট তামার হাঁড়া পোক্তরূপে বাঁধা তাহাতে গঙ্গাজল চলিয়াছে, পাত্রটির গা বহিয়া জল ; তদ্দর্শনে আমরা, বিকালে, ক্রীড়া সঙ্গীদের সহিত যাইতে কালে ব্যঙ্গ করিয়াছি নির্ব্বোধ বেটাদের বাড়ি কি গঙ্গা জলের ট্যাঙ্ক নাই। ইহার কিছুদিন পর ঐ দৃশ্য মন্তব্যের সঙ্গেই এই উত্তর শুনিলাম, ট্যাঙ্কের জলের চরণামৃত দিলে তুমি খাইবে, একই ত জল ! . আমাদের মধ্যে কেহ উহার জবাব দিতে পারি

নাই, রাস্তার জল দেওয়ার দিকে চাহিয়াছিলাম, পিচকারি দেওয়া জল খুব লাল, নিশ্চয় সাঁওতাল পরগণা ধোয়া জল গঙ্গায় আসিয়াছে। কোথায় যেন ঐ প্রশ্ন আঁচড় দিল!

এই গঙ্গা যে আমাদের কতখানি তাহা কেমনে বিস্তারিব, অজস্র সাধক ইহার বিন্দুটি দর্শনে মা, মাগো বলিয়া উঠিয়াছেন : বড় চমকপ্রদ, যাহা মহাপ্রভুর জীবনে, এমন আছে ঃ আগামী-কল্য উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন, অপরাহ্নে কতিপয় ভক্তের সহিত নগর ভ্রমণার্থে বহির্গত হইলেন···মনে মনে সমস্ত পরিচিত তরুলতা, গৃহ ও পথ প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন পরিশেষে সুরধুনীর তীরে যাইয়া তাহার নিকট বিদায় লইলেন।

নাগ মহাশয় ভগবান রামকৃষ্ণের জিজ্ঞাসাতে বলিয়াছিলেন, যে, গঙ্গাহীন দেশে ভক্তরা শরীর ধারণ করিতে চাহে না। তার্কিক হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু মা ভাগীরথী তীরে জন্ম গ্রহণ না করিলে শুদ্ধাভক্তি হয় না! আঃ ঠাকুর! এই সেই গঙ্গা! বারম্বার মনে হইয়াছে, 'আমি কখনও গঙ্গা দেখি নাই।' এই লাইনটি বঙ্কিমবাবুর। এই লাইনটি জপিতে আমার মধ্যে অনৈসর্গিক এক পরিবর্ত্তন সম্ভবে! ঐ আমার পরণের কাপড় বাতাসে মিলাইয়া যায়।···বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়! ঠাকুর বাড়ীর ফরাস আলোর আয়োজন করিতেছে। কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুইজন পূজারী গঙ্গায় অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুচি করিতেছেন। শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদের রাত্রিকালীন শীতল দিতে হইবে।···

শ্রাবণ মাসের খরস্রোত ঈষৎ বীচিকম্পিত গঙ্গা প্রবাহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমের বারান্দা হইতে কিয়ৎ কাল গঙ্গা-দর্শন করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত এইভাবে গঙ্গা আমারে পাইয়া বসিয়াছে ; যখনই শুনি, যে মন চাঙ্গা তু কুটির মে গঙ্গা ! আমি গম্ভীর ইহাতে ; অনেক পরে আমার বাবার নিকট, বাবা রিফর্মড হিন্দু ছিলেন ইহাতে জানিলাম। উহা বড্ড জবর ভক্তিমার্গের হেঁয়ালি ! গঙ্গাকে ঘরে লওয়া ! যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা ! ঈদৃশ নিরহঙ্কার বোধ কোথায় এরূপ স্বীকারোক্তি ! দশহরার দিন দুই তীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, প্রত্যেকের মুখে মৃদু হাস্য। কি ভক্তি ! আবার দেখি, কুশাঙ্গুরীয় অঙ্গুলি কাঁপিতেছে—হাতে লাগান কৃষ্ণ তিল। তর্পণ হইতেছে—হা একদা রামচন্দ্র এমনই তর্পণ করিতে বলিয়াছিলেন। পিতা তুমি মন্দ ও সুনির্মল জল গ্রহণ করো ! হাওড়ার পুল, বিখ্যাত প্যান্টন ব্রীজ খোলা হইয়াছে, পুলের ঠিক মাঝ বরাবর জায়গাতে খোলা, অর্থাৎ সেইখানকার অংশ সরাইয়া পুলের পাশে গঙ্গাতে রাখা ; ইতঃমধ্যকার ফাঁক দিয়া বড় বড় জাহাজ পাটকলের দিকে, উত্তরে যাইতেছে। আমার ঠাকুরমার সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছি—তখন বয়স কতই বা ঘাটের উপরে যে মন্দির তাহার ঘণ্টা হাত উঁচাইয়াও ছুঁইতে পারিতাম না ; এই ঘাটটি বেশ ঢাকা চাতাল বেশ অন্ধকার—কলিকাতায় আমরা সূর্য্যোদয় গঙ্গায় দাঁড়াইয়া দেখি না—এখানে অন্যান্য ঘাটের মত অনেক পায়রা ইহারা স্থাপত্যের অঙ্গীভূত তেরিকাটা খিলানের সূক্ষ্মতা লইয়া ওই পায়রাগুলি এদিক-সেদিক উড়িতে আছে ; আবার

কখনও থামশীর্ষের, বেশীরভাগ করিন্থিয়ান— ডরিক আইওনীয়ও আছে—কেয়ারির অপূর্ণতা বুঝিতেছে : ঘাট গঙ্গার জলে নামিয়াছে। পশ্চিমরা উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করিতেছে, কেহ লোটা লইয়া উঠিতে আছে, কেহ গঙ্গা-মৃত্তিকা দিয়া পৈতা মার্জ্জনা করে। কেহ আহ্নিক করে, কেহ চন্দন ঘষে, কেহ ডুব কাটে, অজস্র লোক গঙ্গা হইতে সূর্য্য প্রণাম করে, তাহাদের আঁজলার জল পড়িতেছে কালে রামধনু রঙ চানকায়! বড় জাহাজে যাওয়ার ঢেউতে ঐ সকলেরা অদ্ভুত হাওয়াতে টলিতে আছে : ভাসমান ছেলের। ঢেউ বাহিত ঘাটে পড়িল : কুচুরীপানা কাহারও মুখে ঝাপটা মারিল। উপরে ব্রীজের মুখে ঠাসা ভীড়, হাওড়ার দিকে খুন খারাবী ভীড়। ছ্যাকরা গরুরগাড়ী মোটর ট্রাম লোকজন মোটঘাট এলাহি ব্যাপার। পোর্ট পুলিশের (?) অনবরত বাঁশী বাজাইতেছে! এমন একবার আমরা ফাঁদে পড়িয়াছিলাম, ব্রীজ নড়িয়া উঠিল হঠাৎ দুই তীর হাঁদা হইয়া গেল। হাওড়ার ইষ্টিশানের ২৪ মিনিট পিছান ঘড়িটা বেপট হইল। বড়রা বলিতে লাগিলেন, ইস্ ইংলিশম্যানটা দেখিলে হইত। গঙ্গা স্নান করিতে থাকিয়া আমরা জাহাজের নাম পড়িতেছি এস এস লিভারপুল! এস. এস ··

সেইদিনকার রায়েটে এই গঙ্গা দিয়া অসংখ্য কুপাইয়া কাটা খাবলান দেহ, যাহার উপরে বসিয়া কাক ঠেকরাইতে আছে, ভাটার টানে চলিয়াছে—এতই বীভৎস দৃশ্য ইহা যে এই সুউচ্চ ব্রীজে দাঁড়াইয়া থুতু ফেলিয়াছি, যখন পুলের নীচে প্রায়, আমি পা সরাইয়া লইয়াছি ; কিন্তু ইহাতে আমারে ঈষৎ

অন্যমনস্ক করিল না, এই দৃশ্য হইতে, যে মহাপ্রভু গঙ্গাতীরেতে ছাত্রদের সহিত বসিয়া আছেন,—যুগপৎ নন্দবাবুর একটি কালিতে আঁকা ছবি, নিমাই পণ্ডিতের টোল আমাতে ভাসিয়া উঠিল—এমত দাম্ভিক কেশব কাশ্মিরী, মুখে গঙ্গা বিষয়ক কবিতা! নিমাই কেমনভাবে তাহার দর্পচূর্ণ করিলেন তাহা! এ কথাও, যে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গঙ্গাকে এতেক ভক্তি করিতেন, যে গঙ্গা স্নান করেন নাই কোনদিন কেন না পা ঠেকিবে! ন্যাংটা গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিতে যাইয়া অবাক হইয়াছিলেন! মকরে বৃহৎ গয়নার (!) নৌকায় অজস্র সন্ন্যাসী সাগর সঙ্গমে যাইতেছেন। উত্তরপাড়া বা রিষড়ার কোন একটা ঘাটে দান সাগরে হাতী গাভী সকলকে স্নান করান হইতেছে। (হরিহর ছত্র হইতে ঐ হাতী যখন আসিল তখন আমরা দেখি।)—মেয়েরা জল সইতে আসে।

ম্যান অফ ওয়ার দেখিতে যাই, তাহার সৌখীন গন্ধ—উপরে ইউনিয়ন জ্যাক্ অদ্ভুত দর্পে উড়িতেছে, আমাদের এক দাদা সে স্কাউট—সে ডেকে দাঁড়াইয়া তিন আঙুলে, সেলুট দিল, ঐ ডেকের উপর হইতে আমরা প্রিন্‌শেপ ঘাট, বাবু ঘাট, ঐখানে আমার নিত্য স্নানের—তেনা—গঙ্গায় নিত্য স্নানের জন্য লোকে ছোট বস্ত্র খণ্ড ব্যবহার করে কেন না জলে দাগ ধরে—চুরি যায়; আর ঐখানে…দিদি শিব গড়িয়া পূজা করে ঐখানে আমরা কলা বৌ স্নান করাইতে আসি। ঐ সেই গঙ্গা যেখানে ঠাকুরের সহিত রামলালা স্নানে নামিয়া ঝাঁপাই জুড়িয়াছে।

কোথাও এই দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে, ত্রিভুবন তারিণী

তরল তরঙ্গে দারুণ বিশেষণ হইয়াছেন, শিবনাথ শাস্ত্রী কেন ইহা যে কাহারও জীবন ধারা স্পষ্ট বুঝাইতে লাগাইয়াছেন তাহা খুব সাদা ঃ এখন আপনারা দেখুন, একটা নদী নামিয়াছে। গঙ্গোত্রীর কাছে দেখুন এক নদী নামিয়াছে, পাথর কাটিয়া, মানবাত্মার গভীর স্থান দিয়া, এক নদী প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ঐ দেখুন উনবিংশ শতাব্দীর ভগীরথ রামমোহন রায় এক নদী নামাইয়া আনিয়াছেন। পুনরায় আরোপ করিলেন, এক ব্যক্তি আমার নিকট গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গার এত মাহাত্ম্য কেন ? তিনি বলিলেন, দেখুন, গঙ্গার জলে সব রোগের ঔষধ আছে। তিনি ইংরেজী-জানা লোক, তিনি বলিলেন, গঙ্গার জলে এমন সকল স্বাস্থ্যকর ingredients আছে, যাতে শারীরিক সকল ব্যাধি দূর হতে পারে। যাই হোক, গঙ্গার জলে এই সকল ingredients আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি যে ভক্তি গঙ্গার কথা বলিতেছি—তাহাতে আছে, এই মেটাফর !

গঙ্গা বিস্ময়কর চেহারা লইয়াছে, যখন ছোট ঢালাই কাজ দেখি, আমার নিকট ঐরূপ কয়েকটি কাজ ছিল, ইহাকে বলা হয় গঙ্গা-যমুনা, গঙ্গার জল গৈরিক (!) সব জায়গাতে নহে—যমুনা নীল। এখানে তামাটে ও সোনাটে। কাপড়ে গহনাতে এবং কাঁথাতে ভারী মজার খোট পেড়ো সেলাই নক্স আছে। ইত্যাদি বহু কিছুতে। তেমনি আমাতে স্রোতাঙ্গনা এক লোকোত্তররূপে নিশ্চয় আছেন !

অর্দ্ধোদয়যোগ চূড়ামণি যোগে, সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণে আমি স্নান

করিয়াছি, বিচিত্র পতাকা শোভিত বিদেশী জাহাজ, সারেঙ বিরাট নোঙর আমার চোখে পড়িয়াছে ; মা মাগো বলিয়া ডুব দিয়াছি, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে মা মা ধ্বনি খেলিয়া উঠিতেছে ; এমন এক যোগে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ত্রিবেণীর ঘাটে, কোম্পানীর বহরকে রুখিতে কহিলেন, এবং পুণ্যলোভীদের বলিলেন গঙ্গা নাম। (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) শত শত কণ্ঠে জয় জয় মা ! উচ্চারিত হইল ! এই ত্রিবেণীতে এক মহাশ্মশান আছে কত শব যে আসে ! নৌকায়, গো-গাড়ীতে ইদানী ; মোটর যোগে।

এই ত্রিবেণীর ঘাটের ঠাকুরঘরের একটি রাখালবাবু লিখিত বিখ্যাত দুর্গামূর্ত্তি আছে, শুধু এখানে বলি কেন কলিকাতার হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট ঠাকুরঘরগুলিতে কত যে দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তি আছে, তাহা চিন্তা করা যায় না। আমি তিন ইঞ্চি দুর্গামূর্ত্তি হইতে বহুরূপ এবং সাগরদীঘি কিবকীহার ব্রোঞ্জর মত বিষ্ণু দেখিয়াছি।

গঙ্গার দুই তীরে অনেক শ্মশান আছে, তন্মধ্যে নিমতলা এখানে এবং ত্রিবেণীতে বহু ধ্যান-ধারণা হইয়াছে : কেওড়াতলা ইহার ধূম জগন্মাতা দেখিয়া থাকেন ; বরাহনগরে ঠাকুর শেষকৃত্য সমাধা হয়। শিবপুর ও নিমতলা যথেষ্ট পরিচিত, নাগ মহাশয় এখানে জপ করিয়াছেন। আজও দেখা যায় নবীন সন্ন্যাসী, সংসার বিরক্তরা, ঐ সব মহানদের উদ্দেশ শ্যামাসঙ্গীত গাহেন। নৌকা হইতে এ শ্মশান অতীব সুন্দর, কুণ্ডলী পাকাইয়া ধূম ঊর্দ্ধে উঠিতেছে ; কেহ মহা ভৈরবকে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষিয়াছেন। এখানে বহুবার ঐ সকল গান শুনি, 'এই খেদে খেদ করি,

তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।' এবং মজলো আমার মন ভ্রমরা! (কমলাকান্ত) রামপ্রসাদের গান! তখন মাইরী আর কোন খেদ নাই।

তখন তাহাদেরও মনেই পড়ে না, এই গঙ্গায়, চিতি কাঁকড়া চাটুতে সেঁকিয়া সরষে মাখাইয়া যে দল পানীয় সহযোগে খাইতে হেদাইয়া থাকে ; মনে পড়ে না, তপসে মাছ মেইয়নেজ দিয়া আঃ! কিম্বা নিকটে বিচুলী ঘাটের ইলিশ তুল্য কিছু নাই! আঃ স্মোক্‌ড হিলসা! এই দল এক আধবার খাদ্যের কথা বা টান অনুভব করে কিন্তু উঠে না। ইহারা মহা ধুম-রাশির দিকে চাহে ; এরূপ ধূমরাশি আমি দেখিয়াছি একদা গঙ্গাতীরে যখন···দিদি কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া বৈধব্য গ্রহণ করিলেন, আকাশমার্গে সেই ধূম কালো করিয়া উঠিল।

কাশীতে মহাশ্মশান। এখানে শিব তারকব্রহ্ম নাম নিজে দেন। আমার বড় সাধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল কাশীর ঘাটে, রামায়ণ পাঠ করিব। কেমন গ্যাস বাতি কিনিব তাহাও দেখিয়া-ছিলাম, রামায়ণ পাঠ শিখিয়াছি, গীতে সুর দিয়াছিলাম। বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কি শালার জীবন হইল। কাশীর জল আমাকে অছ্য ঠাট্টা করে, আমার চোখে জল আসে, এই সেই কাশী ঐ সেই গঙ্গা যেখানে তৈলঙ্গ্য স্বামী ভাসিয়া থাকিতেন। শ্রীধর স্বামী প্রত্যহ স্নান করিতেন। সনাতন ঘাটের ভিখারীর নিকট হইতে কন্থা লইয়াছিলেন। আঃ ভগবান শঙ্কর। কত নাম বলিব ; কোথায় কোন ঘাটে দাঁড়াইয়া কাঁচকামিনী (কামিনী কাঁচ ব্যবসায়ী বাবুদের রক্ষিতার!) কাহাদের শ্লেষের উত্তরে

বলিয়াছিলেন, মাগো তপস্বিনীর ভাগ্য যদি পাই—আমি জন্ম-জন্মান্তর যেন ঐ হই। তাহা জান ; কোথায় হিস হাইনেস মহারাজার বসন্তকালীন রক্ষিতা—পারলি, প্রত্যহ পদব্রজে গঙ্গা স্নানে আসিত, তাহা পশ্চাতে তদীয় ভেড়য়া বুলবুল হাতে ও বিল্লী কোলে লইয়া অনুসরণ করিত। পারলি প্রথমে দামী আতর গঙ্গায় মহা ভক্তি ভরে ঢালিতে থাকে, ঐ গন্ধ দ্রব্যের ব্যস এমনই যে ভ্রমর আসিত। এই মেয়েছেলেটির ভক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার কণ্ঠস্বর ভুলিবার নহে, 'ভর ভট্টিমে বা মার কাটারী নয়না বাণ' কাফি, খম্বাজ, জঙলা—হায় হায় করিয়া উঠে। ইহারে শেষ দেখি বারাবঙ্কীর পীরে দরগাতে। যে গোলাপ পাশটি দেয় যেও গালদান দিয়া ছিল আঃ মরি! পারলি গঙ্গায় ডুব দিত কি কামনায় জানি না। আবার জানিও বটে। ঠাকুরে গল্পে আছে, যাহার বিশ্বাস আছে তাহারই পাপ যায়। (হর-পার্বতীর পরীক্ষা) এনাকে দেখিয়াছি, শুনিয়াছি একদা খুব নামডাক ছিল, আজ বাগান বাড়ী, কাল ষ্টীমার পার্টি, পরশু অন্য কোথাও মাইফেল : হয়ত গান গাহিতেছে, 'খাঁচার পাখী গেল উড়ে' এমত সময় যদি রাস্তা দিয়া শবযাত্রার হরিধ্বনি শোনা যাইত, তখনই সে বলিত, পুঁটি দেখত মা কে যায়! পুঁটি বারান্দায় যাইয়া শবযাত্রা দেখিয়া চিৎকারিল, মা সতী গো! অর্থাৎ এয়োস্ত্রী! এনার মুখ থিতাইয়া গেল। এই এনা গঙ্গা ডুব দিয়া কহিত—মাগো আর জন্মে সতী কর! কত লোক দোল পূর্ণিমার দিন, মা গঙ্গাকে আবির কুমকুম দিয়াছে। জানিয়াছি, ১০ই জ্যৈষ্ঠ কাশীতে গঙ্গায় ভারী যোগ, গঙ্গার জন্ম, এইদিন অল্পবয়সী মেয়েরা গঙ্গাকে

তাহার খেলনা সকল নিবেদন করে। এই আচারটি ভাবিতে আমার গাত্রে সিঞ্চিড়া লাগে। ঐ বাবা বিশ্বনাথের পদধৌত প্রবাহিনী গঙ্গা তাহার উপর নানাবিধ খেলনা ভাসিতেছে—আমার ভিতরে কত যে নৌকা তৈয়ারী শব্দ জমা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি! শুনিয়াছি, কাশীর সকাল, আউধের (?) সন্ধ্যা ও সালেয়োর রাত্র! সকালবেলা গঙ্গার ভাসমান খেলনা ধারণা করিতে আমার অন্তর আত্মা চিন্ চিন্ করিয়া উঠিল গঙ্গা যে কি পর্যন্ত পূর্ণজ তাহা আমাকে ভরাইয়া তুলিতে আছে—আমাদের ঠাকুর কুলুঙ্গীর পাশেই রবিবর্মাকৃত বিখ্যাত গঙ্গা অবতরণ আমার সামনে প্রকট হইল। আমি কখনও গঙ্গায় সাবান মাখি নাই।

অধুনার ঐ ক্যানটিলিভার ব্রীজ নির্মাণে অসংখ্য ড্রিলের শব্দ গঙ্গার বহতা ধ্বনি নস্যাতিতে পারে নাই; যুদ্ধে প্রকাণ্ডবপু বেলুন সকল উড্ডীয়মান দেখিলাম, ইহা আমার গঙ্গা প্রণামের ইতঃমধ্যে আসে নাই, আমি রবিবর্মার ছবির ভাবুকতা। এই ভাগীরথীকে হুগলি বলিলে কোটি হিন্দুর মত আমার কিছু যায় আসে না! কবে এখানে গঙ্গাহৃদি ছিল (১৯১১ সালের ওমেলির সেনসাস রিপোর্টে যতদূর মনে পড়ে আছে গোয়ালপাড়াতে ১০।১২ ঘর গঙ্গাহৃদি ছিল।) এই গঙ্গায় বালাম নৌকা চলিত হুয়েন সাঙ কানসোনাতে আসিয়াছিলেন, হুমায়ুন গঙ্গা মসকে পারে হওয়ত ভিস্তিকে তক্তে বসাইয়াছিলেন। কে দোভাষী সম্পর্কে লিখিল, জব চর্ণক কে? কে কটি সতীদাহ দেখিয়াছিল। ওভিদে গঙ্গা শব্দ আছে! হিন্দু স্টুয়ার্ট রোজ কোন ঘাটে স্নান করিতেন ইত্যাদি বহু কিছুই আমার কাছে আষাঢ়ে গল্প!

আমার সেই স্থান দেখিতে ইচ্ছা করে যেখানে সুরেশ দত্তর আকুল ক্রন্দনে ঠাকুর গঙ্গা হইতে আবির্ভূত হওয়াতে মন্ত্র দিলেন। যেখানে মহাপ্রভু পুরী গমনে গঙ্গা পার হইলেন, যেখানে রামপ্রসাদ গান গাহিলেন। জয়দেব কোন ঘাটে স্নানের পর গিয়া লিখিলেন 'দেহী পদ পল্লব মুদারম' গঙ্গার নিকট আমি সেই ছড়াটি বলিয়াছি ঃ কাল খাবে পিঠে ভাত। আজ খাবে গঙ্গার জল। এ বছর যাও পোষলা কাঠের মালা পরে আর বছর আনব গো-দুধ তুলসী দিয়ে। ··ছোপড়ে লোপড়ি গাও সিনাতে যাই। গঙ্গার দুই তীরবর্তী অসংখ্য চিমনী—প্রবাহিনী সৌন্দর্য এতটুকু মার যায় না।—জলে যেখানে তেল পড়িয়াছে মনে হয়—অদ্ভুত চীনে কাজ। অসংখ্য ভিখারী আমার ভাব নষ্ট করে না। আউটরাম ঘাটের চায়ে বা ফুলেশ্বরে ডাক বাংলা, বা কোম্পানীর —রেস্টুরেণ্ট সময় অতিবাহিত করা কখনই গঙ্গার মহিমাকে ধামসাইতে পারে নাই, ডায়মণ্ড হারবারে পার্টিগুলি আমার কাছে বৃথা মনে হইয়াছে। হ্যামাক-এ শুইয়া কেতা দোরস্ত হওয়া, বোহেমিয়ান কাঁচেতে সরবৎ আদি হইতেও মনে আছে, হরিদ্বারে যখন দোলাতে প্রদীপ ভাসান দেখি। হোয়াইট ওয়েজ-এর চায়ের ঘর হইতে পশ্চিমের আকাশ দেখিয়াছি,—মাস্তুলের কিছু কিছু দেখা যায়, মনুমেণ্ট হইতে গঙ্গার দিক! এখনই অনুভব করি, কাল আমবারুণী কচি আম আমি মা গঙ্গাকে দিব, গঙ্গায় স্নান করিব। যখন মনে করিতে চেষ্টা করিয়াছি, একবার পোর্টপুলিশ সার্চ লাইট ফেলিয়া আমাদের নৌকা ধরিল। সেই গল্প করিব তখনই সেই ঘটনাকে ঢাকিয়া

দুর্গা প্রতিমা ভাসানের কথা। দুই নৌকা মধ্যস্থিত মা দুর্গা প্রতিমা, কর্ত্তা কহিল এইবার অবিলম্বে নৌকা সরিতে আরম্ভিল আমাদের বুক কাঁপিল। তাহার পর এক শব্দ! আমরা কাঁদিয়া ফেলিলাম। দুর্গামূর্ত্তি ডুবিতেই হিম উঠে, আমের বোল দেখা দেয় ব্রাহ্মণী হংস আকাশে ফুট কাটে! অথবা এই সেই গঙ্গা আমার মা ষষ্ঠী দিন ঐ ঘাটে গঙ্গার তীরে ভিজা কাপড়ে আমাকে একটি সিন্দুর দেওয়া আম দেন, এবং পাখার বাতাস করেন। এই সেই গঙ্গা জগজ্জননী মা সারদেশ্বরী আঁধারে যখন অবগাহন নিমিত্ত আসিতেন সেই সময় একবার কুমীরের পিঠে পা পড়িল! আর এই সেই গঙ্গা যাহার তীরে বালিতে মা মা বলিয়া ঠাকুর মুখ ঘষিয়াছেন।

বঙ্কিমবাবু শুনিলেন, গঙ্গায় নৌকার মাঝি গাহিতেছে ঃ

সাধ আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে

এখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল বাঙলা ভাষায় বাঙালীর মনেব আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারেই বটে, তাহা বুঝিলাম! এখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল।

আমি এখনও কচি আম হাতে গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া আছি। বারম্বার ইহা আভাসিত হয়, আমি কখনও গঙ্গা দেখি নাই।

খাওয়া দাওয়ার কথা

হিরণকুমার সান্যাল

সে রাম নেই, সে অযোধ্যা নেই, সে ঘিও নেই। সুতরাং সে লুচি কোথা থেকে থাকবে? আর লুচি না থাকলে নিমন্ত্রণ হল কি? লুচি অবশ্য একরকম আছে, কিন্তু আগেকার দিনের লুচি আর এই লুচি! এক একটা লুচির ব্যাস ছিল কতটা! আর কী তার গন্ধ! যখন ভাজা হত পাড়া হতো মাৎ, আর সেই গন্ধের সঙ্গে সানাইর সুর ভেসে আসত হাওয়ায়। এখনকার সানাইও বিগড়ে গেছে লাউড স্পীকারের কল্যাণে। আসল কথা হাওয়াই বদলে গেছে। যে হাওয়াতে লুচি ভাজার গন্ধ আর সানাইর করুণ সুর ভেসে আসে না সে কেমনতর হাওয়া? বিয়ে বাড়িতে সে লুচি না হলেও লুচি এখনো হয়, তার সঙ্গে আরো অনেক জিনিস যা আইনমতে নিষিদ্ধ আর কিছু কিছু নতুন জিনিস। যেমন কেটারার-পরিবেশিত বড় বড় মাছ ভাজা —যাকে বলা হয় ফ্রাই। মাছভাজা বললে নাকি এর মানহানি হয়, কেননা এক এক টুকরো মাছের ওপর মালমশলার পলস্তারা দিয়ে এই ফ্রাই তৈরি হয়। এ জিনিস আমাদের ছেলেবেলায় ছিল না। তারপর যখন ফ্রাইর আবির্ভাব হয় তা তৈরি করত

পেশাদারি ঠাকুররা। কেটারারদের হাতে পড়ে এই ফ্রাইর স্বাদ, সৌষ্ঠব ও সম্মান অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু মোটামুটি ব্যাপার বাড়ির ভোজন সীমায় গত সত্তর বছরের মধ্যে যে বিশেষ কিছু বদল হয়েছে তা মনে হয় না—অবশ্য আইনেব বাধার কথা বাদ দিলে। একটা পুরো ভোজের খাদ্য তালিকা ধরা যাক। লুচি, রাধাবল্লভি, শাকভাজা, বেগুনভাজা. আলুব দম বা ছক্কা, ছানাব বা ধোকার ডালনা, নিরামিষ ও আমিষ ডাল, ঘি ভাত, মাছের কালিয়া, ফ্রাই নিরামিষ ও আমিষ চপ্, মাংসের কোরমা, চাটনি, দই, দুই থেকে চার রকম মিষ্টি। এক সময়ে বিয়ের খাওয়ার ক্ষীর প্রায়ই দেওয়া হত, আর কখনে কখনো রাবড়িও। আর যখন চিংড়ি পাওয়া যেত তখন বিয়েব ভোজের পাতে চিংড়ি প্রায়ই পড়ত। এখন নাকি এ দেশেব চিংড়ি যায় বিদেশীদের পেটে, আর তার বদলে বৈদেশিক মুদ্রা জমা হয় আমাদের তহবিলে। একেই বলে পেটের দায়।

আমি যা খাদ্যতালিকা দিলাম তা হলো রাতের খাওয়ার। এই তালিকায় আরো দু-চার পদ যোগ করা যেতে পারে। কোনো কোনো নিমন্ত্রণ বাড়িতে পঞ্চাশ ষাট পদ পরিবেশন করা হয়েছে শুনেছি। সেকালের এক পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে শুনেছি এই রকম ব্যবস্থা Barbaric grandeur ছাড়া কিছু নয় তবে এইরকম তাক লাগানো ভোজ ছিল বিরল। ঋতুতে ঋতুতে তার একটু আধটু রকমফের ঘটত, যেমন পটলের সময়ে পটল, কপির সময়ে কপি। সেকালে আবার মাংসের এত চলন ছিল না, তবে মাছটা থাকতেই হবে। এখন মাংস খাওয়াট

বেশ বেড়েছে, শুধু বৃহৎ ভোজে নয়, গৃহস্থ বাড়ির দৈনিক ভোজেও।

এবার মধ্যাহ্ন ভোজের কথা একটু বলি। সাধারণত বাইরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ যা পাওয়া যায় তা বেশির ভাগই বিয়ের খাওয়ার যা রাতে ছাড়া হয় না। আর এই খাওয়ার জাতই হ'ল আলাদা, অর্থাৎ সাধারণ বাঙালি খাওয়ার থেকে এ হ'ল একটু আলাদা ধরনের। কিন্তু সাধারণ বাঙালি বাড়ির মধ্যাহ্ন ভোজনের থেকে নিমন্ত্রণ বাড়ির মধ্যাহ্ন ভোজনের তফাৎ শুধু পদগৌরবে। রোজকার খাওয়ার পাঁচ রকম বা সাত রকম পদের জায়গায় নিমন্ত্রণের সময়ে পদ সংখ্যা হয় দশ পনেরো বা কুড়িও। যেমন আপনার রুচি বা সামর্থ্য অনুযায়ী আপনি খাওয়াতে পারেন। সাদা ভাত, ঘি ভাত, শুকতো, শাকভাজা, ছ্যাঁচড়া, আলুপটল বা আলুকপির তরকারি, মোচার ঘণ্ট, ছানার ডালনা, ধোঁকার তরকারি, নিরামিষ ও আমিষ ডাল, রুইমাছের ঝাল, চিংড়ির মালয়কারি, ইলিশমাছের পাতুড়ি, মাংস, চাটনি, রায়তা, দই, পায়েস আর তিন চার রকম বা ততোধিক মিষ্টি। অবশ্য অদল-বদল কিছু হতে পারে। তবে দুপুরে ভাত হতেই হবে।

যদি জিজ্ঞাসা করেন জাতের তফাৎটা হল কোথায়, বলব ঐ ভাতে। ভাত না হলে কি আর শুকতো চলে? আর বাঙালি নিরামিষ রান্নার চরম উৎকর্ষ দেখা যায় শুকতোতে। এই শুকতো মাসের মধ্যে ত্রিশদিনই খাওয়া যায়, প্রত্যহ নতুন রূপে নতুন স্বাদে। আর ছ্যাঁচড়াও কি ভাত না হলে জমে? আর মালয়কারি বা ইলিশমাছের পাতুড়ি? একথা বর্বরজন-

বিসংবাদিত হলেও রসিকজন না মেনে পারবেন না যে বাঙালির রন্ধনশালায় শুধু আমিষ নয় নিরামিষ ব্যঞ্জনও যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তার তুলনা নেই। আর ভাত, ছাড়া এসব ব্যঞ্জনের স্বাদই পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙালির রন্ধনশালার আজ কী অবস্থা? এক সময়ে ছোট গৃহস্থ বাড়িতেও নিরামিষ ও আমিষ দুটো রান্নাঘর প্রায়ই থাকত। আর একান্নবর্তী পরিবারে বিধবারও অভাব হত না নিরামিষ রান্না করার জন্যে। এখন কটা ফ্ল্যাটের বাড়িতে দুটো রান্নাঘর থাকতে পারে? আর নিরামিষ ভোজী বিধবাদের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। তাই এক বন্ধু দুঃখ করে বলেছিলেন, স্ত্রী বিধবা না হলে মার হাতে যেমন নিরামিষ রান্না খেয়েছি তা আর জুটবে না।

যাই যোক, বেশির ভাগ বাঙালি খুশি হয় মাছ ও ভাত পেলে। শুকতো চচ্চড়ি ল্যাবড়ার নাম শুনলেই অনেকে নাক সিঁটকোয়, বিশেষ করে তরুণরা। কিন্তু কলকাতার পথে ঘাটে বহু হোটেল রয়েছে সেখানে শুধু ভাত ডাল মাছ নয় কোনো কোনোটিতে ভালো নিরামিষ ব্যঞ্জনও পাওয়া যায়। অবশ্য 'হোটেল' কথাটা বাংলা, ইংরেজি হোটেলের সঙ্গে এর মিল নেই। ভাত পাওয়া গেলেই হোটেল আর চপ কাটলেট জাতীয় খাদ্য পাওয়া গেলেই তা হল রেস্টুরেণ্ট। দেখেছি একই ঘরে একদিকটার নাম হোটেল আর এক দিকটার নাম রেস্টুরেণ্ট, যেখানে চলে চপ কাটলেটের কারবার। এই যে চপ কাটলেট, যা ব্যাপার বাড়িতে পৈতাধারী ঠাকুররাও তৈরী করে করে তার সঙ্গে বিলিতি চপ কাটলেটের সাদৃশ্য প্রায় নেই

বললেই হয়! তবে আমাদের ছেলেবেলার পৈতাধারী ঠাকুরদের হাতে যে পাউরুট তৈরী হত তা তখনকার গ্রেট ইসটারন হোটেলের পাউরুটির সঙ্গে টেককা দিত। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা এই পাউরুটি খেয়ে তৃপ্তি পেতেন ও জাত বজায় রাখতেন। এক নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্যারিষ্টারের কথা শুনেছি যিনি বোতল থেকে বিশেষ এক জাতীয় পানীয় দামি কাঁচের গেলাসে ঢেলে পান করার আগে বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ করে শোধন করে নিতেন। জানি না নিষিদ্ধ মাংসও এইভাবে শোধন করে সেবা করা চলে কি না। তবে এখন তো দেখি বহু খাবার পরোটার দোকানেই বড় বড় হরফে লেখা থাকে : No Beef। এতে হিন্দু আচারের বিশুদ্ধতা রক্ষা হলেও কাবাবের অমর্যাদা ঘটে, কেন না নিষিদ্ধ মাংস ছাড়া কাবাবের মতন কাবাব হয় না।

বৈদিক ঋষিরা এই কথা জানতেন। কাবাব অতি উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বাঙালি আমিষ রান্নার পরাকাষ্ঠা কি, আমি জোর গলায় মাছের কাঁটা দিয়ে তৈরি ছ্যাঁচড়া। ব্যাপার বাড়িতে ছাড়া ছ্যাঁচড়ার আসল স্বাদ ফোটে না, কেন না রান্নার একটি মূলসূত্র হল যে পরিমাণের সঙ্গে উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। মার্কসীয় তত্ত্বে একেই বলে চেনজ অফ কোয়ানটিটি ইনটু কোয়ালিটি। এইখানে একটু ইতিহাস চর্চা করা যেতে পারে। বছর ষাটেক আগে কলকাতায় এখনকার মতন এত চকচকে রেস্টুরেণ্ট ও ভাতের হোটেল না থাকলেও যেগুলি ছিল সেগুলি ফ্যালনা নয়। ভাতের হোটেলগুলোকে বলা হ'ত পাইস হোটেল। তখন এক পয়সারও দৌড় ছিল

অনেক দূর, মহামূল্য মাছ মাংসের ব্যঞ্জন পাওয়া যেত বড় জোর চার পয়সায় দাম দিয়ে। মাছ ডাল তরকারি কিনলে ভাতের দামই দিতে হ'ত না। এই রকম একটি পৌরাণিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ খ্যাতি ও প্রভূত খদ্দের অর্জন করল শুধু ছ্যাঁচড়ার মাহাত্ম্যে। অমন ছ্যাঁচড়া আর কোনো পাইস হোটেল করতে পারত না। সুতরাং প্রতিযোগীরা একজোট হয়ে গোয়েন্দা লাগিয়ে আবিষ্কার করল ঐ হোটেলের খদ্দেরদের পাতে যাবতীয় উচ্ছিষ্ট মাছের কাঁটা আস্তাকুঁড়ে না ফেলে জমা করা হত বড় বালতিতে, তারপর তার সদ্ব্যবহার হত পরের দিনের ছ্যাঁচড়ায়।

তবে এই ঘটনা হোটেল রহস্যের চরম দৃষ্টান্ত নয়। আমি বিগত যুগের কথা বলছি। অখণ্ড বাংলাদেশের এক মহকুমা শহরের হোটেলের প্রকাণ্ড একটা মাছের মুড়োর রসার দাম ছিল এক আনা—চিবিয়ে খেলে, আর চুষে খেলে মাত্র দু পয়সা। কেন তা বুঝতে পারছেন। শোয়ার ব্যবস্থাও ছিল তেমনি—কাৎ হয়ে শুলে যত, চিৎ হয়ে শুলে তার দ্বিগুণ। তবে এক এক সময়ে পাইস হোটেলের মালিকরা মার খেয়ে যেতেন—ফ্রি ভাতের ব্যবস্থার ফলে। একটি ঘটনার কথা বলি। জন চারেক পাড়াগেঁয়ে খদ্দের এসে অর্ডার দিলেন আট দশ রকমের ব্যঞ্জনের। বোঝা গেল ভাতের পরিমাণটাও তেমনি হবে। মালিক তাই এক এক থালা স্তূপীকৃত ভাত ধরিয়ে দিলেন প্রত্যেকের সামনে। দেখেতে দেখতে শুকতো দিয়েই সে ভাত উড়ে গেল। মালিক বললেন, "সে কি? এরপর আলুকপির

ডালনা, ডাল, মাছের ঝোল অর্ডার দিয়েছেন, কিন্তু এক থালা ভাত খেলেন শুধু শুকতো দিয়েই ?" খদ্দেররা বললেন "আজ্ঞে যা চারটি খাই তা তো মাছের ঝোল দিয়েই।" এইরকম খদ্দেরদের জন্যেই চালের আকাল হবার আগেই ফ্রি ভাত উঠে গিয়েছিল অনেক পাইস হোটেলের থেকে। এখন ফ্রি নেবুও পাওয়া যায় না।

ভাত ডালের কথা আর কত বলব, এবার একটু মিষ্টিমুখ করা যাক। শীতকাল আসন্ন, নতুন গুড় আসতে আরম্ভ করেছে কিন্তু আর একটু ঠাণ্ডা না পড়লে তার সৌরভ পাওয়া যাবে না। তখন খাবেন নতুন গুড়ের সন্দেশ, কড়াপাকের কিন্তু নরম অর্থাৎ একেবারে গরম অবস্থায়—সন্দেশের সেই ক্ষণস্থায়ী ব্রাহ্ম মুহূর্তে যখন কড়াপাকের সন্দেশ না কড়া না পুরো নরম। সুতরাং বাড়িতে আনা চলবে না ; সেবা করতে হবে দোকানে বসেই। আর সেরকম দোকান কলকাতায় খুব বেশী নেই। আমি বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে কাজ করি না, সুতরাং এইসব দোকানের ঠিকানা বলতে পারব না।

রাম নেই, অযোধ্যা নেই, ঘি নেই, চিংড়ি নেই। এমন কি আমাদের ছেলেবেলার মাধববাবুর বাজারও নেই। তাকে গ্রাস করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্বাচীন অপভ্রংশ। তবু এই সন্দেশ যতদিন পাওয়া যাবে ততদিন বঙ্গ সংস্কৃতির উজ্জ্বল দীপ্তি অম্লান থাকবে। আর এই সংস্কৃতির কেন্দ্র যে কলকাতা তার প্রমাণ, কলকাতার বাইরে এই রকম সন্দেশ কোথাও পাওয়া যায় না।

কলকাতার ভূত

সুভাষ সমাজদার

দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে কলকাতা।

পুরানো বাড়ি ঘর ভেঙে সেই জমিতে আকাশ ফুঁড়ে উঠছে স্কাইস্ক্র্যাপার। তার ঘরে ঘরে নিওনের উগ্র সাদা আলো ঝলমল করে। বিশাল ডবলওয়ে এক একটা রাস্তার দুইদিকে সারি সারি সুদূর স্বপ্নের মত নীলাভ আলো।

এই জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল শহরের বুকে দাঁড়িয়ে যেমন প্রেত-অধ্যুষিত কোন বাড়ি, তেমনি কল্পনাও করা যায় না, গভীর রাত্রে কোন অভিশপ্ত প্রেতচ্ছায়ার অস্থির পদচারণা। আরও করা যায় না এইজন্যে যে বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিশারদ ম্যাকগ্রীগর থেকে শুরু করে পৃথিবীর দেশদেশান্তরের ভুতুড়ে বাড়ির বহুদর্শী প্রবীণ গবেষক প্রফেসার লোমব্রসো বলেছেন Dark and dilapidated houses are the favourite spot of phantoms অর্থাৎ জীর্ণ পোড়ো বাড়ি ভূতের প্রিয় আবাসস্থল। কিন্তু আজকের এই শহর কলকাতায় এই রকমের বাড়ি কোথায়?

স্মরণ রাখতে হবে ইংরেজদের তৈরি এই শহরের আদি-কালে তাদেরই বিলাসব্যসন এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে গড়ে

উঠেছিল যে কয়টি বিখ্যাত ইমারত, আর সেইসব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সৌধগুলির রোমাঞ্চকর ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার ইতিবৃত্ত তারা নিজেরাই লিখে গিয়েছে—

জজ কোর্ট ছাড়িয়ে গোপালনগরের দিকে যেতেই ঘন সবুজের ছবির মত ঘাসে ঢাকা বিশাল মাঠের ওপরে প্রায় দুশো বছরের পুরানো সেই বাড়ি। বাংলার ইতিহাসের বহু উত্থান পতনের সাক্ষী সেই বাড়ির চারিদিকে যখন দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে আর ফাঁকা মাঠে সাঁ সাঁ বাতাস অব্যক্ত যন্ত্রণার গোঙানির মত আর্তনাদ করতে থাকে, ঠিক সেই সময়—

দূরে-বহুদূরে মাঠের শেষে যেখানে রোদের চুমকিগুলো জ্বলে তার ভেতরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আট ফুকারের (আট ঘোড়ার) এক .রাজকীয় ল্যাণ্ডো গাড়ির ছায়াভাস। এক টুকরো ঘন কালো ছায়ার মত সেই গাড়ি অতি দ্রুত এগিয়ে আসে। বাড়ির সামনে এসে থামে সেই গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতর থেকে যেন কিসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নেমে আসে একটি প্রেতচ্ছায়া। বাড়ির আনাচে কানাচে ফার্নবীথির ঝোপে পামগাছের নীচে জঙ্গলে ঝুঁকে পড়ে কি যেন খোঁজে। কিন্তু—

কোথাও সে পায় না তার সেই হারিয়ে যাওয়া জিনিস। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সেই প্রেতমূর্তি। অস্থির পায়ে সেই বাড়ির সাদা পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে যায় দোতলায়।

কিন্তু কার সেই প্রেতচ্ছায়া ? কে সে, যে শত শত বছরের ব্যবধানকে এড়িয়ে প্রেতলোক থেকে ছুটে আসে কখনো স্তব্ধ

দ্বিপ্রহরে কখনো বা গভীর রাত্রিতে তার হারানো জিনিস খুঁজতে এই বাড়িতে ?

দেখুন এই ঐতিহাসিক বাড়িটা যে ভুতুড়ে বাড়ি সেটা জেনেছিলাম এখানে আসার আগে, বললেন এই বাড়ির বর্তমান বাসিন্দা লেডিজ হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেট প্রবীণ মহিলা, আমিও নিশিরাতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছি, ভর দুপুরে আমি নিজেব চোখে দেখেছি—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন। তাঁর চোখে মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল।

বলাবাহুল্য তিনিও রহস্যময় সেই ঘোড়ার গাড়ি আর সেই বিক্ষুব্ধ ছায়াদেহেরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। আরও আশ্চর্য একাশি বছর আগে (১৯০১) সেই বাড়ির তখনকার কেয়ারটেকারও ঠিক এই কথাগুলো বলেই রিপোর্ট করেছিল খোদ বড়লাট লর্ড কার্জন সাহেবকে। কার্জনের মত ধুরন্ধর মানুষও নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন সেই প্রেত-অধ্যুষিত বাড়ির বিবরণ শুনে। তা না হলে কেন পুরানো কলকাতার প্রামাণিক ও তথ্যনির্ভর ইতিহাসে লেখা হবে—For Calcutta tradition Connects this house with a famous ghost…

কোন ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তির প্রেতমূর্তি এখানে আনাগোনা করে তার আভাস পাওয়া যায় ক্যালকাটা গেজেটের (৬ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৭) একটি বিজ্ঞপ্তিতে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর আলিপুরের কান্ট্রি হাউসে কিম্বা ক্যালকাটা রেসিডেন্সে কালো রঙের বার্নিশ করা একটি টেবিলের

দেরাজে দুইটি ছবি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিগত কাগজ আর কোম্পানীর কয়েকটি প্রয়োজনীয় দলিল ভুল করে রেখে এসেছিলেন। কিন্তু পরে সেসব জিনিসের কোন হদিস পাওয়া যায় নি। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি কোন খোঁজ দিতে পারেন তাহলে তাঁকে দুই হাজার সিক্কা টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে—স্বাক্ষরকারী নেসবিট থমপসন ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

হেস্টিংস হাউসের প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক হেনরী কটন জানিয়েছেন নির্জন দুপুরে এবং গভীর রাত্রে আটঘুকারের ল্যাণ্ডো গাড়ির আরোহী হয়ে যিনি এখানে আসেন যাঁর ছায়াদেহ অস্থির আর ব্যাকুল হয়ে তাঁর হারিয়ে যাওয়া জিনিস খোঁজেন তিনি স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস। The great Governor General drives up the avenue…

প্রেতের আবির্ভাবের প্রসঙ্গ নিয়ে সুদীর্ঘকাল যিনি গবেষণা করেছেন ইটালীর সেই পরকালতত্ত্ববিদ লোমব্রসোও বলেছেন, অবদমিত কোন বাসনা অপূর্ণ কোন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহলে তার প্রেতাত্মাকে সাবেক জায়গায় প্রায়ই আনাগোনা করতে দেখা যায়।

হারিয়ে যাওয়া সেই অমূল্য জিনিসগুলোর জন্য হেস্টিংসের আকর্ষণ কত দুর্বার ছিল তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে থমপসনকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে—

তোমরা আজও আমার সেই দেরাজ থেকে খোয়া-যাওয়া মূল্যবান কাগজপত্রগুলো উদ্ধার করতে পারলে না—তুমি

ভাবতে পারবে না—আমি যে কী মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করছি—

মৃত্যুর পরপার থেকে বিদেহী আত্মা শুধুই যে তার পুরানো জায়গায় আসে তা নয়, পুরানো পটভূমিতে পুরানো সেই ঘটনার দৃশ্যটাও তারা কখনো কখনো নিখুঁত পুনরভিনয়ও করে যায়। এই তথ্যটি জানিয়েছেন সুবিখ্যাত পরলোকবাদী চার্লস রীচে।

বার্লিন থেকে কিছু দূরে এক খামারবাড়িতে প্রায়ই গভীর রাত্রে দেখা যেত ঘন অন্ধকারে এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তি ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে উঠোন ছাড়িয়ে পিছনে খড়ের গাদার দিকে। ডান হাতে উদ্যত পিস্তল।

কয়েক বছর আগে সেই বাড়ির বড় ছেলে খড়ের স্তূপের আড়ালে দাঁড়িয়ে পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেছিল।

আবার অনেক সময় প্রেতাত্মা সুবিচারের আশায় আবির্ভূত হয়। আলিপুরের-ই আর একটি পুরানো কালের সরকারী বাসভবনে ঘটেছিল এক আশ্চর্য ভৌতিক ঘটনা—

প্রবীণ এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হয়ে এলেন চব্বিশ পরগনায়। কোথাও কোয়ার্টার খালি নেই। তাই হাকিমসাহেবকে থাকতে দেওয়া হল আদিগঙ্গার খালের পাশে একটি বাংলোতে। সে-সময় এই অঞ্চলটা ছিল আরও নির্জন। বড় বড় শাল সেগুন আর শিরীষ গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে দিনের বেলাতেই কেমন গা-ছমছম করা ভুতুড়ে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখতো চারিদিক।

নতুন এই হাকিম ছিলেন যেমন সদালাপী হৃদয়বান, তেমনি বিচারে অত্যন্ত সুদক্ষ। তাঁর জাজমেণ্টের বা চমকপ্রদ এক একটি

রায়ের খুব সুখ্যাতি ছিল সারা জেলায়। তাই হয় তো ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে থানার বড়বাবু দুইজন সহকারী সাব ইনসপেকটারকে নিয়ে কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না খোঁজ নিতে এলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ধন্যবাদ জানাবেন। হেসে বললেন হাকিম আমার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না—

তবুও শুনলেন না বড়বাবু। হেঁকে ডাকলেন র—ঘু—না—থ—

বাংলোর কেয়ারটেকার বা চৌকিদার রঘুনাথ ছুটে এল। রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা। কাঁচা মাটির রাস্তার মত এবড়ো খেবড়ো মুখ।

কি রে সাহেবের রাতের খাবারের কি ব্যবস্থা করেছিস? ধমকে উঠলেন বড়বাবু।

আহা, কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন দারোগাবাবু। নতুন হাকিম বিব্রত হয়ে বললেন, ও এসেছিল—আমি ওকে একটু দুধ জোগাড় করতে বলেছি। একটু থেমে আবার বললেন, রাত্রে দুধ আর ফল ছাড়া কিছু খাই না—

নমস্কার জানিয়ে বিদায় হয়ে গেলেন দারোগাবাবু। রঘুনাথ দুধ নিয়ে এল। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লেন হাকিম সাহেব। আর সারাদিনের পরিশ্রান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন কিন্তু—

ধপ-ধপ-ধপ—বারান্দায় যেন কার পায়ের শব্দ হলো। ঘুম ভেঙ্গে গেল হাকিমের। বালিশের নীচ থেকে পিস্তলটা

নিয়ে শক্ত করে ধরে তীক্ষ্ণ চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

খুট—নিজে হাতে যে দরজার ছিটকিনি লাগিয়েছি সেটাই খুলে গেল। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আছড়ে পড়ল ঘরে। আর সেই বাতাসে পা ফেলেই যেন একেবারে তার তক্তপোশের সামনে এসে দাঁড়ালো সুন্দরী এক যুবতী। কিন্তু তার পরনের আধময়লা সাদা থান রক্তে ভেসে যাচ্ছে আর দারুণ যন্ত্রণায় মুখখানা এঁকে বেঁকে দুমড়ে দুমড়ে উঠছে। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার দীঘল শরীর।

কে তুমি? খিল দেওয়া দরজা খুলে তুমি কি করে এলে? তোমার কাপড়ে এত রক্ত কেন—চিৎকার করে এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছিলেন হাকিম বাহাদুর। কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে আতঙ্কে, উত্তেজনায় অসাড় হয়ে গিয়েছে চেতনা। তবুও—

নিজেকে সংযত করলেন তিনি। রিভলবারটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে তক্তপোশ থেকে নেমে পায়ে পায়ে তার সামনে এগিয়ে এসে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখতেই অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—এ কী! তোমার বুকের কাছে রক্তমাখা পুঁটলিটা কিসের?

আর পারলেন না হাকিম সাহেব। পিস্তল উঁচিয়ে চিৎকার করে বললেন, কে তুমি—শিগগির তোমার পরিচয় বলো—তাঁর ভরাট গলার জোরালো আওয়াজে নিশুতি রাতের নিস্তব্ধ বাংলোটা গম গম করে উঠল। কিন্তু—

আশ্চর্য মেয়েটি একটি কথা বলল না। শুধু সেই রক্তাক্ত কাপড়ে বাঁধা পুঁটলিটা আরো জোরে চেপে ধরল বুকের ভেতরে।

বিদ্যুৎচমকের মত সেই বহুদর্শী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মনে হল, নিশ্চয়ই কোন অপঘটন করে এসেছে মেয়েটি। এখন তার কাছে এসেছে প্রতিকার চাইতে। তীব্র ক্রোধে, উত্তেজনায় ঘৃণায় জ্বলে পুড়ে চিৎকার করে উঠলেন, কে তুমি—কথা বলো—তা না হলে দেখেছো—আমি কিন্তু গুলি করবো—

সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল অদ্ভুত একটা কাণ্ড। মেয়েটি জানালার দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে বাইরে যেতে ইঙ্গিত করে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হিম হয়ে গেল ডেপুটি সাহেবের বুকের রক্ত। ভাবলেন এ তো প্রেতিনী। ভূতপ্রেতে কখনো বিশ্বাস করেন না তিনি। ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে সাহস সঞ্চয় করে এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

চাঁদের আলোয় চারিদিক দিনমানের মত ফুটফুট করছে। কিন্তু কোথায় সেই মেয়েটি? হঠাৎ নজরে পড়ল বাংলোর সামনে মাঠে যেখানে দেবদারুবীথি আর শিরীষ গাছের নীচে আলোছায়ার জাফরি কেটেছে সেইখানে তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে সে।

হাকিম সাহেব তার কাছে এগিয়ে গেলেন। স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বাংলোর বাউণ্ডারী ছাড়িয়ে টালি-নালার দিকে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। নিশি পাওয়া মানুষের মত হাকিমও তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। খালের

ধারে একটা বুড়ো নিমগাছের নীচে থামল মেয়েটি। আর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁটে একটি জায়গা চিহ্নিত করেই মেটে মেটে জ্যোৎস্নার আলোয় ভরা টালিনালার উঁচু পাড় ছাড়িয়ে দূরে জেলখানার পাঁচিলের গায়ে জমাট অন্ধকারে মিশে গেল।

কুঠিতে ফিরে এলেন ডেপুটি সাহেব। তাঁর মনে হল ওই নিমগাছের নীচে মাটির ভেতরে নিশ্চয়ই আছে কোন রহস্য। রঘুনাথকে ডেকে সব কথা বলবেন। না—হয়তো ভয় পেয়ে কুঠি ছেড়ে পালিয়েই চলে যাবে।

পরদিনেই থানায় খবর পাঠালেন এবং বড়বাবুকে দুইজন কনস্টেবল সঙ্গে করে আসতে বললেন।

ব্যাপাব কি বলুন তো স্যার? হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন আলিপুব থানাব বড়বাবু, অর্থাৎ সদর পুলিশ ইনসপেকটার।

হাকিম সাহেবের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনেই রঘুনাথকে নিম গাছের নীচে সেই জায়গাটির মাটি খুঁড়তে হুকুম করলেন।

না—না বড়বাবু ওখানে জিন-পরীরা থাকেন, আমি ও জায়গা খুঁড়তে পারবো না, আর্তনাদ করে উঠল রঘুনাথ। কেন যেন নিদারুণ আতঙ্কে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং দারোগাবাবুর মনে হল ওই জায়গার রহস্যের সঙ্গে এই লোকটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল।

বড়বাবু ভয় দেখিয়ে বললেন, তুই খুঁড়বি কি না বল—তোকে কিন্তু গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাবো—

বাধ্য হয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রঘুনাথ নিমগাছের নীচে উঁচু ঢিবিটা খুঁড়তে শুরু করল। প্রায় তিনফিট নীচে পাওয়া গেল, রক্তমাখা কাপড়ে জড়ানো চার পাঁচ মাসের একটি ভ্রূণ।

সত্যি কথা বল কার সর্বনাশ করেছিস হাকিম সাহেব বললেন, তা নাহলে গুরুতর শাস্তি হবে—

রঘুনাথ হাকিমের পা-দুটো জড়িয়ে ধরে সেদিন যে জবানবন্দী দিয়েছিল তা এখানে বলা হল।

সেই সরকারী বাংলোর কাছে এক বিধবা যুবতী তার অগ্রজের সঙ্গে বাস করতো। তার সঙ্গে রঘুনাথের অবৈধ প্রণয়ের ফলে মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হয়ে ওঠে। গোপনে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটে। সেই রাত্রেই কিছু টাকা দিয়ে তার দাদাকে বশীভূত করে তারই সাহায্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে রটিয়ে দেয় কলেরায় আক্রান্ত হয়ে সে মারা গিয়েছে—এই পর্যন্ত বলে রঘুনাথ হাকিমের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, আমি গুরু অপরাধে অপরাধী। আপনি যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব হুজুর—

দারোগাবাবু, এইবার বুঝতে পারলেন, কে এসেছিল আমার কাছে রাত্রে, দূরে সেই নিমগাছটার দিকে ছাড়া ছাড়া গলায় বললেন হাকিমসাহেব, ওকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত হতভাগিনীর আত্মার শান্তি হবে না—

এসব ১৯০০ সালের ৪ঠা আগস্টের ঘটনা। আর এই প্রবীণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ

দত্তের পরিচিত। তাঁরই পরিচালিত বঙ্গদেশীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতি বা বেঙ্গল থিয়জফিক্যাল সোসাইটির মুখপত্রে বিচিত্র ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানিয়েছেন, সাধারণত স্থূলদেহ ত্যাগের পর আত্মা উর্ধ্বগামী হয়ে বাসনা ও ভাবনাদেহ অবলম্বনে ভুবঃ ও স্বলোকে অবস্থান করে। কিন্তু যদি ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অথবা অনুরূপ তীব্র বাসনা নিয়ে মৃত্যু হয় তাহলে তবে দুষ্কৃতিকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার অথবা সেই বাসনা জানাবার জন্য মৃত ব্যক্তি এমন লোককে দেখা দেয় যাকে দিয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে—

ব্রিটিশ ন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশান অফ স্পিরিচুয়্যালিস্টের বা ইংরেজ পরকালতত্ত্ববিদদের সমিতির সভাপতি ক্যামেলি ফ্ল্যামারিয়ন বলেছেন, অতি অবাস্তব রূপকথা বা কিংবদন্তীর ভেতরেও কিছু ঐতিহাসিক সত্যের আভাস থাকে—Even the most absurd legends has some origins—তেমনি প্রতিটি অবিশ্বাস্য ভৌতিক ঘটনার আড়ালে থাকে প্রকৃত সত্যের কিছু স্ফুলিঙ্গ!

চিড়িয়াখানার নাইটগার্ড করণবাহাদুর হাতে একটা লাঠি নিয়ে টহল দিচ্ছে। সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত। ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে জুগার্ডেনের বিশাল প্রাঙ্গণ। থেকে থেকে দূর থেকে ভেসে আসছে বাঘের গর্জন। নিশাচর পাখিগুলো মাঝে মাঝে তারস্বরে ডেকে উঠছে।

লোহার জাল দিয়ে ঘেরা বানরদের ঘর ছাড়িয়ে, হরিণদের

ডেরা বাঁয়ে রেখে ঝিলের দিকে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল করণবাহাদুর। তার নজরে পড়ল খিদিরপুরের গেটের দিক থেকে কতকগুলো ছায়ামূর্তি যেন কাঁধে ভারী একটা কি যেন নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে!

নিশি রাতের সেই একটানা সাঁ সাঁ বাতাসের অশ্রান্ত আর্তনাদ, বুড়ো শিরীষ আর কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনি সব কিছুকে ছাপিয়ে তার কানে এল পালকিবাহকদের ক্ষীণ দূরাগত সুর—হিপ্পোলো হুকুম্মা—হিপ্পালো হুকুম্মা—

ক্রমশ সেই তরল অন্ধকারের পটভূমিতে আরও নিকষ কালো ছায়ার মত একটা পালকির আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল!

আশ্চর্য, প্রতিটি বাহকের গায়ে সোনালী জরি বসানো লম্বা কুর্তা, মাথায় তুপলড়ী বা চ্যাগোশিয়া টুপি। পরনে লাল রঙের পাজামা যেমন বাহকদের পোশাকে রঙের বাহার। তেমনি সোনার চুমকি বসানো কারুকার্যখচিত বর্ণাঢ্য পালকি। আর তার দরজাটা হাট করে খোলা। আর তার ভেতরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে রয়েছেন মেদবহুল স্থূলকায় চেহারার এক খানদানী মুসলমান ভদ্রলোক। পালকি কোথাকার? হেঁকে উঠল করণবাহাদুর। তার চিৎকারটা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু পালকি থামল না। ঝিল পেরিয়ে গণ্ডারদের আস্তানা ছাড়িয়ে যেমন মল্লিক হাউসের দিকে চলছিল তেমনি নিঃশব্দে চলতেই লাগল। করণবাহাদুরও তার পিছু ছুটতে শুরু করল। কে জানে। বড়সাহেবেরই (সুপারিনটেণ্ডেণ্ট) কোন বন্ধু দেখা করতে এসেছেন—কিন্তু

এত রাত্রে ? এই থামাও পালকি—গর্জন করে উঠল করণবাহাদুর। থামল তো না-ই-ই বরং আরো জোরে পা চালিয়ে পালকিটা চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠাতা স্কেণ্ডেলের সমাধি-ফলকের সামনে গিয়ে যেই হঠাৎ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল, অমনি দারুণ ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল করণবাহাদুর। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কাটা গাছের মত মাটিতে পড়ে গেল সে। মুখের দুপাশ দিয়ে সাদা গ্যাঁজলা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ইংরেজ সুপারিনটেণ্ডেন্ট রাউণ্ডে বেরিয়েছিলেন, আর্তনাদ শুনে ছুটে এলেন। লণ্ঠন হাতে নিয়ে ছুটে এল অন্যান্য নাইট গার্ডরা। সাহেবের পা দুটো জড়িয়ে কেঁদে বলল করণবাহাদুর আমি নোকরি করবো না, হুজুর—

কি হইয়াছে টুমার বলিবে টো—

সব বৃত্তান্ত শুনে সাহেব বললেন কুছ ডর নেহি—টুম নবাব সাহেবকো স্পিরিট দেখা—

কিন্তু কোন নবাব সাহেবের বিদেহী আত্মা প্রেতলোক থেকে নৈশ পরিভ্রমণে এসেছিলেন চিড়িয়াখানায় ?

ইতিহাসের পাতা থেকে চার দশক আগের এই ভুতুড়ে ঘটনার সূত্র খুঁজতে যাওয়ার আগে বলা দরকার, কলকাতার সবচাইতে শান্ত নির্জন অঞ্চল এই আলিপুরেরই বেলভেডিয়ারের সাবেক লাটপ্রাসাদের সন্নিহিত এলাকার আর একটি অলৌকিক কাণ্ডের কথা।

একদিন গভীর রাত্রে লাটসাহেবের বাড়ির নর্থ গেটের চিড়িয়াখানার দিকে প্রহরারত সান্ত্রীর নজরে পড়ল, জমাট

অন্ধকারে আচ্ছন্ন চিড়িয়াখানার ওপরের আকাশটা লাল আলোর ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সে চিৎকার করে উঠল—আগুন—আগুন—

সঙ্গে সঙ্গে বেলভেডিয়ারের অন্যান্য গেটের প্রহরীরাও ছুটে গেল চিড়িয়াখানার দিকে। তারা দেখল, দূরে স্কেণ্ডেল সাহেবের সমাধির সামনে খানিকটা জায়গা জুড়ে গ্যাসের উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। আর সেই আলোর বৃত্তের ভেতরে ঘুরে ঘুরে নাচছে হাস্যোচ্ছল একদল সাহেব মেম! তাদের হাত, পা, শরীর যেন উগ্র সাদা আলো দিয়ে গড়া! জুগার্ডেনের নাইট-গার্ডদের ডেকে দেখিয়ে দিল সেই আলোকোজ্জ্বল নাচের দৃশ্যটা। কিন্তু তারা যেই দল বেঁধে সেই সমাধির সামনে এল অমনি মিলিয়ে গেল সেই আলোকিত নৃত্যস্থলী। কোথায় সেই অত্যুজ্জ্বল আলো আর বিদেশী মেয়ে-পুরুষের জ্যোতির্ময় মূর্তি! শুধু গাঢ় অন্ধকারে সাদা একটা কঙ্কালমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সমাধিফলকটা! চারিদিকে নিশুতি রাতের স্তব্ধতা থম-থম করছে। আর রাশি রাশি নক্ষত্রের ছায়া বুকে নিয়ে ঝিলের জল যেমন দোল খেয়ে চলেছিল ঠিক তেমনি দুলছে।

ইতিহাসে আছে – until 1936 it (zoograden) was the venue of annual fancy fair. চিড়িয়াখানার জন্ম হয়েছিল ১৮৭৬ সালে। প্রায় ষাট বছর ধরে আলিপুরের পশুশালার বিশাল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতো আনন্দমেলা। প্রতি বছর যেই এই শহরে জাঁকিয়ে নেমে আসতো শীত, তখুনি এখানে বর্ণাঢ্য পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে আসতো ইংরেজ মেয়েপুরুষ।

নাচে, গানে আর বেল্লো ফুর্তিতে জমে উঠতো আনন্দমেলা।

ভুবন বিখ্যাত পরকালতত্ত্ববিদ জানিয়েছেন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জগতের ভিতরে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবহমান, মৃত্যুতে তার কোন ছেদ পড়ে না। প্রেতলোক থেকে মৃতের আত্মা জড়দেহ ধারণ করে তার সাবেক দিনের প্রিয় জায়গায় আসতে পারে এবং আমাদের দৃষ্টিগোচরও হতে পারে—প্রেততত্ত্বের এই তথ্যটির ভেতরেই সেই সাদা আলোর আভায় উদ্ভাসিত নৃত্যস্থলীর বিচিত্র দৃশ্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

আর গভীর রাত্রে কারুশোভায় মনোহর ও বর্ণাঢ্য পালকির সওয়ারী হয়ে যে নবাবসাহেব পরিভ্রমণ করেন তাঁর আবির্ভাবের কিছুটা হদিস হয়তো পাওয়া যেতে পারে এই শহরের পশুশালার জন্মলগ্নের ইতিহাসে—

১৮৬৭ সালে এই শহরের জন্য প্রথম একটি জুগার্ডেনের পরিকল্পনা করেন এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী, ডক্টর ফেরের। তার ছয় বছর পরে, পশুপাখিপ্রিয় আর এক সাহেব কার্ল লুইন্স স্কেগুলার একটি পরিকল্পনা পেশ করলেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর রিচার্ড টেম্পলের কাছে। গভর্নর সাহেব মঞ্জুর করলেন প্ল্যান। আদিগঙ্গার ধারে পঁয়তাল্লিশ বিঘা জমিও দখল করা হলো। কিন্তু—

কি কি জন্তুজানোয়ার রাখা হবে, কোথায় হবে বাঘের ঘর, কেমন করে তৈরি হবে পাখিদের ঘর, অর্থাৎ লেআউট-টা কেমন হবে—এসব নিয়ে যখন মাথা ঘামাচ্ছেন সাহেবরা, তখন কানে

এস এই শহরের উত্তরে আর দক্ষিণে, দুই রিচ নেটিভের দুইটি চিড়িয়াখানা আছে—

দক্ষিণেরটা কাছাকাছি। অতএব কোম্পানী গভর্নমেণ্টের দুই হোমরা চোমড়া সাহেব স্কেণ্ডেল আর ফেরের এলেন গঙ্গার ধারে মেটিয়াবুরুজের শাহীজনপদে। তাঁদের মনে হল তাঁরা যেন কোন ইন্দ্রপুরীতে এসে পড়েছেন। যেদিকে তাকাও সুদৃশ্য এক একটা ইমারত। প্রত্যেক বাড়ির সামনে সবুজ বাগিচা। বাদশাহের মুন্সী জানালেন প্রতিটি মোকামের আছে এক একটা চমৎকার নাম শাহনশাহ মঞ্জিল, মুরসসা মঞ্জিল, কস্রউল ব্যথা নূরমঞ্জিল ইত্যাদি। কিন্তু—

পশুশালা কোথায়? নূরমঞ্জিলের সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল সাহেবদের। সেই বাড়ির সামনেই লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা বিশাল এক প্রাঙ্গণ। তার ভেতরে বিচরণ করছে শত শত হরিণ। মাঝখানে শ্বেত পাথরে বাঁধানো টলটলে জলে ভরা পুকুর। জলে ভাসছে সারস, বগলা, চকোর আরও নানা জাতের জলজ পাখি। কুকুরের এক ধারে খাঁচায় আছে বাঘ! তার পাশেই রকমারি চিতা বাঘ!

বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যায় সাহেবদের চোখের দৃষ্টি। অস্ফুটস্বরে স্কেণ্ডেল বলে এ তো ন্যাচরল হিস্ট্রি মিউজিয়াম—

বিদেশী মেহমান এসেছেন শুনে নবাব এসে নিজে নিয়ে গেলেন সর্পগৃহে। শাহনশাহ মঞ্জিলের সামনে দীর্ঘ ও গভীর বিশাল এক জলাশয়। তার ভেতর থেকে মাথা ফুঁড়ে উঠেছে একটি কৃত্রিম পাহাড়। সেখানে খেলা করছে হাজার হাজার সাপ!

কলকাতায় পশুশালা হবে শুনে খুশি হয়ে কোথায় কোন জানোয়ার থাকবে তার প্ল্যান করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই নবাব সাহেব।

১লা জানুয়ারী ১৮৭৬ সালে কলকাতার চিড়িয়াখানার উদ্বোধন করলেন সপ্তম এডওয়ার্ড, সে দিন সেই নবাব এবং উত্তর কলকাতার বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের রাজেন্দ্র মল্লিক (তাঁর বাড়ির পশুশালা আজও আছে) অনেক দুর্লভ পশুপাখি দান করেছিলেন !

যাঁর অসামান্য অবদানে গড়ে উঠেছিল আলিপুরের চিড়িয়াখানা, ইতিহাস যাঁকে আখ্যা দিয়েছে বেচারী অওধ অভাগা, যাঁর তাজ ও তখ্‌ত্‌ কেড়ে নিয়ে মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করা হয়েছিল তিনি-ই স্বনামধন্য নবাব ওয়াজেদ আলি !

ইংরেজদের লেখা ইতিহাসেই আছে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও প্রায়ই পালকি করে চিড়িয়াখানায় পরিক্রমা করতেন।

বদলে যাচ্ছে সাবেক কলকাতার অনেক কিছুর মতো আদলা কিন্তু এখনও গাছগাছালিতে ঘেরা এই শান্ত নির্জন অঞ্চল। আলিপুরের আরও অনেক জায়গাতেই আছে প্রেতচ্ছায়ার আনাগোনা।

কলকাতার বাবু

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

১৮ শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় ইংরেজ বণিকদের আবির্ভাবের পর শেঠ, বসাক, মল্লিক, সরকার, মিত্তিররা তাঁদের সঙ্গে ব্যবসা ও চাকুরিতে লিপ্ত হন। এঁরাই জোব চার্ণকের সূতানুটির প্রথম বাসিন্দা ও পরবর্তী যুগের বাঙালি বাবুদের আদি পুরুষ। ইংরেজরা তখনও সামান্য বণিক। তখনও তাঁদের ভাগ্যাকাশ একাদশে বৃহস্পতি হতে বাকি। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় পলাশীর যুদ্ধ নামক রঙ তামাসার পর সুবে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব যুবক সিরাজউদ্দৌলা, ক্লাইভ-মীরজাফর-উমির্চাদদের হাতে বলি হন। ভারতের অন্যান্য জায়গার মতন বাংলায়ও তখন বড়ই অরাজকতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন তখন "মীরজাফর গুলি খায় আর ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে আর ডেসপ্যাচ লেখে। বাঙালীরা কাঁদে আর উৎসন্ন যায়...... মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউদের পেটে—ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই।"

এ হেন অরাজকতার কালে ইংরেজরা আস্তে আস্তে বাংলার

মসনদ অধিকার করে নিলেন। ক্লাইভ, হেস্টিংস ও পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা কোম্পানির সাম্রাজ্যের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে লাগলেন। তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক দেওয়ান, মুন্সী, বেনিয়ান মুৎসুদ্দি, তহবিলদার ও তল্পিবাহক হয়ে কায়স্থ, নানা বর্ণের বাঙালীরা বড় মানুষ ও সমাজের শিরোমণি হয়ে দাঁড়ালেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন লক্ষীকান্ত বা নকুধর, কান্তবাবু, নবকৃষ্ণ, মুন্সী, গঙ্গাগোবিন্দ সিং ও দেবী সিং, যাঁরা পলাশীর যুদ্ধের দুচার বছর আগে পর্যন্ত নামগোত্রহীন ছিলেন। কলকাতার পত্তনের প্রায় একশ বছরের মধ্যে এই আজব শহর টাকা রোজগারের কারখানা হয়ে দাঁড়ায়। সেই কলকাতায় কোম্পানির আওতায় বনেদী রাজা-মহারাজারা ফৌত হয়ে গেলেন আর মুদি-মুন্সীরা রাজা-মহারাজা হয়ে দাঁড়াল। কান্তবাবুর বংশধররা হলেন কাশিম-বাজারের মহারাজা। নকুধরের দৌহিত্ররা হলেন পোস্তার রাজা, নব মুন্সী শোভাবাজারের মহারাজা ও পাঁচ হাজার মনসবদার হলেন, আর গঙ্গাগোবিন্দ হলেন পাইকপাড়ার রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁদেরই সময়ে কৃষ্ণপান্তি (যাঁর সম্বন্ধে রামপ্রসাদ লিখেছেন 'ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পণ্ডতি তারে দিলে জমিদারি), রামদুলাল সরকার, জানবাজারের মাড়েরা ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে লাগলেন। কান্তবাবু, নবমুন্সী ইত্যাদি লোকেরা অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্ম-ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া সঙ্গে সঙ্গে ছলেবলে কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি করা তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। অতএব

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে তাঁরা বিত্তহীন ও তথাকথিত কুলোদ্ভব হয়ে আর্থিক উন্নতির চরম শিখরে উঠে সমাজের গোষ্ঠিপতি হয়েছিলেন। রাজারাজড়াই হন বা বড়লোকই হন, ক্ষমতায় কায়েম থাকতে হলে সাধারণ লোকদের তাক লাগাবার জন্য নানারকম আধার ও আড়ম্বরের দরকার, এমন রোশনাই চাই যাতে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কলকাতার প্রথম বাবুদের এ ব্যাপারে কোনও ত্রুটি ছিল না। নবাবী বাড়ি। সৌখিন আসবাব, দাস-দাসী, সাত পত্নী ও উপপত্নী, চৌঘুড়ি, রূপোর তাঞ্জাম, রাস্তায় হাতি ঘোড়ার সওয়ার, রূপোর ময়ুরপঙ্খী, খানা-পিনা, বাগানবাড়ি কিছুরই কমতি ছিল না। নবমুন্সীর কথাই ধরা যাক। তাঁর বাড়িতে দুর্গোৎসবে স্বয়ং ক্লাইভ ও হেস্টিংসও উপস্থিত থেকেছেন। পাঁচ হাজারী মনসবদার হিসেবে তাঁর ছেলের বিয়েতে চার হাজার পলটন হাজির ছিল শোনা যায়। তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ন লক্ষ টাকা খরচ করে ভূ-ভারতের ব্রাহ্মণ ভোজন ও দানসাগরী দিয়ে বিদায়—প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছে। নিচু জাত হলেও নবকৃষ্ণ প্রমুখ সমাজের শিরোমণিদের দাপটে বৃত্তিভোগী। জন্মফলারে বামুনেরা আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়েছিলেন এবং বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে জাল, জুয়াচুরি, মিছে কথায় পরাঙ্মুখ না হলেও এঁরা অন্যদিকে সাত্ত্বিক হিন্দুমতে বিশ্বাসী ছিলেন। বারো মাসে তেরো পার্বণ, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, গঙ্গাস্নান, জপতপ সন্ধ্যাআহ্নিক এঁদের কোনও কিছুই বাদ যেত না। আর মৃত্যুর আগে 'গঙ্গা' না পেলেও এঁরা মরেও শান্তি পেতেন না।

চূড়ামণি দত্তর সঙ্গে নবকৃষ্ণর জীবিত অবস্থায় রেষারেষির কথা সকলেই জানেন। এর জের চূড়ামণি দত্তর অন্তর্জলী যাত্রা অবধি চলে। তাঁকে যখন গঙ্গাযাত্রা করানো হয় তখন তাঁর লোকেরা নবমুন্সীকে টিটকিরি দিতে দিতে এই গান গাইতে গাইতে যান :—

"যম জিনিতে যায় রে চূড়ো,
যম জিনিতে যায়।
জপতপ করলে কী হয়,
মরতে জানতে হয়॥"

হুতোমের ভাষায় সময় কারুর হাত ধরা নয়। নদীর স্রোতের মত, মানুষের পরমায়ুর মত, বেশ্যার যৌবনের মত সময় কারুর তোয়াক্কা করে না। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে পড়ল। কোম্পানির আমলের আদিবাবুর দল গত হতে লাগলেন। তাঁদের স্থান তাঁদের পুত্র-পৌত্ররা-প্রপৌত্ররা অধিকার করলেন। কোম্পানির প্রতিপত্তি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে বাবু সম্প্রদায় সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ব্যাঙের ছাতার মতন বড় বাবুরা গজিয়ে উঠতে লাগলেন। আদি বাবুদের বংশধরদের তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতন বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা ছিল না, এবং জীবন-ধারণের জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল না। নতুন বাবুদের একটা প্রধান কাজ সাহেবদের মনস্তুষ্টি। ফলে উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই কলকাতা কমলালয়ের বাবু কালচার শতদল পুষ্পের মতন ফুটে উঠতে লাগল। ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম, ভোলানাথ শর্ম্মা, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মাইকেল, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, বটতলার অজানা নক্সা ও ছড়া লেখকরা ছাপার অক্ষরে বাবু ও বিবিদের কীর্তিকলাপ চিরদিনের জন্যে জলজ্যান্ত করে রেখে গেছেন। মোসাহেবরূপী জানোয়ার-পরিবৃত বাবুদের জীবনযাত্রাপ্রণালী, গাজন, দোল, দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, রামলীলা, হাফ আখড়াই ফুল আখড়াই, কবিগান, তর্জা, বড় বড় পরবে, ছেলের বিয়েতে মায় ভাগনের কান ফোঁড়ায় সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়ে সাহেব বিবিদের আপ্যায়ন, বুলবুলির লড়াই, ঘুড়ির লড়াই, বেশ্যা ও রক্ষিতা নিয়ে এবং আবগারির সমস্ত ব্যবস্থাসহ পরবে বজরায় ও বাগান বাড়িতে, বেহদ্দ ফুর্তি ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা এঁদের লেখা থেকে এতবার উদ্ধৃত হয়েছে যে, এখানে তার পুনরাবৃত্তির দরকারও নেই আর জায়গাও নেই। তবে এঁরা যে মজা লোটার ব্যাপারে বয়সের তোয়াক্কা করতেন না, সে সম্বন্ধে হুতোমের একটা উক্তি উদ্ধৃত করছি। হুতোম বলেছেনঃ অনেক বুড়ো মিনসে হয়েও হীরে বসান টুপি কারচোপের কর্মকরা কাবা, গলায় মুক্তোর মালা, দুহাতে দশটা আংটি পরে 'খোকা' সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না, হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর—ভাগনের চুল পেকে গেছে।

এখানে বলা দরকার, বাবুদের নিয়ে যাঁরা মস্করা করেছেন আর সপাং সপাং করে তাদের পিঠে চাবুক কষেছেন, তাঁরাও সব বাবুই ছিলেন। ভবানীচরণ ডকেট কোম্পানির মুৎসুদ্দি ও পরে

মেজর জেনারেল উইলিয়াম ক্যারির মুৎসুদ্দি ইত্যাদি কাজ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। নিমতলার প্যারিচাঁদ মিত্র ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হয়ে কাজ করেন ও পরে ব্যবসায়ে বহু রোজগার করেন। হুতোম তাঁর কলকাতায় চড়কপার্বণে যে বাবুর বংশ-কুলুজির কথা বলেছেন তা তাঁর নিজের বেলায় হুবহু খাটে। সেই বাবুর মতনই তাঁর প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস রাম বোল্ড ও মিঃ মিডলটনের অধীনে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানী করে বনেদী করলাম। অন্যদের বংশ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। লেখা ছাড়া ও বাবুদের অন্য ভাবেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। যেমন কালীঘাটের পটে এবং পরে চিৎপুরের উডকাটে। কালীঘাটের পটে প্রধানত বাবুদের বিবি বিলাসের ব্যাপারটাই প্রাধান্য পেয়েছে। কোনও পটে দেখা যায় নধরকান্তি সুদর্শন বাবু তাঁর রক্ষিতার গলা জড়িয়ে আছেন, কোনও পটে বাবু গুরু নিতম্বিনী লাস্যময়ী পেয়ারের মেয়ে মানুষের পদসেবা করছেন, কোথাও দেখা যায় আধা-মানুষ আধা-ঘোড়ারূপী বাবু উদ্ভিন্ন যৌবনা যুবতীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। আবার অন্যত্র সেই বাবুকে দেখা যাচ্ছে ভেড়ারূপে, যাঁকে একজন যুবতী বকলস বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া পটে আরও দেখা যায় নববিবি মুকুর হস্তে প্রসাধনরতা। গোলাপ সুন্দরী তরলা সুন্দরী বীণাবাদিনী ইত্যাদি বিদ্যাধরীরা বাবুদের সন্ধ্যায় দুদণ্ড আয়েস দেওয়ার জন্য অপেক্ষমানা। কালীঘাটের অশিক্ষিত পটুয়াদের মতন অনেক কবিয়ালও বনেদী বাবুদের ছেড়ে কথা বলতেন না। যেমন ভোলা ময়রা তাঁর এক

বিখ্যাত গানে অনেক প্রবল প্রতাপশালী বাবুদেরও চাবুক কষিয়েছিলেন, যার থেকে বোধহয় মাথা ব্যক্তিরাও বাদ যাননি।

মোষের মতন মুনসী বাবু,
মোষের মতন কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙায়,
চেহারাখানা ভালো॥

সাহেবের অধীনে চাকরি ও সহবৎ লাভ করলেও বাবুদের অধিকাংশই ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি শিক্ষায় একেবারেই দড় ছিলেন না। বাবু শব্দের নানান অর্থের মধ্যে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশেনারিতে একটি মানে হল, এ বেঙ্গলী উইথ এ সুপারফিসিয়াল ইংলিশ এডুকেশন। বাবুদের ইংরেজি-জ্ঞান ও আচার-ব্যবহার নিয়ে অ্যাংলো ইনডিয়ান সাহিত্যে অগুনতি বই, আর ইণ্ডিয়ান চ্যারি ভ্যারি জাতীয় পত্রিকায় লেখায় ও ছবিতে যে মর্মান্তিক ঠাট্টা আছে, তা পড়লে আজও কান লাল হয়ে যায়। আসলে বাবুদের ইংরেজিপনা ছিল সবই বাইরের ব্যাপারে। তাঁদের প্রাসাদোপম অট্টালিকার করিন্থিয়ান বা ডরিক থামে, বাগানের ফুলের কেয়ারী ও বোর্নিনির ফোয়ারার প্লাসটার অফ প্যারিসে। কপিতে আর ডোনাটেলোর নগ্ন ক্রাউটিং ভিনাসের প্রতিমূর্তিতে, টুলোর নিলাম ঘর থেকে কেনা বৈঠকখানার বিলিতি ফার্নিচার, কার্পেট, ভিনিসিয়ান কাটগ্লাসের ঝাড়ে, অরমলু করা ঘড়ি, অপঠিত বাঁধানো বিজাতি বই ভরা লাইব্রেরিতে ও ওয়াটার ফোর্ডের কাটগ্লাসে ক্লারেট ও বুরগাণ্ডি পানে, ল্যাণ্ডো ও ব্রুহামে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক

হবে না যে, যে টুলো কোম্পানিতে রামতুলাল সরকার ডোবা জাহাজ ধরে রাতারাতি লক্ষপতি হয়েছিলেন তাঁর ছেলেরা ও অন্যান্য বাবুরা সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ভরাডুবির দিকে এগিয়ে গেছেন। সে যাই হোক এমন কি বাবুদের বাড়ির স্থাপত্যের বাইরেটা নিওক্লাসিকাল ধরনের হলেও ভেতরটা ছিল বাঙালি। বাইরে বাড়ির একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ ছিল বিরাট পুজোর দালান। অন্দর মহলে থাকত বিরাট উঠোন, যেখানে মেয়েরা বড়ি, আচার, আমসত্ব দেওয়া ছাড়া মেয়েলি পালা ব্রত ইত্যাদি পালন করতে পারতেন। ছাতে থাকত চিলেকোঠা, যেখানে শুয়ে মেয়েরা হয়ত তুপুরবেলায় ভিজে চুল শুকুতে পারতেন। মেয়েদের কথা ছেড়ে দিলেও পোশাকে আসাকে বাবুরা কখনই সাহেবী হননি। যদিও অনেকে ছেলেদের সাহেবী পোশাক পরাতেন। হুতোম বর্ণিত বুড়ো মিন্‌সের খোকা সাজার টুপি ও কাবা ইত্যাদি পারস্য পোশাক তাই বাবুদের প্রিয় ছিল। ১৯ শতকের বাবুদের অয়েল পেনটিংয়েও তাই দেখা যায়। মোগলপাঠানদের সঙ্গে ছ'শ বছর ঘর করার পোশাক-আসাক চলন-বলনের ওপর প্রভাব একদিনে যায় না।

কলকাতায় বাবু কালচারের রবরবা গত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে হ্রাস পেতে শুরু করে। বাবুদের কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম সুন্দরী পুরীগুলোর দেউটি একে একে নিভে যেতে লাগল, সাজানো বাগান ও সাধের ফোয়ারা শুকিয়ে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যে গুরুত্ব

ছিল তাও শেষ হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বাবুয়ানী তখনও একেবারে লোপ পায়নি। জমিদারী ও নাগরিক সম্পত্তির আয়ের ওপর নির্ভর করে ঘড়ার জল গড়িয়ে খেয়ে কিছু কিছু বাবু তাঁদের নবাবীপনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। আমাদের ছেলে বয়সে দেখেছি সিমলের এক বাবুর বাড়িতে পুরনো দিনের বাবু কালচারের শেষ রেশ।

দাস-দাসীতে ভরা বিরাট বাড়ি, পুজো পার্বণে ধুমধাম, বাড়িতে চিড়িয়াখানা, কর্তাদের দাপট, সপ্তাহান্তে কর্তাদের বাগানবিহার। এসব চলত বিশ-তিরিশটা বাড়ির আয় আর কোম্পানির কাগজের সুদ থেকে। আজ তাঁদের বংশধররা ভাড়া বাড়িতে থাকেন আর আপিসে কলম পিষে সংসার চালান। চিৎপুরের কিছু নামী বংশের জীবনধারণের পুরনো কেতা দেশভাগ অবধি বজায় ছিল। আজ তাঁদের অনেকেরই দৈন্যের দশা। তবে আমাদের কাছে বাবুদের শেষ প্রতীক ছিলেন একজন, যাঁকে গত মহাযুদ্ধের ঠিক আগে ঘড়ির কাঁটার মতন প্রতি সন্ধ্যায় 'হুড-খোলা রোলস' বা মিনার্ভায় চড়ে লেকের চারপাশ ঘুরতে দেখা যেত। মটর গাড়ি চলত আস্তে আস্তে আর সাদা গিলেকরা পাঞ্জাবী পরা পটের বাবুর মতন চেহারার ভদ্রলোক চুপ করে পেছনে বসে থাকতেন, পাশে পাতাকাটা-চুল স্ত্রীকে নিয়ে। তিনি এক মল্লিক বাড়ির শেষ প্রতিনিধি। শুনেছি তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আত্মঘাতী হন।

বাবুদের পতনের গূঢ় কারণগুলির হয়ত সমাজতত্ত্ব ও

অর্থনীতির পণ্ডিতরা সঠিক হদিশ দিতে পারেন। আমরা আমাদের সেই কর্তব্য সারব কবিওয়ালার এই গান দিয়ে ঃ—

দুর্গাপূজা ঘণ্টা নেড়ে,
খোকা হলে বাজে ঢাক।
কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে
খাঁচায় পুল্লেন নাকি কাক ॥
বিষয়-কৰ্ম্ম গোল্লায় গেল
লড়িয়ে কেবল বুলবুলি।
প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে
মরে গেল লোকগুলি ॥

কলকাতার বিদ্বজ্জনসভা

নিশীথরঞ্জন রায়

সাধারণখ্যাত নব জাগরণের উৎপত্তির মূলে বাংলাদেশ তথা কলকাতার অবদান অনস্বীকার্য। কলকাতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের বনিয়াদ—এ কথা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু কলকাতার পরিচয় প্রসঙ্গে আরও বেশী ঐতিহাসিক সত্য—এই শহরের আদি যুগে গড়ে উঠেছিল বহু বিদ্বজ্জনসভা। এদের মধ্যে প্রাচীনতম আজকের এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী ৩০ জন কলকাতাবাসী শ্বেতাঙ্গ মিলে তখনকার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার রবার্ট চেম্বার্স-এর সভাপতিত্বে মিলিত হয়েছিলেন সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরী কক্ষে। সভার উদ্যোক্তা ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের সার উইলিয়ম জোনস। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে গঠিত হলো এশিয়াটিক সোসাইটি (Asiatic Society) জোনস নির্বাচিত হলেন সভাপতি। পৃষ্ঠ-পোষক হলেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। এই বিদ্বজ্জনসভার প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার বিষয়ে যাঁরা সেদিন জোনস-এর সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন তাঁদের অন্যতম

বিচারপতি হাইড চার্লস উইলকিনস ফ্রানসিস গ্লাডউইন, সার জন শোর, জোনাথান ডানকান। পৃথিবীর এই দ্বিতীয় প্রাচীনতম সভার উদ্দেশ্য এশিয়া খণ্ডের মানুষ এবং প্রকৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ ইতিহাস। পুরাতত্ত্ব, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণা। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সোসাইটির সদস্যরা একটি স্বতন্ত্র সভাগৃহ স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করলেও অনেকদিন পর্যন্ত তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৬ সালের নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, এই বৎসর থেকে সোসাইটির সদস্যদের পক্ষে মাসিক চাঁদার হার নির্ধারিত হলো প্রতি সদস্যের জন্য দুই মোহর। সংগৃহীত চাঁদা মজুত হলো সোসাইটির স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে সোসাইটির আবেদনে সাড়া পাওয়া গেল। ১৮০৫ সালে সোসাইটি সরকারী অনুমোদন ক্রমে লাভ করলো পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর সংযোগ স্থলে একখণ্ড ভূমি। এতদিন পর্যন্ত এখানে ছিল অশ্বারোহণ শিক্ষার কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে সেখানে গড়ে উঠলো সোসাইটির নিজস্ব নূতন ইমারত। এটির নকসা তৈরী করেছিলেন কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপটেন লক্। এই নকসাটির কিছু পরিমাণ রদ-বদল করে সোসাইটির নিজস্ব ভবন তৈরী করলেন কলকাতার বাসিন্দা ফরাসী স্থপতি জ্যঁ জ্যাক পিসোঁ। আদি ভবনটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছিল ত্রিশ হাজার টাকা। এর দ্বারোদঘাটন পর্ব অনুষ্ঠিত হলো ১৮০৮ সালে। ১৮২৯ সাল পর্যন্ত সোসাইটির সদস্যপদ শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্যই

উন্মুক্ত ছিল—পরে ভারতীয়রাও এর সদস্যভুক্ত হওয়ার অধিকার অর্জন করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মণীষীদের অক্লান্ত উদ্যোগে সোসাইটির সংগ্রহ ভাণ্ডার উল্লেখনীয় ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। সোসাইটির নামকরণের ইতিহাসও রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক। এটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল Asiatick Society নামে। ৪১ বৎসর পর এই নামটির সংস্কার সাধিত হয় Asiatick থেকে শেষ অক্ষর k বর্জন করে (১৮২৫)। চার বৎসর পর লণ্ডনে Royal Asiatick Society of Great Britain and Ireland প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লণ্ডন থেকে কলকাতার সোসাইটিকে এর অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যই এ প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হলেন। সোসাইটির প্রথম গবেষণামূলক গ্রন্থ Asiatic Researches ১৭৮৮ সাল থেকে শুরু করে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত বিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। সোসাইটি ভবনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা মেডিক্যাল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি (১৮২৩)। এর মুখ পত্র রূপে প্রকাশিত হতো একখানি জার্নাল। কিছুকাল পর এটি বন্ধ হয়ে গেলে সরকারী জরিপ বিভাগের ক্যাপ্টেন জেমস হারবার্টের উদ্যোগে প্রকাশিত হলো গ্লিনিংস ইন সায়েন্স। তিন বৎসর পর প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ জেমস প্রিন্সেপের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো গ্লিনিংস ইন সায়েন্স এর পরিবর্তে নতুন জার্নাল—জার্নাল অব-দি এশিয়াটিক সোসাইটি। লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত জার্নাল থেকে এর স্বকীয়তা চিহ্নিত করার জন্য প্রিন্সেপ নূতন জার্নালের নামকরণ

করলেন জার্নাল অব-দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল নামে। ১৮৪২ সাল থেকে সোসাইটি এই জার্নাল প্রকাশনার সর্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং সেই সময় থেকে এটি হয়ে দাঁড়ালো সোসাইটির একমাত্র মুখপত্র। ১৯৩৬ সালে সোসাইটি গ্রহণ করে নতুন নাম—দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল। স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসর পর ১৯৫০ সালে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ 'Royal' কথাটি বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালের জুলাই থেকে পাকাপাকি ভাবে—সোসাইটি পরিচিত হয়ে আসছে এশিয়াটিক সোসাইটি নামে।

আগামী ৭/৮ বছরের মধ্যে প্রাচ্যভূখণ্ডের এই প্রাচীনতম বিদ্বজ্জনসভা প্রতিষ্ঠার তুশো বছর পূর্তি হবে। এটি শুধু কলকাতাবাসীর গর্ব নয়, এশিয়া তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি-কেন্দ্ররূপে এই প্রতিষ্ঠানটি গৌরবধন্য হয়ে এসেছে। এর যথাযথ সংরক্ষণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব শুধু সদস্যদের নয়। বৃহত্তর জনসমাজ এবং সরকারের আনুকূল্যও এ জন্য অপরিহার্য। কলকাতার ইতিহাস দীর্ঘ দিনের নয়। শহরটি ভারতের অন্যান্য বহু শহরের তুলনায় নেহাৎ অর্বাচীন। তবু স্বল্প-পরিমিত কালবন্ধনীর মধ্যে উনিশ শতকে কলকাতার বুকে আবির্ভাব ঘটেছে বহু বিদ্বজ্জনসভার—গৌড়ীয় সমাজ সর্ব-তত্ত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, সর্বশুভকরী সভা, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ, বেথুন সোসাইটি, শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা, বিদ্যোৎসাহী সভা, মহম্মেডান লিটারারী সোসাইটি, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা, সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব

জেনারেল নলেজ ইত্যাদি। নির্দিষ্ট যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সব বিদ্বজ্জন সভা স্থাপিত হয়েছিল তাদের প্রয়োজন নিঃশেষিত হলেও কলকাতার আদি এবং প্রাচীনতম বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠান—এশিয়াটিক সোসাইটি আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, এটি নিঃসন্দেহে আমাদের গৌরবের বিষয়। বিশ্ববিদ্বজ্জনের কাছে আমাদের সে গৌরব আজও স্বীকৃতি লাভ করবে যদি আমরা প্রতিষ্ঠানটির যথাযথ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সম্পর্কে অবহিত হতে পারি।

দেখা না দেখার কলকাতা

পূর্ণেন্দু পত্রী

যে যুবতীর সঙ্গে তিন বছরের হাতে-হাত, গায়ে-গা, চোখে-চোখ মেশামিশি, অনেক সময় আরো এক বছর লেগে যায় শুধু এই খবরটুকু জানতে যে, চিবুকের নীচে শাঁখ-সাদা গ্রীবায় একটা ভোমরা-কালো তিল। যথাসময়ে ঐ তিলটির দিকে নজর না পড়ার কারণ এই নয় যে, চোখের দৃষ্টিতে আকাল। আসলে যাকে ভালোবাসি তার প্রতি মুহূর্তের সর্বাঙ্গময় আলোড়ন অর্থাৎ তার চোখের কবিতা, ঠোঁটের গান, মুখের সিনেমা, হাতের নাটক, হাসির জলসা, হাঁটার কত্থক, কথা বলার কথাকলি। এই সব স্পন্দনের দিকে নজরটা সিগারেটের মুখে আগুনের মতো এখন দপ্‌দপিয়ে এঁটে থাকে যে, অন্য অনেক দিকেই বাকি রয়ে যায় তাকানো। অবশ্য এই বাকি রয়ে যাওয়াটা মন্দ নয়। এতে বহু চেনাকেও বহুদিন পরে আবার আবিষ্কার করার সুখ-সাধটা উপভোগ করা যায় রয়ে বসে, যেন দামী মদে মৃদু চুমুক। কলকাতার সঙ্গে এই রকমই আমাদের ভালোবাসাবাসি।

এই কলকাতা শহরে কতদিন! আবাল্য না হলেও

আকৈশোর। কম দিনের মেলামেশা নয়। তবুও কি সব জানি তার? বরং জানি, অনেকখানিই অজানা। যা দেখেছি তার বেশীর ভাগটাই উপর-তলার ঢেউ। ভিতর মহলের প্রবাল হয়তো এক আধটা। মিছিলে হেঁটেছি অনেক। আন্দোলনে জড়িয়েছি বহুবার। বিপন্ন বিধ্বস্ত হয়েছি দুর্ভিক্ষে, দাঙ্গায়। অনুগমন করেছি শোকযাত্রায়। শোভাযাত্রা হাত ধরে টেনে এনেছে বাইরে। আজ থিয়েটার। কাল সিনেমা। পরশু ছবির প্রদর্শনী। এসবের উপরে রয়েছে বারো মাসে তেরো উৎসব। হুতোম সেই কোন্ কালে জানিয়েছিলেন কলকাতার উৎসব সহজে ফুরোয় না। সেটা এখনো সত্যি। অর্থাৎ যখনকার যা, তখনকার তা-র সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি নাচন-কুঁদনে মাততে গিয়ে এই জানা নগরীর অনেক অজানাকে জানবার সুযোগটা যেন ইচ্ছে করেই উড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছি হাওয়ায়। অথচ এও জানি, জীবনানন্দ যেমনভাবে বলেছিলেন—

> "তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই - তবু,
> গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই — তুমি
> আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।"

সেই রকম এক গভীর বিস্ময়ের কলকাতা ছড়িয়ে আছে এখনকার এই সর্বাঙ্গীণ ভাঙা ফাটলের আড়ালে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, শহর বুঝিবা এক ঘোমটা-পরা নারী। সব দেখিয়েও নিজেকে আড়াল করে রাখার ছলা-কলা তার মুখস্থ। অথচ কোন এক আকস্মিক মুহূর্তে সে সরিয়ে নেয় শতাব্দীর রোদ-জলে মাজা-ঘষা মুখশ্রীর উপর থেকে আঁচলের

আড়াল। অমনি খুলে যায় বিস্ময়ের দরজা। ফুলঝুরি হয়ে জ্বলে ওঠে তার লুকনো সৌন্দর্যের ছাপ। ঐ এক ঝলক আলোই তখন কলকাতা। মহানগরী। ঐ একটু খানিতেই ঢাকা পড়ে যায় তার ক্ষয়-ক্ষতি, ক্ষতচিহ্ন। ক্ষমার্হ হয়ে যায় তার ধুলো-বালি আর বিষাক্ত বাতাসের সাত খুন অপরাধ।

প্যারিসে প্রথম পা দিয়ে গা গুলিয়ে উঠেছিল রিলকের। ছিঃ, ছিঃ! এই নাকি প্যারিস? বিশ্ব শহরের সেরা সুন্দরী? য়ুরোপের মনোমোহিনী নায়িকা? এতো দেখছি আবর্জনার ডাঁই। দান্তের নরক, ভিখেরি-বেশ্যা-বাউণ্ডুলে আর হাসপাতাল দিয়ে বানানো। কিন্তু যেই চোখে পড়ল সেজানের ছবি, উল্লসিত রিলকে বলে উঠলেন, এই তো প্যারিস! আর র‍ঁদার ভাস্কর্যের মুখোমুখি হতেই হৃদয়ে শতজল ঝরনার ধ্বনি—এই তো স্বর্গ!

আর এইভাবেই আবিষ্কৃত হয় শহরের সত্তা। আমরা অনেক সময়েই যে কলকাতাকে দেখেও দেখতে পাই না তার কারণ একটা শহরের প্রাণ-ভোমরা যে কোণ সোনার কৌটোয় কোণ্ অতল অন্তরালের আড়ালে জানিনা সেটাই।

না-দেখা কলকাতাকে যেটুকু দেখেছি উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে সেটা ছবি করার টানে অথবা প্রয়োজনে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই কিছু। যেন ময়লা জামা-কাপড়ের মধ্যবিত্ত। দেউড়ি গেছে ভেঙে। ফোয়ারা শুকনো। বাগান ন্যাড়া। শ্বেতপাথরের বারান্দায় সময়ের চাবুকের কালশিটে। পালিশ না-পড়া, পলেস্তারা-খসা দেয়ালে বটের অথবা

অশ্বত্থের স্বাস্থ্যবান যৌবন। ভাঙা আস্তাবলের একপাশে কুরুক্ষেত্রের ভুমড়োনো রথের মতো উপুড় হয়ে আছে একসময়ের ছুটন্ত ফিটন। তেমন জরাজীর্ণের ভিড়ে মহলের একটা ঘরের মরচে-পড়া তালাটা খুলে গেল হঠাৎ। আর আলো জ্বলতেই, ইন্দ্রের রাজসভা। গৃহস্বামী অবশ্য তখুনি শুধরে দিয়ে বললেন, ঠাকুদ্দার আমলের জলসাঘর।

চোখের দৃষ্টি টইটম্বুর হয়ে উঠবে অবিশ্বাসে। স্বর্গের কি নেই এখানে? পারস্যের গালিচা, ইতালীয় ভাস্কর্য-তৈলচিত্র, বেলজিয়ামের কাচ, ফ্রান্সের ব্রোঞ্জ মূর্তি, জার্মানীর প্রিন্ট, চীনের কি জাপানের কিংবা গ্রীসের ভাস, সবই তো যে যার জায়গায় সূর্য চন্দ্র গ্রহ-তারার মতো। আরে, আরে, শ্বেতপাথরের টেবিলে সোনালী ডানা ছড়িয়ে বসে আছে, ওটা কি সবুজ রঙের প্রজাপতি?

আজ্ঞে না, ওটা একটা সেন্টের শিশি। ষাট সত্তর বছরের পুরনো হতে পারে। ভেতরটা শুকনো। কিন্তু নাকের কাছে আনলে এখনো গন্ধ পাবেন পারিজাতের। আবার ওদিকে বইয়ের আলমারিতে অ্যারিস্টটল, হোমার, গীবন, শেক্সপীয়র, কোনোটা কোনোটা সচিত্র। মরক্কো চামড়ায় সোনার জলে খোদাই করা নাম।

ছবি করার প্রয়োজনেই দেখাতে হতো বা হয়েছে পুরনো হলুদ হয়ে-যাওয়া অ্যালবাম। সেখানে আর এক কলকাতা। সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, মেয়েদের খোঁপা, ছেলেদের তেড়ি কিংবা গোঁফ-দাড়ি; ব্লাউজের হাতা, উৎসবের দিনে পুরুষদেরও

সাজের বাহার, চেয়ার-টেবিল, পর্দা, গাড়ি-ঘোড়ার কত বিচিত্র ধরন-গড়ন।

দেখতে দেখতেই অনেকবার মনে হয়েছে কলকাতার যে-কোনো সামান্য বিষয়কে বেছে নিয়েও সাতকাণ্ড লেখা যায় বুঝি বা। স্থাপত্য, পথঘাট, যান-বাহন, পাড়া-পল্লীর বিন্যাস, অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক চরিত্র এসব পাথর-ভার বিষয়কে এড়িয়েও অভাব ঘটবে না উপকরণের।

লেখা যেতে পারে কলকাতার সিঁড়ি নিয়ে। ঘড়ি নিয়ে, আলো নিয়ে, জল নিয়ে, এমনকি জানলা-দরজা নিয়েও। আর তাহলে বাড়ির বারান্দাটাই বা বাদ যায় কেন? কিংবা আকাশে ঘাড়-তোলা ছাদটা? মুরহাউস তো তাঁর বিখ্যাত 'ক্যালকাটা'-র এক জায়গায় জানিয়েই দিয়ে গেছেন সে-প্রস্তাব।

"দেয়ার ইজ এ স্মল থিসিস টু বি রিটেন বায় সামবডি অন ক্যালকাটাস রুফ-টপ মনুমেণ্ট এ্যালোন, নট ওনলি হর্সেস এ্যাণ্ড এ্যাফ্রোদিতিস, বাট লায়ন্স র‍্যাসপ্যাণ্ট, হক্স স্টুপিং, এ্যাণ্ড নেকেড ইয়ং লেডিজ রিক্লাইনিং রাদার ব্রেজেনলি এ্যাণ্ড ওয়েল।" মুরহাউস এ্যাফ্রোদিতেয় থেমেছেন। খুঁজলে উর্বশী ও আর্টেমিসকেও মিলে যাবে হয়তো। সিংহের কথাটা পেড়ে ভালই করলেন মুরহাউস। সিংহ নিয়েও হয়ে যেতে পারে দু-দশ ফর্মা। সিংহ তো শুধু কলকাতার ছাদে নেই কিংবা তোরণদ্বারের মাথায়। যেমন আছে রাজভবনের চারপাশে, রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ির গেটে। অবশ্য ওরা কেউই তেজস্বী নয়। কেশর গুটোনো। ভাত-খাওয়া বাঙালীর মতো। সিংহ

আছে গ্রীলের ডিজাইনে, লোহার রাজ-দরজায়, সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ অথবা পোর্টিকোর মুখে। অনেক জল নিকাশী নালার মুখে সিংহের মুখ। অনেক ফোয়ারার মুখেও। সিংহ আছে সাজানো বাগানে, বাগান-চেয়ারের লোহার হাতলে। প্রভূত আলস্যে শুকনো ফোয়ারার পাশে শুয়ে গড়িয়ে হাই তুলে অথবা সবুজ আগাছার জঙ্গলে হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে এমন সব সিংহ কলকাতায় অজস্র। দেখতে চাইলে শ্যামবাজারের মোড়ে, পাথুরেঘাটার মার্বেল প্যালেসে কিংবা গড়িয়াহাটার সিংহি-বাগানে একটা চিল-চক্কর।

গবেষণার বিষয় হিসেবে অবশ্য কেশর-গোটানো সিংহের চেয়ে ডানা-ছড়ানো পরীরা অনেক লোভনীয়। পৃথিবীর কোন আকাশে ডানা ছড়িয়ে কবে যে তারা কলকাতার স্থাপত্যের ঘাড়ে চেপে বসল, সে-ইতিহাস এখনো না-গবেষণার অন্ধকার গর্ভে। ওদের জন্ম তো সাগর পারে। জাতে কেল্টিক। রূপ-কথার উপকথার এই সব পরীরা কি তাহলে সাহেবদের সঙ্গে জাহাজে চড়ে এদেশে? অথচ তাও তো নয়। পরীরা রয়েছে দীনেশ সেনের সংগ্রহ করা পূর্ববঙ্গ গীতিকায়। তলায় ফুটনোট, চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে পরীদের, তাহলে?

পরীদের পুরাবৃত্ত থাক্। মরে-হেজে, ভেঙে-চুরে, হারিয়ে-ফুরিয়ে কলকাতার বুকে টিকে আছে যে-সব পরীরা এখনো তাদের দিকেই তাকাই। এটা সত্যিই যে কলকাতার ছাদে একদিন ছিল পরীদের পাকা আস্তানা। তাদেরই কেউ কেউ ফোয়ারার জলে স্নান করতে এসে হয়ে-যেতো জলপরী।

কোনো কোনো পরীরা দিনে-রাতে পাহারা দিত ফোয়ারা-করা বাগান। আবার গথিক থামের দুপাশে, বাড়ির সামনে, পিঠের ডানা খুলে এবং ঈষৎ নগ্ন হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ত দুপাশে। ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে তাদের রাজ্যপাট, রাজত্ব। বংশবৃক্ষে প্রচুর ফল-ফুল হওয়ার ফলেই দশদিকে তাদের বিস্তার শতরূপে।

পাথরের পরীরা ছাদে, ফোয়ারায়, তোরণে, বাগানে। পোর্সেলিনের পরীরা খেলনার আলমারীর থাকে থাকে। কাঠের পরীরা দেয়ালে। কাগজের পরীরা পাঁজীর পাতায়, বইয়ের বিজ্ঞাপনে, টাইটেল পেজে, উৎসর্গপত্রে, থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে, বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে, কিংবা রুমাল-কাগজে ছাপানো বিয়ের কবিতায়। পিতলের পরীরা কখনো আলো কখনো হুঁকোর বা পিলসুজের স্ট্যাণ্ডে। তুলির পরীরা কালীঘাটের পটে। কাঠখোদায়ের পরীরা বটতলার উড-প্রিণ্টে। অবশ্য সিমেণ্টের কিছু পরীও ছিল বাড়ির ছাদে। এখনও আছে। দুপাশে সার বেঁধে। মাথার মাঝখান থেকে আলোর স্ট্যাণ্ড, সাপের ফণার মতো। দেখতে চাইলে সোজা আরমেনিয়ান স্ট্রীটে, বাড়ির নাম 'ঝগড়া-কুঠি'। চারতলায় চাররকম স্থাপত্য নিয়ে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিকের মসজিদের সুবাদে ভুল করে ঝগড়া বেধেছিল হিন্দুতে মুসলমানে। সঙ্গে সঙ্গেই মিটে যায় সে বিরোধ। এখন মুখোমুখি দু-বাড়িতে গলায় গলায় ভাব। সেই চারতলা ঝগড়া কুঠির শিখরেই সিমেণ্টের পরীরা।

ছিল মাটির পরীও। দুর্গাপ্রতিমার পাশে। ছেলেবেলায়

দেখেছি। তাদের জন্ম আমাদের জন্মের আগে। হুতোমও দেখেছেন। "প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্ছে—হাতে বাদশাই নিশেন।"

এত পরী এল গেল ব্রোঞ্জের পরী কই? সেই নাকি? আছে। তারই পায়ের তলা দিয়ে মাতাল মিনি বাসের মতো ছুটে চলেছে এই শহর। ইংরেজরা অবশ্য তাকে পরী বলবে না। বলবে—ভিক্‌ট্রি, সাহেবী কেতায় যার মানে জয়ের অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী। ইংরেজ-রচিত এই জয়-পরীটির বয়স এখন একষট্টি বছর। ওজন তিন টন। উচ্চতায় ষোলো ফিট। দু ফিট ডায়ামিটার বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে। বেদীটা আবার একটা গ্লোবের উপরে। আগে বেদীটা ঘুরতো। সম্ভবত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দারুণ দামামা ধ্বনি শোনার পর থেকেই নিথর। শহরের মাটি থেকে দুশো ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা এই পরীর পিঠে দুটি ছড়ানো ডানা, বাঁ হাতে ফুঁ দিয়ে বাজানোর জন্যে একটা বাঁশি। ডান হাতে ফুলের গুচ্ছ। মাথাটা বাঁ দিকে হেলানো। এখনও মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছেন কাজল-কালো এই আকাশ-পরীকে? ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়্যালের শিখরে।

একটু আগে সিঁড়ির কথাটা পেড়েছিলুম। আজকালকার কলকাতায়, কিংবা আধুনিক স্থাপত্যে সিঁড়ির কদর সেকেলে খাট-পালঙ্কের মতোই তলিয়ে গেছে অপ্রয়োজনের অনাদরে। এখন 'দ'-এর মতো ঈষৎ মোচকানো সোজা-সাপটা সিঁড়ির যুগ। একটা বাড়ি, তো একটাই সিঁড়ি। বাহুল্য বাতিল। আর এখন

তো সিঁড়ির দুই সতীন। লিফ্‌ট আর এসকালেটর। স্থাপত্যের রাজবাড়িতে সিঁড়ির অবস্থাটা দুয়োরানীর মতোই তাই অনেকটা। উঠতে নামতে সকলের মুখেই বিরক্তি। লোড-শেডিং-কে ধন্যবাদ। কেননা তখনই শুধু কৃতজ্ঞ মনের স্বগতোক্তি, ভাগ্যিস সিঁড়িটা ছিল।

পুরনো কলকাতার তাবড়ো-তাবড়ো বাড়ির গায়ে সিঁড়িটা ছিল জড়োয়া গয়নার মতো জড়ানো। কাঠের সিঁড়িই বেশী। তার পরেই হয়তো শ্বেতপাথরের বাঁকে বাঁকে কালো পাথরের, সাদা পাথরের, ব্রোঞ্জের মূর্তি। দু' পাশে কিংবা একপাশে চওড়া গিল্টির ফ্রেমে পিতৃপুরুষদের দশাসই অয়েলপেন্টিং। না হলে ইতালীর ছবির এমন সব প্রিন্ট, যাতে নগ্ন নারীর আধিপত্যটাই বেশী। ল্যাণ্ডিং-এ গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক। মাথার উপরে ঝাড়। আগে জ্যোৎস্না ছড়াতো। এখন শবদেহের মতো সাদা কাপড়ে মোড়া। কখনো আবার পাশাপাশি দুটো সিঁড়ি। একটা ওঠার। আর একটা নামার। কোন কোন সিঁড়ি তিনতলা-চারতলায় উঠে গেছে মেয়েদের বুকের আঁচলের মতো পেঁচানো পাকে পাকে। কোনো কোনো সিঁড়ির এমন অজস্র কৌণিক বাঁক, তলায় দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে পিকাশোর কিউবিক ছবি বুঝি। এ তো গেল সদর মহলের সিঁড়ি। এ ছাড়া অন্দরমহলে আরো অগুনতি সিঁড়ি, ছোট বড়ো। চারকোণা বাড়ির কোণে ছড়ানো তারা। কখনো কখনো অন্দরমহল থেকে নীচে নামার সিঁড়ি আলাদা। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আলাদা। এসবের উপরে, অধিকন্তু ন দোষায়-র মতো, লোহার স্পাইরেল সিঁড়ি।

প্রধানত ঝি-চাকরদের ওঠা-নামার জন্যেই। কোনো কোনো বাড়িতে খোলা। কোনো কোনো বাড়িতে কাঠের পাটায় ঘেরাটোপে মোড়া। তার স্পাইরেল সিঁড়ির অবিস্মরণীয় ব্যবহার দেখতে চাইলে, সোজা দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ। গঙ্গার গায়ে প্রাসাদ। পূর্ণেন্দু ঠাকুরের। ঈদের চাঁদের মত দু-দিকে বেঁকে সদরমহলে চলে গেছে রাজহাঁসের মত ঝকঝকে শ্বেত-পাথরের সিঁড়ি। পিছন দিকে সবুজ রং-করা কাঠের ঘেরাটোপে ঢাকা পর পর চারটে চার-রকম দৈর্ঘের সিঁড়ি। এক একটা সিঁড়ি উঠে গিয়ে থেমেছে এক-একতলায়। আপনি বা আপনারা কার সঙ্গে দেখা করতে চান, জেনে নেওয়ার পর দারোয়ান বলে দেবে আপনি পা ফেলবেন কোন সিঁড়িতে। গৃহস্বামীর সঙ্গে সদর ঘরে দেখা করার জন্যে এক, অন্দরমহলের নিজের ঘরে দেখা করার আর এক সিঁড়ি। সম্পর্কের শ্রেণীভেদে সিঁড়িভেদ যেন। আবার অন্যদিকে আধুনিক লিফ্‌টের আদিম আকৃতি বুঝি বা।

অন্নদাশঙ্করের এক ছড়ায় কোনো এক সমরেশ সেন সম্বন্ধে ঠাট্টা—

“শ্রীমান সমরেশ সেন
লিখেছেন যা পড়েছেন।”

কলকাতাকে নিয়ে আমার লেখালেখি অনেকটা তাই। ছাপার অক্ষরের মারফতেই তার সঙ্গে দেখা-শোনাটা বেশী। নিজের চোখে বোঝা-পড়াটা কম। কলকাতায় এত চার্চ। ভিতরে ঢোকা হয়নি কখনো। এত মসজিদ। রয়ে গেল

অজানা। এত মন্দির। মাথা গলাইনি সেখানে। সরকারী যাদুঘর দেখেছি। কিন্তু কলকাতার যে-সব বাড়ি নিজেরাই হয়ে আছে এক একটা বে-সরকারী যাদুঘরের মতো, সেগুলোর অনেকটাই অ-দেখা। যেটুকু দেখা সেও তন্ন তন্ন করে নয়। সে ভাবে দেখতে পারলে অনেক আশ্চর্য হিসেব এসে যেত হাতে। জানতে পারা যেত, পৃথিবীর কোন্ দেশ থেকে সব চেয়ে বেশী শিল্প-সামগ্রী এদেশে। কোন দেশের পেনটিং বেশী, কোন্ দেশের ভাস্কর্য। মোট ক-ডজন ভেনাস আছে এই শহরে। কত রকমের ক্রাইস্ট অথবা কুমারী মেরী। মাইকেলেঞ্জেলো কোথায় কোথায়। র‍্যাফেল রুবেনসরা আসল-নকল এবং প্রিণ্ট মিলিয়ে কত।

পাথুরেঘাটার মারবেল প্যালেস এখন কিংবদন্তীর মতো। তার লম্বা ছায়ার জেল্লায় ঢাকা পড়ে গেছে চার পাশে ছড়ানো আর সব মল্লিক বাড়ির ঐশ্চর্য। অথচ তাদেরও আলো-আঁধারী কক্ষে কক্ষান্তরে চোখ জুড়োনোর অনেক মণি-মানিক। একতলা সমান উচ্চতার এক পাথরের সক্রেটিসের সঙ্গে মুখোমুখি ঐখানেরই এক মল্লিকবাড়িতে।

পুরনো কলকাতা নতুন হয়ে যাচ্ছে বড্ড তাড়াতাড়ি। বাইরের কাঠামো বজায় রেখে ভিতরে চলেছে আধুনিক হওয়ার তুমুল তোড়জোড়। নীলামের বাজারে চলে যাচ্ছে অনেক মহার্ঘ আসবাব পত্র, মূর্তি ছবি, অ্যানটিক্স। যা দেখার বুঝতে পারছি দেখে নিতে হবে তড়িঘড়ি। নইলে অবস্থাটা দাঁড়াবে হাক্সলির মতো।

তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন জেরুজালেমে। সঙ্গের গাইডটি তরুণ বয়সী খ্রীশ্চান উদ্বাস্তু। স্বাচ্ছন্দ্য থেকে জীবনটা হঠাৎ গড়িয়ে এসেছে দারিদ্র্যের তলায়। মুখে সেই কারণেই বিরক্তি, চোখে বিষণ্ণতা। আর সেই সঙ্গে বাক্যে এক আশ্চর্য মুদ্রাদোষ। হাক্সলি যা দেখতে চান, সবই দেখায়। কিন্তু বর্ণনা করার সময় কারণে অকারণে বারবার ফিরে আসে একটি ধুয়ো।

"ইউশুয়ালি ডেস্ট্রয়েড"

অথবা

"ইউশুয়ালি রিবিল্ট"।

হাক্সলি সাহেব এখন যেখানে, সেখান থেকে কলকাতায় বেড়াতে আসা অসম্ভব। যদি আসতেন, আর আমাদেরই কাউকে যদি হতে হতো তাঁর গাইড, সন্দেহ নেই ঐ এক ধুয়ো ফিরে আসতো আমাদেরও গলায়। আমহার্স্ট স্ট্রীটে রামমোহন রায়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হতো ইউশুয়ালি ডেস্ট্রয়েড।

আর সেনেট হলের ভগ্নস্তূপের উপরে গড়ে ওঠা কদর্য ফ্ল্যাটবাড়ির শ্রীহীনতার দিকে ঘাড় তুলে

—ইউশুয়ালি রিবিল্ট।

কলকাতা এলিয়টের লণ্ডন ব্রীজের মতো দ্রুত ভাঙছে। অতএব না-দেখা কলকাতাকে দেখে নিতে হবে দ্রুত। দেখে নিতে হবে সেই সব, যা জীবনানন্দ একদিন দেখেছিলেন বিলুপ্ত নগরীর মতো এক নারীর নগ্ন নির্জন হাতের মধ্যে। অপরূপ

খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা, অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি, রামধনু রঙের কাচের জানালা, ময়ূর-পেখমের রঙীন পর্দা, আর কক্ষ-কক্ষান্তরে ক্ষণিক আভাসে আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

সোনাগাজীর মসজিদ

কমলেন্দু সরকার

"সোনাগাজীর দরগায় কুনী বুনী বাসা করিয়াছিল—চারিদিক শেওলা ও বোনাজে পরিপূর্ণ—স্থানে ২ কাকেব ও সালিকের বাসা—বাড়ীতে আধার আনিয়া দিতেছে—পিলে চি ২ করিতেছে—কোনখানেই এক ফোঁটা চূণ পড়ে নাই—রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাইত ও সকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কিনা ভাহা সন্দেহ। মতিলালের শুভাগমনাবধি সোনাগাজির কপাল ফিরিয়া গেল। একেবারে "ঘোড়ার চিঁহি, তবলার চাটি, লুচি পুরির খচাখচ" উল্লাসের কড়াংধুম রাতদিন হইতে লাগিল আর মণ্ডামিঠাই, গোলাপ ফুলের আতর ও চরস, গাঁজা, মদের ছড়াছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনা ভার—অনেকেই বর্ণচোরা আঁব।" লেখাটা টেকচাঁদ ঠাকুরের। টেকচাঁদের কাল অনেকদিন বিগত। তা প্রায় বছর দেড়শ হবে। এরপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক টানাপোড়েনে রূপবদল ঘটেছে কলকাতার। তবুও কলকাতা কলকাতাই।

যেমনটি রয়ে গেছে চিৎপুর-চরিত্র। ভাল মন্দে বিখ্যাত

চিৎপুর রোড কলকাতার সবচেয়ে পুরনো রাস্তা। শুধু বাঙালি নয়, বিহারী, ওড়িয়া, ফিরিঙ্গি আর মুসলমানদের মধ্যেও ঢুকেছিল এই চিৎপুরী কালচার। চিৎপুরের ওপরেই যত সখের যাত্রা আর অপেরা পার্টির দল। আর ছিল খেমটা, বাঈজী, গণিকালয়। এরা এখনও রয়ে গেছে। এই চিৎপুরের-ই এলাকা সোনাগাজী। যার বিকৃত নাম সোনাগাছি। কলকাতার নিষিদ্ধপল্লী। যদিও রাস্তার নাম দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট। অনেকেই জানে না সে নাম। চিৎপুর দিয়ে এই রাস্তায় ঢোকার মুখেই বিখ্যাত সোনাগাজীর মসজিদ! যদিও সেখানে এখন আর কুনীবুনী পাখির বাসা নেই, নেই চারদিকে বনজঙ্গল আর শেয়ালের ডাক। এখন শুধু শোনা যায় টানা রিক্সার ট্রংটাং আওয়াজ আর বাবুদের ছন্দহীন পদশব্দ।

এই সোনাগাজীর মসজিদ কবে তৈরি হয়েছে কেউ সঠিক করে বলতে পারে না। অনেকেই জানে না এই সোনাগাজী কে বা কবেই এসেছিল সেই পুরনো কলকাতায়। তখন কি কলকাতা, কি সুতানুটি দুই পরগনাতেই ছিল বহু মুসলমানের বাস। ছিল সোনাগাজীর বাড়ি। এর আসল নাম গাজী সোনাউল্লা শাহ চুস্তি রহমততুল্লা আলে। তার কাজ ছিল দাঙ্গাহাঙ্গামা করা, লাঠালাঠি আর মারামারি। সংসারে বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেউই ছিল না। একদিন হঠাৎ মারা যায় সোনাউল্লা। পুত্রশোকে বিহ্বল বৃদ্ধা। হঠাৎ শুনতে পেল তার ছেলে সোনা বলছে, "মা তুই কাঁদিস না, আমি মরে গাজী হয়েছি ; আমি অনেক লোককে মেরেছি, অনেক লুঠ করেছি, তাতে কত ক্ষতি হয়েছে মানুষের। আমি এবার থেকে ওষুধ দিয়ে লোকের প্রাণ বাঁচাবো। আর যে

আমাকে সিন্নি দেবে, তার ভাল করব। এইভাবেই তোর দিন চলে যাবে।"

এই কথা শোনার পর হাজার হাজার মানুষ সোনাগাজীর বাড়িতে ভীড় করল। অন্ধ, খোঁড়া, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি দুরারোগ্য মানুষ, ধনী, গরিব, সমস্ত শ্রেণীর লোকের ভিড়ে চিৎপুরের রাস্তাঘাট জমজমাট হয়ে উঠল। টাকা-পয়সা আর ফল বাতাসা পড়তে লাগল প্রচুর। সকলেই তারা সোনাগাজীর দোহাই দেয়। লোকেরা তাদের ক্ষমতানুযায়ী সিন্নি দিয়ে নিজের কথা জানাত, বৃদ্ধা মা 'বাবা সোনা' বলে ডাকতো, অমনি ঘরের ভেতর থেকে 'কি মা' বলে সোনাগাজী উত্তর দিত। বৃদ্ধা মা তার কথা বলা মাত্র আবার উত্তর আসত, "পুকুরে কলাপাত মোড়া ওষুধ ভাসছে, প্রতিদিন সকালে উঠে একটু জল ধুয়ে খেতে বল তাতে কাজ হবে।"

এইভাবে কারো ওষুধ পুকুরে, কারো বা বাড়িতে পড়ত, আবার কারো ওষুধ অন্য কোনো নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আনতে হত। বিপদগ্রস্ত লোকেরা পেত আশ্বাস বা উপদেশ। আবার এমনও হয়েছে, কোনো কোনো লোকের ওপর গাজীসাহেব ভীষণ রেগে যেত, তার দাঁতের কড়মড়, তর্জনগর্জন, বাড়ির চালের মড়মড়ানি শুনে উপস্থিত লোকজন পালিযে যেত ভয়ে। আর গাজীসাহেব বলত, "ও আমার সঙ্গে মজা করতে এসেছে, ওর সিন্নি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দে। আমি ওর বংশ শেষ করে ছাড়ব।" এইভাবে ভয় দেখাত।

এই করে দিন যায়। এরপর কয়েক মাস বাদে

সোনাগাজীর বৃদ্ধা মা তৈরি করল মসজিদ। এই মসজিদ যেমন বড় তেমনি সুন্দর। যদিও সেই পুরনো মসজিদ এখন আর নেই। যাক্, সে প্রসঙ্গ পরে বলব। সোনাগাজীর মা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল এই মসজিদ নির্মাণে। এই মসজিদ বিখ্যাত হল সোনাগাজীর মসজিদ নামে পুরনো কলকাতায়। সোনাগাজীর মা মারা যাওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড। মসজিদ ভরে গেল গভীর জঙ্গলে! যেমনটি বর্ণনা দিয়েছিলেন টেকচাঁদ তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' বইটিতে। সোনাগাজী মসজিদ তৈরির এই কিংবদন্তী সেকালের কলকাতার মানুষ বিশ্বাস করলেও একালের অনেকেই বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না মসজিদের বর্তমান ইমাম আবদুল মুক্তালিভ বা যিনি বড়ে মিঞা নামেই বেশি পরিচিত। সোনাগাজী মসজিদের সঙ্গে এঁর যোগাযোগ বহুদিনের। বড়ে মিঞার কাছ থেকে শোনা যায় বিভিন্ন কাহিনী সোনাগাজীর সম্পর্কে। ইতিহাসটা বেশ ভালোই জানেন বড়ে মিঞা।

এই সোনাগাজী অর্থাৎ গাজী সোনাউল্লা শাহ চুস্তি রহমততুল্লা আলে একাই ভারতে আসে ইরান থেকে। সঙ্গে ছিল প্রচুর টাকা পয়সা আর সোনা। ছিল দরবেশ। সুদর্শন চেহারা ছিল তার। ভাষণ ভাল ঘোড়সওয়ার ছিল। সোনাউল্লা ছিল শাহ খানদানের লোক। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেছে নেয় পুরনো কলকাতার চিৎপুরকে। এসেছিল ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্যে। সোনাউল্লা যখন এখানে আসে তখন এই জায়গাটা ছিল বিরাট কবরস্থান। যার বিস্তৃতি ছিল বর্তমানে

চিৎপুর থেকে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু। ছিল মুসলমানদের বসতি। আর ছিল নারকোল বাগান। এখনকার অ্যালেন মার্কেট ছিল বিশাল পুকুর। এই পুকুরের সামনে সোনাগাজী তৈরি করে তার মসজিদ। এই মসজিদেই রয়েছে তার কবর। খুব সুন্দর ছিল এই মসজিদ। ওপরে ছিল চারটে মিনার আর মাঝে বিরাট গম্বুজ। ভেতরে প্রচুর সূক্ষ্ম কারুকার্য। ছিল ইরাণী স্থাপত্যের প্রভাব। তবে এখন মসজিদের সেই মিনার আর গম্বুজ নেই, নেই সেই সমস্ত কারুকাজ, আছে শুধু সুন্দর পাথরের তৈরি মেঝেটা। '৯৪৬-এর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় পড়ে যায় সোনাগাজীর মসজিদ। তারপর পুরো মসজিদটাই নতুন করে তৈরি হয়।

সোনাগাজীর মসজিদের নামেই হয়েছে মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট। রাস্তার নাম। অর্মির ১৭৫৬ সালের ম্যাপে দেখা যায় ঐ রাস্তার কিছু কিছু অংশ। দেখা যায় রাস্তার উত্তর দিকে ফাঁকা জমির ওপর এক বিরাট মসজিদ। মসজিদের সামনে বিশাল পুকুরটাকে পানীয় জলের জন্য ব্যবহার করে ১৮১৭ সালের নতুন লটারি কমিটি। এরপর পুকুরটা বুজিয়ে ফেলা হয়, তৈরি হয় ঘোড়ার আস্তাবল। এখন হয়েছে বাজার। যার নাম অ্যালেন মার্কেট। আর রয়ে গেছে সোনাউল্লা গাজীর মসজিদ। যার থেকে সোনাগাজী।

কলকাতায় শীতলনাথের মন্দির

চিত্রা দেব

কলকাতার মানুষের কাছে জৈনমন্দির মানেই পরেশনাথ। বেলগাছিয়ায় পরেশনাথের বাগান, মানিকতলায় পরেশ-নাথের মন্দির, রাসপূর্ণিমার শোভাযাত্রা হল পরেশনাথ মিছিল। অথচ এদের অনেকের সঙ্গেই পরেশনাথের কোন যোগ নেই। মানিকতলার কাছে বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীটে সবচেয়ে সুন্দর যে জৈন মন্দিরটি আছে, যার জন্যে বাসস্টপের নামই হয়ে গেছে পরেশনাথ গেট, স্থানীয় দোকান পাটের অধিকাংশের নামের সঙ্গে পরেশনাথের নাম যুক্ত, সেই মন্দিরের সঙ্গে কিন্তু পরেশ-নাথ বা জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের কোন যোগ নেই। মন্দির শীতলনাথের। শীতলনাথ দশম জৈন তীর্থঙ্কর। তবু মন্দিরের নাম পরেশনাথ কেন? প্রশ্ন করেছিলুম শ্রীগণেশ লালওয়ানীকে, কলকাতার জৈন সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁর যোগ সবচেয়ে বেশি। তিনি জানালেন, বাঙালীরা জৈন মন্দির দেখলেই বলে পরেশনাথের মন্দির। এটা হয়েছে সম্ভবত পরেশনাথ পাহাড়ের প্রভাবে। আসলে জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে পরেশনাথ নামে কেউ নেই, আছেন পার্শ্বনাথ, তাঁর এবং আরো উনিশজন

তীর্থঙ্করের নির্বাণভূমি সম্মেত শিখর বা পরেশনাথ পাহাড় জৈনদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এই পরেশনাথের নামেই বাংলা দেশের যাবতীয় জৈন মন্দিরের নাম হয়ে গেছে পরেশনাথের মন্দির। রাসপূর্ণিমার শোভাযাত্রার নাম পরেশনাথের মিছিল – সে মিছিলেও পার্শ্বনাথের মূর্তি থাকে না, থাকে ধর্মনাথের মূর্তি।

মন্দির যাঁরই হোক, জৈন ভক্তদের তা নিয়ে চিন্তা করবার দরকার হয় না কারণ, তাঁরা সকলেই চব্বিশ জন তীর্থঙ্করকে সমানভাবে মান্য করেন। জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় আচার নিয়ে, তীর্থঙ্করদের নিয়ে নয় তাই বদ্রীদাস টেম্পল রোডের শীতলনাথের মন্দির পরেশনাথের মন্দির নাম নিয়েই অনেকদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকদিন? তা হবে বৈকি। জৈনেরা তো কলকাতায় আজ আসেন নি, এসেছেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। জনশ্রুতি অনুসারে বলা যায়, প্রথমে কলকাতায় এসেছিলেন জৌহুরী সাথ। মনে হয় 'সাথ' কথাটির অর্থ সম্প্রদায়। অবশ্য এর আগে যে বাংলাদেশে জৈনরা ছিলেন না তা নয় বরং কেউ কেউ মনে করেন জৈন ধর্মই হচ্ছে বাংলাদেশের আদি ধর্ম। মহাবীর তো এসেছিলেনই সম্ভবত পার্শ্বনাথও এদেশে এসে-ছিলেন। সেই সময়কার জৈনদের বংশধরেরা আজও বাংলা-দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করেন। তাঁদের বলা হয় 'সরাক'। 'সরাক' শব্দটি এসেছে 'শ্রাবক' থেকে। হিন্দুদের সঙ্গে জৈনদের পার্থক্য খুব কম থাকায় তাঁদের খুঁজে

বার করা শক্ত, কারণ ধর্মীয় পার্থক্য ছাড়া সামাজিক রীতিনীতির দিক থেকে হিন্দুদের সঙ্গে জৈনদের কোন অমিল নেই। তবে কলকাতাবাসী জৈনদের সঙ্গে 'সরাক'দের কোন যোগ নেই বললেই চলে।

কলকাতার জৈনরা এসেছিলেন উত্তর ও পশ্চিম ভারত থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্যে। এঁরাই হলেন জৌহুরীসাথ জৈন মাড়ওয়াড়ী সাথ। লক্ষ্ণৌ, ফৈজাবাদ, বারাণসী, জয়পুর, আগ্রা, দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে থেকে আবার যাঁরা নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি অঞ্চলে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছিলেন তাঁরা নতুন করে কলকাতায় এলে তাঁদের নাম হল শহরওয়ালী সাথ। তা সেদিনের কলকাতার তুলনায় মুর্শিদাবাদ শহর বৈকি। কলকাতার জৈনসমাজ আসলে এই তিন সাথের সমান। এখন এদের সংখ্যা কুড়ি হাজারের ওপর।

তা বলে শীতলনাথের মন্দির কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির নয়। কলকাতায় প্রথম জৈন মন্দির হল কটন স্ট্রীটের জৈন শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দির। সেখানে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে। মানিকতলার কাছে বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীটের 'টেম্পল' অর্থাৎ মন্দির তৈরি হয় ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে বেলগাছিয়ার 'পার্শ্বনাথ উপবন' বা পরেশনাথের বাগানের (১৮৯৭) অনেক আগে। মন্দির তৈরি করান রায় বদ্রীদাস বাহাদুর। পাঁচ বিঘা জমির ওপর বাগান, ফোয়ারা, পুকুর, টিলা সমেত এমন চোখজুড়ানো মন্দির বোধ হয় সারা ভারতেও বেশি নেই। সমস্ত

বাগানটাই উজ্জ্বল লাল-নীল-সবুজ হরেক রঙের টালির কাজ করা। অজস্র গাছপালার সঙ্গে ওখানে ছড়িয়ে আছে পাথরের নয়নাভিরাম মূর্তি—প্রবেশপথে কেশর ফোলানো এক জোড়া সিংহ।

মন্দিরের প্রবেশ পথে মন্দিরের দিকে মুখ করে বসে আছে বদ্রীদাসের—পাথরের মূর্তি। তিনিই মন্দির-নির্মাতা। আজ তাঁর নাম জড়িয়ে গেছে মন্দিরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে। তাঁর মূর্তিকে পেছনে ফেলে ইটালিয়ান মারবেল পাথরের তেরোটি সিঁড়ি পার হয়ে মূল মন্দিরের বারান্দায় পৌঁছলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় চীনে মাটির ওপর বেলজিয়াম কাঁচ বসানো জমকালো কারুকাজে। একেবারে মন্দিরের চূড়া থেকে পা রাখবার মেঝে পর্যন্ত কোথাও একটুও ফাঁক নেই। ফুল, পাতা, লতা, পাখি, ময়ুরের অজস্র নকশা, রঙে রঙে রঙিন, দেখে শেষ করা যায় না। মধ্যে মধ্যে আয়না লাগানো থাম, মাথার ওপর বিশাল আকারের ঝাড়লণ্ঠন, খিলানে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো হাতে আঁকা জৈন পুরাণের ছবি। রূপো বাঁধানো দামী পাথর বসানো রত্নবেদীতে শীতলনাথের মর্মর মূর্তি। সব মিলে বিশাল নয়, কিন্তু অনবদ্য।

রায় বদ্রীদাসের কত বছর লেগেছিল এই মন্দির তৈরি করতে? কত খরচ হয়েছিল? সঠিক উত্তর কারুরই জানা নেই। লক্ষ্ণৌ থেকে শ্রীধর শ্রীমাল বংশের এক সাধারণ পরিবার থেকে বদ্রীদাস কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে, মাত্র কুড়ি বাইশ বছর বয়সে। জনশ্রুতি শোনা যায়, শ্রীপুণ্যজীর

আশীর্বাদে তিনি একটি বহুমূল্য রত্ন পান ও সেটি বিক্রি করে জহুরীর কাজ শুরু করার পর লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। লাভের শতকরা দশভাগ অর্থ তিনি সৎকাজে ব্যয় করতেন। কলকাতার পিঁজরাপোল ও মৌহুরীবাজারে ধর্মকাঁটা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও নানারকম কাজ করেছিলেন। শীতলনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে। মন্দিবের কারুকাজ দেখে মনে হয় খুব কম করেও দশ বছর লেগেছে। তবে ১৮৬৭-তেই যে মন্দির বর্তমান রূপ পেয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বদ্রীদাসের নাতি বিনয়কুমার সিং বললেন, তিন তিনবার এই মন্দিরের মডেল তৈরি হয় প্রথম দুটিকে খারিজ করে তৃতীয়টিকেই বদ্রীদাস বাস্তবে রূপায়িত করেন। অবশ্য এখানে মন্দির তৈরির পরিকল্পনাটাই কিছুটা আকস্মিক।

বদ্রীদাস মানিকতলার কাছে আচার্যদের 'দাদাবাড়ি'তে প্রায়ই আসতেন। পাশের অংশটা ছিল জলা জায়গা। অনেক খানি অংশ জুড়ে ছিল একটা পুকুর। একদিন বদ্রীদাস দেখলেন পুকুরের মাছ ধরা হচ্ছে। দেখে তাঁর খুব কষ্ট হল। অসহায় জীবহত্যা রোধ করার জন্যে তিনি পুকুর সমেত সমস্ত জমিটাই কিনে ফেললেন। প্রথমে বোধহয় তিনি এখানে বাগানবাড়ি জাতীয় প্রাসাদ উদ্যান বানাবার কথাই ভেবেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভক্তিমতী জননী খুসলকুমারী তাঁকে এখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। মায়ের কথামতোই বদ্রীদাস মন্দিরটি তৈরি করেন। এখনও এই মন্দিরের কাঁচ ও মীনার কাজ দেখতে বিদেশী পর্যটকরাও আসেন। জয়পুরের শীষমহলের মতো শীতলনাথ

মন্দিরের কাঁচগুলিও আলোয় ঝলমল করে, মুগ্ধ চোখে স্বপ্নের আবেশ আনে। কিন্তু যা অনেকেরই চোখে জড়িয়ে যায় তা হল মন্দিরের খিলানে আকা জৈন পুরাণের বেশ কয়েকটা ছবি।

শীতলনাথ মন্দিরের খিলানের ছবিগুলো এঁকেছিলেন গণেশ মুসব্বর। সুদূর জয়পুর থেকে তিনি এসেছিলেন ছবি আকতে কলকাতার জৈন সমাজের আমন্ত্রণে। তিনি আগ্রা, দিল্লী, জিয়াগঞ্জ ও আজমগঞ্জের মন্দিরের জন্যেও কিছু কিছু ছবি আকেন। কলকাতায় জৈন শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দির ও শীতলনাথের মন্দিরের ছবিগুলিও তাঁরই আঁকা। মনে হয় একই সময়ে এই ছবিগুলি আকা হয়েছে। জৈন শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দিরে আছে এগারোটি জৈন তীর্থ সম্পর্কিত ছবি। বদ্রীদাস যদিও ঐ মন্দিরের ট্রাস্টী ছিলেন তবে ছবিগুলো তিনি আঁকাননি। আকিয়েছিলেন শিখরদাস, বদ্রীনাথের সমসাময়িক অপর একজন বণিক। এই ছবিগুলো আঁকা হয় ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে। শীতল নাথের মন্দিরে গণেশ মুসব্বর আঁকেন তেতাল্লিশখানি ছবি এবং এসব ছবিতে শ্রাবক-শ্রাবিকাদের জীবন ও জৈন পুরাণের গল্পই প্রাধান্য পেয়েছে। কোন ছবিতেই তারিখ নেই তবে মনে হয়, শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দিরের ছবিগুলিও প্রায় একই সময়ে আঁকা হয়েছে। জয়পুরী চিত্রশৈলীর ছাপ থাকলেও গণেশ মুসব্বর রঙ ও রেখায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আজ, একশ বছর পরেও সে রঙ একটুও ম্লান হয়নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবিটি হচ্ছে 'কার্তিক মহোৎসব' বা পরেশনাথ মিছিলের। মন্দিরে ঢুকেই ছবিটি চোখে পড়ে। কলকাতা শহরে একশ বছর আগে

কোন 'শোভাযাত্রা' বা মিছিল বেরোত তার পরিচয়ও এতে মেলে।

'শোভাযাত্রা' বা পরেশনাথ মিছিল নামে পরিচিত হলেও জৈনরা একে বলেন 'রথযাত্রা'। এই দিন থেকে জৈন সাধুদের বিহার যাত্রা শুরু হয়। তাহলে কি 'রথযাত্রা' আসলে জৈনদের উৎসব, জৈন সাধুদের সব সময় ভ্রমণ করতে হয়, শুধু বর্ষার চারমাস তাঁরা কোথাও যান না। যাওয়া আসার অসুবিধের চেয়েও বড় কথা হল এসময় তৃণগুল্ম পোকামাকড় সবারই বড় হবার সময়, ছোট অবস্থায় পাছে পায়ের চাপে মারা যায় তাই সাধুরা এক জায়গায় অবস্থান করেন, কার্তিক-পূর্ণিমায় আবার তাঁদের পথ চলা শুরু হয়। এসময় জৈনরা যে যত পারেন উপোস করেন, যিনি যত উপোস করতে পারবেন তিনি তত সম্মানের পাত্র ও তাঁর নামে ধর্মরথ বার করা হয়। 'রথযাত্রা' উৎসব উড়িষ্যা ছাড়া আর কোথাও প্রচলিত নেই, বাংলাদেশে রথ এনেছিলেন বৈষ্ণব ভক্তেরা। এ ব্যাপারে কিছু বলা খুব শক্ত তবে কলিঙ্গ বহুকাল আগে জৈন অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। বর্তমান উদয়গিরি খণ্ডগিরিই তার প্রমাণ। এ ছাড়াও ছিলেন কলিঙ্গজীন। তাঁর মূর্তি-মন্দিরই বা কোথায় গেল, জগন্নাথের রথযাত্রায় সেই পুরনো শোভাযাত্রা লুকিয়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে। আসলে জৈনদের সঙ্গে হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠানের অনেক মিল আছে। একই দিনে একই অনুষ্ঠান দুজনে ভিন্ন অর্থে পালন করেন। যেমন ধরা যাক, দেওয়ালী কিংবা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কথা। দেওয়ালীর দিনটি জৈনরা পালন

করেন মহাবীরের নির্বাণ দিবস বলে। জ্ঞানের দীপ অস্তমিত হল তাই মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে অর্থাৎ দ্রব্যের আলোকে অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করা হয়। এদিন থেকে জৈনদের বীর সম্বতের শুরু হয় তাই অধিকাংশ জৈন ব্যবসায়ীর কাছে এই দিনটি হচ্ছে হালখাতার দিন। মহাবীর নির্বাণ লাভ করায় রাজা নন্দীবর্ধন ভাইয়ের শোকে কাতর হয়ে পড়লে কার্তিক শুক্লা দ্বিতীয়ায় তাঁর বোন সুদর্শনা ভ্রাতৃস্নেহবশত তাঁকে ডেকে খাওয়ান, সেই থেকে জৈনরা এই দিনটি পালন করেন এবং বোনেরা ভাইদের খাওয়ান। এর সঙ্গে আমাদের ভাইফোঁটারও দারুণ মিল আছে। তাই জৈন উৎসবের সঙ্গে হিন্দুদের বিশেষ করে বাঙালীদের উৎসব মিলে মিশে যাওয়া বিচিত্র নয়।

যাই হোক, গণেশ মুসব্বরের 'শোভাযাত্রা' চিত্র আরো একটি কারণে উল্লেখযোগ্য, কারণ এতে তিনি সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবিও এঁকেছিলেন। মাত্র বাষট্টি ইঞ্চি লম্বা ও সতেরো ইঞ্চি চওড়া ছবিতে ধরা পড়েছেন তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঃ মহতাবচন্দ, বলদেব দাস, ভৈরুঁদাস, ভগবান দাস, ধর্মদাস স্বামীর পালকীবাহী বদ্রীদাস, কল্লুমল ও শিখরদাস এবং বদ্রীদাসের গুরু জীন কল্যাণ সুরী। এছাড়াও ছবিতে বহু যতি ও শ্রাবক স্থান পেয়েছে।

মুসব্বরের আঁকা অন্যান্য ছবির মধ্যে সাতখানি ছবি জুড়ে 'শ্রীপাল চরিত্র' বা জৈনপুরাণের গল্প, 'ব্রাহ্মী ও সুন্দরী', 'শালীভদ্র ও ধন্য' প্রভৃতি ছবির নাম করা চলে। জৈন পুরাণকাহিনীর সঙ্গে আমাদের পুরাণকাহিনীর মিল ও অমিল দুই-ই আছে।

যেমন, প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের উল্লেখ আছে ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে। কিন্তু তাঁর কন্যা ব্রাহ্মী ও সুন্দরীব গল্প আমাদের পরিচিত নয়। ঋষভদেব ব্রাহ্মীকে লিপি এবং সুন্দরীকে কলা শিক্ষা দেন। এই ব্রাহ্মীর নামানুসারেই প্রাচীন ভারতীয় লিপিব নাম হল ব্রাহ্মী। 'শালীভদ্র ও ধন্যে'র গল্পও আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ে। শালীভদ্রের বত্রিশ জন স্ত্রী আর তাঁর বোন সুভদ্রার স্বামী ধন্য। সুভদ্রার মুখে শালীভদ্রের এক এক করে স্ত্রী পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংকল্পের কথা শুনে হেসে উঠলেন ধন্য। বললেন, প্রব্রজ্যা ওভাবে নেওয়া যায় না। ছাড়তে হলে সব একসাথে ছাড়তে হয়। বলে তিনি তৎক্ষণাৎ সব ত্যাগ করে মহাবীরের কাছে গিয়ে দীক্ষা নিলেন। এবকম আরো কত গল্প আছে গণেশ মুসব্বরের চিত্রে—গুনে শেষ করা যায় না, এক একটা ছবিতে দু তিনটে গল্প : 'কলাবতী কুন্তী ও দ্রৌপদী,' 'ভগবতী ও কোশল্যা সতী,' 'মৃগাবতী ও সুলসা,' 'প্রভাবতী ও রাজমতী সতী,' 'সুভদ্রা ও সতী সীতা,' 'চন্দনবালা,' 'লেস্যা ও মধুবিন্দু', 'ভরত-বাহুবলীর যুদ্ধ', 'চেতক কুনিকের যুদ্ধ' প্রভৃতি বহু পৌরাণিক গল্প ছবিগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে।

এসব ছবি আকতে শিল্পী গণেশ মুসব্বরের নিশ্চয় অনেক সময় লেগেছিল। তার আগেই শীতলনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বদ্রীদাসের গুরুদেব জীন কল্যাণ সুরী। মন্দির তৈরি হবার পর বদ্রীদাস গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মন্দিরে কার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। আগেই বলেছি, জৈনরা সব তীর্থঙ্করকেই

সমান ভাবে শ্রদ্ধা করেন, তাই বিশেষ একজনের প্রতি অনুরক্ত হবার মতো কোন কারণ বদ্রীদাসের ছিল না। জৈনরা বেদ বা ঈশ্বর মানেন না। তাঁরা কর্মফলে আস্থাবান। কর্মের ফলদাতা কর্মই। সাধনার ফলে কর্মক্ষয় হলে দুঃখময় সংসার থেকে মোক্ষলাভ হয়। এই মোক্ষ সকলেই লাভ করতে পারে। তবে যাঁরা নিজের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যের মুক্তিলাভের পথের দিশারা হতে পেরেছেন তাঁরা তার্থঙ্কর এবং সকলেরই পূজ্য। সুতরাং গুরুর নির্দেশে বদ্রীদাস এখানে শীতলনাথের মূর্তি স্থাপন করবেন বলে মনঃস্থির করলেন। কিন্তু কী দুর্দৈব। কোথাও তিনি মনের মতো শীতলনাথ খুঁজে পান না। কিংবদন্তী বলে শেষকালে আগ্রায় গিয়ে বদ্রীদাস এক সাধুর কাছে শীতলনাথের সন্ধান পেলেন। সেই সাধু তাঁকে রৌশন মহল্লার এক জৈন মন্দিরের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি এই মন্দিরের ভূমিগৃহে তোমার মনের মতো শীতলনাথ মূর্তি পাবে।' হলও তাই। বদ্রীদাস লোকজন এনে জমি মাটি খুঁড়ে কিছুদূর যেতেই একটা পাথরের সিঁড়ি পেলেন। ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে দেখলেন সেখানে রয়েছে শীতলনাথের নয়নাভিরাম মর্মর মূর্তি, দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়, প্রাণ শীতল হয়। সামনে জ্বলছে একটি ঘিয়ের প্রদীপ, কে যেন সদ্য পুজো করে গেছে। বদ্রীদাস কাল-বিলম্ব না করে মূর্তি নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। ওপরে উঠে তিনি আর সেই সাধুকে কোথাও দেখতে পাননি। শোনা গেল শীতলনাথ মূর্তিটি সতেরো শতকে আগ্রানিবাসী চন্দ্রপাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বদ্রীদাস তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। সেই

'অক্ষয়জ্যোতি' প্রদীপটিও বাদ গেল না, এখনও তার দীপশিখা অম্লান। সাড়ম্বরে জীনকল্যাণ সুরী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ১৯২৩ সম্বতে (১৮৬৭)।

বদ্রীদাসের মন্দিরে শীতলনাথের মূর্তি স্থাপনের আরো একটা তাৎপর্য আছে। অবশ্য এর পেছনে কোন সচেতন মন কাজ করেছিল কিনা তা জানা যায় না। জৈনদের অবশ্য যে কোন একজন তীর্থঙ্করের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় কোন বাধা নেই। কলকাতায় আদিনাথ, ধর্মনাথ, পার্শ্বনাথ, মহাবীর, শান্তিনাথ, কুন্থ্নাথ, সম্ভবনাথেরও মূর্তি আছে, কোন কোন মন্দির ভেঙে গেছে বলে মূর্তি নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে অন্য তীর্থঙ্করের মন্দিরে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই চব্বিশজন তীর্থঙ্করকে শ্রদ্ধা করেন। মাঝে মাঝে অবশ্য পার্শ্বনাথের মূর্তিতে বস্ত্রচিহ্ন থাকবে, কি থাকবে না তা নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়, মতবিরোধ হয় তবে শীতলনাথ সেসব বিরোধিতার উর্ধ্বে। তাঁর উপবিষ্ট মূর্তি নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব নেই। তিনি ছিলেন যাবতীয় জলচর প্রাণীর প্রভু বা রক্ষাকর্তা। বদ্রীদাসের মন্দিরের উদ্দেশ্যও তো তাই। মাছেদের জীবন রক্ষার সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে মন্দিরের সূচনা হল সে মন্দিরে শীতলনাথ ছাড়া আর কেই বা অধিষ্ঠিত হবেন, সেই মাছেরা আছে এখনও, বংশানুক্রমে। মন্দির-সংলগ্ন বাগানের পুকুরে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভক্তদের ছুঁড়ে দেওয়া আটার গুলি খাবার জন্যে ধীরে ধীরে ঝাঁক বেঁধে ভিড় করে। বড়দের সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের কাছেও শীতলনাথের মন্দির তাই মস্ত বড় আকর্ষণ।

আতস আদরান

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি নির্জন ঘরে সারা দিনরাত জ্বলছে অনির্বাণ শিখা। শিখা না বলে আগুন বলাই ভালো। ৯১ মেটকাফ স্ট্রীটের পার্শী অগ্নিমন্দিরের দোতলার একটি ঘরে এই আগুন রাখা আছে। পবিত্র এই আতস আদরান বা অগ্নিমন্দিরে পার্শী জরথুশত্রীয়রা ছাড়া অন্যদের প্রবেশ নিষেধ। তাঁরা অগ্নি উপাসক। তাঁরাই শুধু এখানে যেতে পারেন। ব্যর্থ প্রাণেব আবর্জনা পুড়িয়ে পৃথিবীকে শুদ্ধ ও উজ্জ্বল করে তোলে এই অগ্নি —এটাই তাঁদের বিশ্বাস।

কলকাতা কারও পরবাস নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে হাজার খানেক পার্শী পরিবারও তাই ঘর খুঁজে পেয়েছেন এখানে। ১৭৬৭ সালে সুরাট থেকে এই শহরে এসে বাসা বেঁধেছিলেন দাদাবর বেরামজী বানাজী। পেশা ছিল ব্যবসা। সুরাট উপকূলে তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্য চালাতেন জন কার্টিয়ার। বানাজী তাঁরই বন্ধু। কার্টিয়ার কলকাতায় বদলি হয়ে এলে বানাজীও এই শহরে চলে আসেন।

গড়ে তোলেন ব্যবসা বাণিজ্য। সেই প্রথম কলকাতা শহরে এলেন এক পার্শী পরিবার।

দক্ষিণ ইরানের পার্স বা ফার্স প্রদেশ থেকে এসেছেন বলেই এঁদের বলা হয় পার্শী। হাজার বছরেরও আগে প্রায় ৬৫০ খ্রীস্টাব্দে এঁরা ইরান থেকে ভারতে এসেছেন। ইরানে তাঁদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ছিল না। তার ওপর আরবদের আক্রমণ তাঁদের দেশত্যাগী হতে বাধ্য করে। পাল-তোলা খোলা নৌকোয় তাঁরা সমুদ্রপথে পাড়ি দিলেন ভারতের উদ্দেশে। বহু শিশু ও নারী প্রাণ হারাল পথে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা গুজরাটের সানজানা উপকূলে নৌকো ভেড়ালেন। গুজরাটের হিন্দু রাণা পরিবার বিশেষ করে যাদব রাজা বাস্তুচ্যুত পার্শীদের ঐতিহ্যময় মহান এই ভারতভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে পার্শীরা আচার ব্যবহারের দিক থেকে গুজরাটের জনজীবনের সঙ্গে মিশে যেতে লাগলেন। ভারতের মূল জনপ্রবাহের সঙ্গে মিশে গিয়ে একদিন তাঁরা হয়ে গেলেন ভারতীয়। ছড়িয়ে পড়লেন ভারতের নানা জায়গায়। শুধু সেই পবিত্র অগ্নিশিখার মতো স্বাতন্ত্র্যে জ্বলজ্বল করতে লাগল তাঁদের জরথুশত্রীয় ধর্মবিশ্বাস। বোম্বাই থেকে ১২০ মাইল দূরে এখনও আছে পার্শীদের সবচেয়ে পুরনো অগ্নিমন্দির বা আতস বেরাম। মন্দির তৈরি হওয়ার দিন থেকে এর আগুন আজও সমানভাবে প্রজ্জ্বলিত।

জরথুশত্রের বহু আগে থেকেই এই ইন্দো-ইরানীরা নানা প্রাকৃতিক শক্তি যেমন—সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, জল; বায়ুর উপাসনা

করতেন। তাঁদের এই ধর্মের নাম মজদা য়স্ন। পরে ক্ষমতাশালী পুরোহিত সমাজের হাত থেকে ধর্মের গ্লানি দূর করতে আবির্ভূত হলেন জরথুশত্র। তিনি ঘোষণা করেন অহুর মজদা। অর্থাৎ শক্তিময় ও জ্ঞানময় ঈশ্বর হলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। এবং প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত তাবৎ বস্তুশক্তি তাঁরই নিয়ম ও ধর্মের অধীন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জরথুত্রই সর্বপ্রথম জগৎগুরু, যিনি মানবজীবনের নৈতিক দায়িত্বের কথা প্রচার করে গিয়েছেন।

জরথুশত্রের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নিযুক্ত হয়েছিলেন 'আথ্রবান' বা অগ্নির পুরোহিত। জরথুশত্র আতর (সংস্কৃত অথর্, অর্থবান্ শব্দে অগ্নি) মন্দির স্থাপন করেছিলেন। এই অগ্নির প্রহরীদের 'আথ্রবান' বলা হয়।

কলকাতায় পার্শীদের অগ্নিমন্দির প্রথম স্থাপন করেন শেঠ রুস্তমজী কাউয়াসজি বানাজি। নিজের খরচে ২৬, এজরা স্ট্রীটে ১৮৩৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন। এখনও এখানের একটি রাস্তার নাম পার্শী চার্চ স্ট্রীট। দীর্ঘ ৭৩ বছর ধরে কলকাতার পার্শীদের এটাই ছিল একমাত্র অগ্নিমন্দির। বানাজি পরিবারের ট্রাসটিরা এটি চালাতেন। ক্রমে শহরে পার্শী জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় আরও অগ্নিমন্দির করার প্রয়োজন হল। শেঠ ধুনজিবয় বেরামজী মেহতা ১৮৯০-এ তিনি তাঁর ৬৫, ক্যানিং স্ট্রীটের বাড়িতে পারিবারিক প্রয়োজনে একটি দারেমেহের বা অগ্নিমন্দির তৈরি করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী খোরশেদবাঈ ও ছেলে রুস্তমজী মেহতা

৯১, মেটকাফ স্ট্রীটে ১৮১২ সালের ২৮শে অক্টোবর আর একটি আতস আদরান বা অগ্নিমন্দির গড়ে দেন। এই মন্দিরের লোহার ফটকে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আছে এরওয়াদ ধুনজিবয় বেরামজী মেহতার নাম। এটি পরিচালনা করেন পাঁচ ট্রাসটি। এঁদের তিনজন আবার আঞ্জুমান ট্রাসট ফাণ্ডের সদস্য।

অগ্নিমন্দিরটি দেখলে বোঝা যাবে না এটি এত পুরনো। নতুনের মতো ঝকঝক করছে সমস্ত বাড়িটি। ১৯৭২-এ মন্দিরটিকে আগাগোড়া সংস্কার করা হয়েছিল। প্রধান পুরোহিত হলেন এরওয়াদ বাপুজী এইচ দেশাই।

যে প্রাকৃতিক কার্যকারণে সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাতাস বয় আর সেই সূর্যালোক, বৃষ্টি ও বাতাস, মানুষ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর এই পৃথিবীকে সজীব রাখে ঈশ্বর তো এই প্রাকৃতিক সত্যই। এই সত্যই তো উপাসনার যোগ্য। আসলে প্রকৃতি যে মানুষের কতখানি এবং প্রকৃতিতে সামান্য বিপর্যয় হলে তা যে মানুষের জীবনেও চরম সর্বনাশ ডেকে আনে, এই সত্য পার্শীদের চেয়ে বোধহয় আর কেউ এত বেশি করে উপলব্ধি করেননি। এই উপলব্ধিকেই তাঁরা রূপ দিয়েছেন দৈনন্দিন জীবনের ধর্মচর্যায়। আজকের পরিবেশদূষণের যুগে, বিশেষ করে কলকাতার, যেখানে এক বর্গ ইনচি পরিমাণ জমিতেও শুদ্ধ বাতাস পাওয়া দুষ্কর, সেখানে অগ্নিমন্দির দেখে মনে হয় আমরা যা পারিনি এঁরা তা করেছেন। পৃথিবীর মৌলিক বিষয়গুলিই তাঁদের উপাসনার বস্তু।

মেটকাফ স্ট্রীটের অগ্নি মন্দিরের দোতলায় অগ্নিঘর।

সেখানেই জ্বলছে অনির্বাণ শিখা। উপাসকরা হাত মুখ ধুয়ে পবিত্র হয়ে সেখানে যান। চন্দন ও অন্যান্য কাঠের টুকরো অর্পণ করেন অগ্নিপাত্রে। এই নিয়মেই ধারাবাহিকভাবে প্রজ্বলিত হয়ে আছে অগ্নিশিখা। অগ্নিমন্দিরে প্রবেশের আগে তাঁরা সূর্যের দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ান, প্রাকৃতিক শক্তির উৎস, চিরভাস্বর বিশাল অগ্নি গোলকটিকে প্রণতি জানিয়েই যেন তাঁরা উপাসনা শুরু করেন। অগ্নিমন্দিরের নিচের তলায় আছে সূর্যের ছবি সম্বলিত দিকচিহ্ন। সূর্য যখন পশ্চিমে অস্ত যায়, উপাসকরা পশ্চিমে মুখ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাত্রে সূর্যের প্রতীক হিসেবে জ্বলে একটি প্রদীপ। তাকেই তখন শ্রদ্ধা জানিয়ে অগ্নিমন্দিরে প্রবেশ করতে হয়।

কেন নির্জন এই অগ্নির তপস্যা? ধর্মাচরণের স্বাধীনতার অভাব ও নানা অত্যাচারে তাঁরা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে পুজো করতেন অগ্নিদেবতার। পরবর্তী কালের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ও অনিশ্চয়তার এই কালো ছায়াকে দূর করতে পারেনি। জীবনের এই পরম ধনকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা থেকেই তাঁরা আজও একান্ত নির্জনে স্থাপন করেন অগ্নিগৃহ, সেখানে নিষিদ্ধ হয় সাধারণের প্রবেশ।

অগ্নিমন্দিরে তাঁদের নানা ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। আমাদের যেমন পৈতে, পার্শীদের তেমনি কুস্তি। ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি ৭২ গাছি পশমের সুতো দিয়ে হয় এই উপবীত। পবিত্র উপাসনা গ্রন্থ য়স্ন-এর ৭২টি অধ্যায়ের স্মারক ৭২ গাছি সুতো। সাত বছর বয়সে

ছেলে মেয়ে সবাই এই পবিত্র কুস্তি ধারণ করেন মন্দিরে। কোমরে ঘুনসির মতো তা জড়ানো থাকে। পার্শীদের বিয়ের অনুষ্ঠানও অনেক সময় এই মন্দিরে হয়ে থাকে।

হিন্দুদের মতো পার্শীদেরও আছে ধর্মের ষাঁড়। তবে তফাৎ আছে। ওঁদের ধর্মের ষাঁড়টি হবে সর্বাঙ্গে সাদা। শিং, ক্ষুর, এমনকি একটি লোমও কালো হলে চলবে না। এরকমই একটি বিরলদর্শন ষাঁড় দেখা গেল পার্শী অগ্নিমন্দিরে। সারা ভারত ঢুঁড়ে শেষে গোরক্ষপুরে মিলেছে এই ষাঁড়। এটি দেহরক্ষা করলে অনুরূপ লক্ষণযুক্ত আর একটি উপযুক্ত ষাঁড় খুঁজে আনতে হবে। এই ষাঁড়ের প্রস্রাব এক বিন্দু পান করে পবিত্র হওয়ারও রীতি আছে।

পার্শীদের সাদা পোশাক, সাদা টুপি, সাদা ষাঁড় সবই পবিত্রতার প্রতীক। এমনকি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে মুখও তাঁরা সাদা কাপড়ে ঢেকে নেন। গায়ে পরেন অ্যাপ্রনের মতো সাদা পোশাক। দেখে মনে হয়, অপারেশন থিয়েটারে এঁরা কিছু করতে যাচ্ছেন। এত পরিচ্ছন্ন সমস্ত পরিবেশ। তাঁদের অনুষ্ঠানের ছবি তোলার অনুমতিও সচরাচর পাওয়া যায় না।

বিনয়, ভদ্রতা, দয়া, সততা ও অধ্যবসায় পার্শী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য! যে কোন পার্শীই সারা জীবন কিছু না কিছু দান করেন। তাছাড়া প্রতিটি পার্শীর মৃতদেহ নৈঃশব্দ্যের স্তম্ভে রেখে আশা হয় শকুনের খাদ্য হিসেবে। মৃতদেহ কবর দিয়ে বা পুড়িয়ে এঁরা প্রকৃতিকেও কলুষিত করেন না।

সামাজিকভাবে পার্শীরা খুব মিশুক। ১৯০৮ সালেই

তাঁরা ক্যালকাটা পার্শী ক্লাব গঠন করেন। সেই ক্লাবে এখন গুজরাটী গরবা নাচেরও অনুষ্ঠান হয়। তাঁদের নবজন্মভূমি গুজরাটের প্রতি নসটালজিয়া এভাবেই হয়ত শহর কলকাতার বুকে বেঁচে আছে।

পার্শীদের বিখ্যাত পুরুষদের মধ্যে আছেন টাটা, গোদরেজের মতো শিল্পপতিরা। আছেন দাদাভাই নওরজী। ভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছেন বিশিষ্ট আরও অনেক পার্শী। শ্বেত শুভ্রবসন পরিহিত অগ্নি প্রহরীদেরই একজন এই কিছু দিন আগেও সদাসতর্ক প্রহরার ভার নিয়েছিলেন আসমুদ্রহিমাচল ভারতভূমির। ফিল্ড মারশাল মানেকশ একজন পার্শী। এক সময় তিনি ছিলেন জি ও সি ইন সি, ইসটারন কমানড। কলকাতা ছিল তাঁর সদর দপ্তর।

কুয়াশার আঁচল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বরানগর প্রাচীন জায়গা।

ইতিহাসে অল্পবিস্তর নামোল্লেখ দেখা যায়। নদী তীরবর্তী যে কোনও অঞ্চলই প্রাচীন অট্টালিকা, অবহেলিত উদ্যানে অতীত ইতিহাসের সন্ধান পেতে পারে। কোথাও রাজা মহারাজার ফেলে যাওয়া পদচিহ্ন কোথাও যোগী মহাপুরুষের লীলাক্ষেত্র, কোথাও সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষের দুঃখ সুখের কাহিনী।

গঙ্গাতীরবর্তী বরাহনগরের অদূরে দক্ষিণেশ্বর। রামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। শ্রীচৈতন্য বরাহনগরে ক্ষণ-অবস্থান করেছিলেন। রাজ্যলোভী বণিককুল প্রাচীন জলদস্যুরা নদীর প্রবাহপথে এই অঞ্চলে ঠেক খেয়ে গেছে।

বরাহনগরের ইতিহাস থাকলেও শিক্ষাসংস্কৃতির পীঠস্থান নয়। যেমন নবদ্বীপ, ভাটপাড়া শান্তিপুর ইত্যাদি অঞ্চল। কিছু ব্যবসায়ী, আর অসংখ্য উদ্যানবাটি নিয়ে বরাহনগর অতীত ইতিহাসের পাতায় ধনিককুলের সপ্তাহান্তিক প্রমোদ বিলাসের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। ইংরেজ গেছে সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছেন বাঙালী জমিদার বিত্তশালী বেনিয়ানের দল। ইংরেজরা নদীর

ধারে একটা ব্যবসাই ভাল বুঝতেন, চটকল। পূর্ব বাঙলার পাট, পশ্চিমবাঙলার চটকল, কলকাতার বন্দর, বিদেশের বাজারে দেশী শ্রমিক অর্থাগমেব আর একটি সহজ পথ। বরাহনগরের বিশাল চটকল ও জুটপ্রেস ঘিরে যে শ্রম অঞ্চল সংস্কৃতির ওপর তার একটা স্বাভাবিক প্রভাব পড়েছে।

যাই হোক না কেন বরাহনগরে সময় স্থির হয়ে আছে। একশো বছর আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে তবে আবও প্রাচীনতাব ছাপ পড়েছে, শ্যাওলা লেগেছে। জীর্ণ দেবালয় ভুতুড়ে বাগান বাড়ি মজা হুগলী নদী। সেই অঞ্চলেরই একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি।

ভূত কি না জানি না, তবে ব্যাপারটা অলৌকিক। অলৌকিক এই কারণে, আজও সেই ঘটনার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেননি। আমার একার অভিজ্ঞতা হলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যেত। এ অভিজ্ঞতা আমাদের দু'জনের জীবনের।

১৯৫০ সাল। সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমি আমার বন্ধু অশোক, দু'জনেই প্রায় অবিচ্ছেদ্য, হরিহরাত্মা গোছের একটা ব্যাপার। ওঠা, বসা, খাওয়া, বেড়ান, ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা, সব একসঙ্গে।

পড়াশোনার চাপ নেই। অখণ্ড অবসর। জীবনের পরবর্তী চড়াই ভাঙার আগে উপত্যকায় হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রামের দিন চলেছে। যে অঞ্চলের কথা বলছি, তার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছেন গঙ্গা। বেশির ভাগ ঘাটই সংস্কারের

অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। ওরই মধ্যে একটা ঘাট, যার নাম এক মন্দিরের ঘাট একটু ভাল ছিল।

ঘাটের ডানপাশে ছিল বিশাল এক বাগান। সেই বাগানের একটা অংশ জলের ওপর ঝুলে থাকত। সেখানে একটা জলটুঙি ছিল। বহুকাল আগে বাঙালীর যখন বেশ বোলবোলা ছিল, তখন সুন্দরীরা ওই টুঙিতে দাঁড়িয়ে, সকাল বিকেল গঙ্গার শোভা দেখতেন। যে সময়ের কথা সে সময় বাঙালীর সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত। বাগানের মাঝখানে বসান বিশাল বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। বিশাল বিশাল গাছপালা দিনের বেলাতেও বাগানটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। কোথাও জন-প্রাণী নেই।

বাঁপাশে আর একটা ছোট বাগান। সেখানে একটি মন্দির। ঘাটের নাম বোধহয় সেই কারণেই, এক মন্দিরের ঘাট। গঙ্গার ধার ঘেঁষে একটি অতিথিশালা। মার্বেল পাথর বাঁধান, গ্রিল দিয়ে ঘেরা একটি বারান্দা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে। কোনও কালে অতিথিরা হয়তো এসে উঠতেন। বসে বসে নির্জনে সাধন ভজন করতেন। ওই বাগানেরই গায়ে একটি আশ্রম, স্বামী সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমটিকে আমরা বলতাম নিরাশ্রয়। সেখানে এখন তৈরি হয়েছে, বিখ্যাত কাচের মন্দির।

গরমকাল। তখন গরমকালে এক ধরনের প্রাণ-জুড়নো বাতাস বইত। প্রকৃতি এখনকার মত নির্দয় ছিল না। এক মন্দিরের ঘাটের একেবার নিচের দিকে, বাঁপাশের উঁচু একটা পইঠেতে আমি আর অশোক পাশাপাশি বসে আছি। সূর্য সবে

পশ্চিমে ডুবেছেন। আকাশ একেবারে ঘোর রক্তবর্ণ। দিনের পাখি ঘরে ফিরছে, রাতের পাখি বেরবার আয়োজন করছে।

আমাদের পাশেই তু'তিন ধাপ ওপরে তু'চারজন বৃদ্ধ বসে বসে চুটিয়ে গল্প করছিলেন। তু'চারজন সমবয়সীও, একেবারে ওপাশে বসে খুব হল্লা করছে। দেখতে দেখতে দিনের চোখ প্রায় একেবারেই বুজে এলো। একেবাবে শেষ ধাপে বসে আছি বলে খেয়াল কবিনি, ঘাট কখন খালি হয়ে গেছে। বৃদ্ধরা উঠে চলে গেছেন। ছেলেরা নেই। চারপাশ নিস্তব্ধ। সামনে ভাঁটার গঙ্গা। পাঁতা বেরিয়ে আছে। কুঁচো কুঁচো ঢেউয়ে আলো খেলছে। দিনের শেষ আলো। বাগানেব বিশাল বিশাল গাছে রাত নেমে পড়েছে ছত্রীবাহিনীর মত। পরপার ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বাঁপাশে ঘাড় ফেরালে, অতিথি নিবাসের শ্বেতপাথরের পাতাল দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারে একেবারে শুভ্র শূন্যতাব মত।

হঠাৎ চ্যা চ্যা করে কয়েকটা প্যাঁচা ডেকে উঠল।

প্যাঁচার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। ঝিলঝিল করে আমাদের চোখের সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া অস্বচ্ছ একটা পর্দা নেমে এলো। জল, পরপার, আকাশ পশ্চিমের জ্বলজ্বলে তারা সব যেন স্বপ্নে মিলিয়ে গেল। পায়ের দিক থেকে শরীর ভারি হতে হতে পাথরের মত অনড় হয়ে গেল। আমরা তু'জনেই কিছু বলার চেষ্টা করলুম, মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। ওঠার চেষ্টা করলুম? শরীর নড়ল না। আর কিছুই মনে নেই।

চেতনা হারাবার আগে অস্পষ্ট শুনেছিলাম, কোথাও পেটা ঘড়িতে সন্ধে সাতটা বাজছে। ধীরে ধীরে সেই কুয়াশা যখন কেটে গেল, চারপাশ আবার যখন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল, তখন দেখলুম আমাদের কোমর পর্যন্ত জোয়ারের জলে ডুবে আছে। ঢেউয়েয় তালে তালে পুতুলের মত তুলে তুলে উঠছি। জল আর একটু উঠলেই আমরা ভেসে চলে যেতুম নিঃশব্দে। চারপাশে ঘোর অন্ধকার। জলের শব্দ বাতাসের শব্দ। ওপারে পেটা ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজছে।

তুজন নেশাগ্রস্তের মত কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালুম। সব ভিজে গেছে। সবচেয়ে বড় গাছে পাখির ছানা ডাকছে ওঁয়া, ওঁয়া। আমরা যেন গভীর একটা ঘুম দিয়ে উঠলুম। অশোক হঠাৎ কে, কে, বলে ক্ষাণ একটা শব্দ করল। সাদা কাপড়পরা এক নারী মূর্তি ধীরে ধীরে জলের দিকে নেমে যাচ্ছেন। চারপাশ অন্ধকার, সেই অন্ধকারে ওই সাদা মূর্তি, এক ধাপ, এক ধাপ করে নামতে নামতে জলে তলিয়ে গেলেন। আমরা তুজনে দাঁড়িয়ে রইলুম আচ্ছন্নের মত।

আমাদের তুজনের জীবনেই এই চারটে ঘণ্টার কোনও হিসেব নেই। কি হয়েছিল জানি না। তবে মৃত্যু হতে পারত। হয়ত ওই মূর্তিই আমাদের বাঁচিয়ে গেলেন।

কলকাতার মেয়েরা এখন তখন

আশাপূর্ণা দেবী

কলকাতার মেয়েরা কেমন ছিল সেকালে আর কেমন হয়েছে একালে, একথা ভাবতে গেলে, আগেই ভাবতে হয় কলকাতাটা কেমন ছিল সেকালে আর কেমন হয়েছে একালে। অর্থাৎ ছবির আগে যেমন পৃষ্ঠপট, গানের আগে সুরভাঁজা।

যদিও 'সেকাল' আর 'একাল' এই দুইয়ের মধ্যে সীমা-রেখাটা টানা যাবে কোথায় সেটা ভাববার বিষয়।

'কাল' তো চিরপ্রবহমান, এবং মুহূর্তে মুহূর্তে তার নতুন ঢেউ। আর যুগের পরিবর্তন ঘটছে সিঁড়ি ভাঙা নিয়মে, তবু আমরা শৈশব বাল্যের স্মৃতির মধ্যে থেকে একটি কালখণ্ডকে তুলে নিয়ে এসে বর্তমানের পাশে বসিয়ে সেকাল একালের তর্ক করি, তুলনা করি, আক্ষেপ করি, করুণা করি।

তা সেকালের কলকাতাকে একালের কলকাতা করুণা করতেই পারে। কী ছিল সেই 'পুওর কলকাতা'য়? বাস ছিল? রিকশা ছিল? সিনেমা ছিল? (ছিল 'বায়োস্কোপ' তাও তো বোবা!) রাস্তার মোড়ে মোড়ে 'পুলিশের হাত' ছিল? তেরোতলা বাড়ি ছিল? রবীন্দ্রকাব্য থেকে নাম চয়ন করা বহু

বিচিত্র বর্ণাঢ্য নারী, চিত্ত উচাটনকারী বিপণি ছিল অলিতে, গলিতে, সর্বত্র ? হায়, কিছুই ছিল না সে কলকাতায়। 'টেলি-ভিশান' তো দূরস্থান, 'আকাশবাণীই' ছিল আকাশকুসুম। নাঃ এই পর্যন্তই থাক, আর নয়, 'ছিল না'র সংখ্যা লিখতে বসলে মহাভারত-তুল্য হবে এবং 'একাল' সেই মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে ভাববে তবে ওরা বেঁচেছিল কি করে ?

কিন্তু ছিল বেঁচে। রীতিমতই বেঁচে ছিল। সেকালের কলকাতায় 'বাবু' ছিল অতএব 'বাবুয়ানা' ছিল। সে কলকাতা কেয়াখয়েরে পান খেতো, গোলাপী আতর ছিটানো রাবড়ি খেতো, জোড়া জোড়া গঙ্গার ইলিশ ভাজা খেতো, গলদাচিংড়ি দিয়ে পুঁই চচ্চড়ি খেতো, শ' দরে ল্যাংড়া আম খেতো। থাক, ফিরিস্তি না বাড়ানোই ভাল, তখন হয়তো আবার সমারোহময় একালের মর্মস্থল থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠবে।

সেকালে কলকাতা তেরো তলা বাড়ি না তুললেও তেরো বিঘে জমির ওপর তিন মহলা বাড়ি ফাঁদত, নেত্রকোনার ধুতির পাড় ছিঁড়ে পরত, ঘোড়ার খুরের ছন্দ তুলে ল্যাণ্ডো, ফিটন, ব্রুহাম জুড়ি-গাড়ি চড়ত, দুলকি চালে পাল্কিও চড়ত মাঝে মধ্যে, কর্তারা না হলেও গিন্নী মায়েরা।

অবিশ্যি ছ্যাকরাগাড়িও ছিল। প্রবল পরাক্রমেই ছিল। বাজার রাখতে ওই ছ্যাকরাই রাখত। বাসমতী দিয়ে তো বাজার রক্ষা হয় না, তার জন্যে চাই বালাম চাল।

রাজার জন্যে যেমন রানী তেমনি কানার জন্যে 'কানী'।

ওই ছ্যাকরা গাড়িই ছিল গেরস্ত-পোষা, মিহি আর মোটার মাঝখানের মাঝারিদের, ও ছাড়া আর গতি কী? আর কে পারবে এমনভাবে পর্দানসীনাদের পর্দা রক্ষা করে রাজরাস্তা পারাপার করতে?

হ্যাঁ, সেকালের কলকাতার মেয়েদেরও পর্দা ছিল। ওই বন্ধ গাড়ির পাখি তুলে আঁখি পাখি দিয়ে একটু বহির্জগতের স্বাদ পাওয়া মাত্র। তাও জানলার পাখিকে সবটা তুলে নয়। কিন্তু সেকালের কলকাতার মেয়েরা এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করত না, তারা ওই আব্রুটাকেই মর্যাদা ভাবত।

অতএব সে কলকাতার রাস্তা ছিল মরুভূমিতুল্য। রাস্তায় লাল নীল সবুজ কমলা হলদে কালো বেগুনি বিচিত্র রঙের সমারোহে পথচারীর চোখ ধাঁধিয়ে দিতো না।

পথচারিণী মহিলা বলতে ঘুঁটেওয়ালী, চুড়িওয়ালী, বাসন মাজা ঝি, আর ছানিপড়া গঙ্গামুখো বুড়িরা। শুনে হয়তো 'একাল' মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসবে রঙহীন রাস্তা? সে তো প্রাণহীন দেহের তুল্য। তার মানে মহানগরী নয় মহাশ্মশান।

কিন্তু ওটা ভুল ধারণা। তখনও লোকে কলকাতাকে বলত 'আজব শহর'। বিশাল ভারতবর্ষে (হ্যাঁ ভারতবর্ষটা তখন বিশালই ছিল। কেক্ কাটার মত কেটে কেটে টুকরো ভাগ করা হয় নি) এত সব নবীন প্রাচীন শহর থাকতে অর্বাচীন কলকাতাটাকেই যে কেন এ নামে ডাকা হয় তা জানি না, তবে কলকাতার ঐ এক নাম 'আজব শহর'। সেকালে একালে

উভয়কালে। সে কলকাতায় কড়ি ফেললে অর্ধেক রাতে বাঘের দুধ মিলত।

সেকালেও লোক বলত 'কল' আর 'কেতা' এই নিয়ে কলকেতা। অতএব একালের কলকাতা ওর দিকে যতই অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাক সেকালে 'কল'ও ছিল 'কেতা'ও ছিল। শুধু পুরুষদেরই নয়, মেয়েদের মধ্যেও দস্তুরমত ছিল।

কেতাদুরস্ত সেই মেয়েরা হাইহিল জুতো পরত, লেসপিন দিয়ে ঘোমটা অাঁটত, কাঁধে ব্রোচ লাগিয়ে পিছনে কুচি দিয়ে শাড়ি পরত, গালে রুজ আর মুখে পাউডার লাগাত। আর কথা কইত কেটে কেটে, থেমে থেমে, খেতো চামচ দিয়ে একটু একটু করে। এরা চেঞ্জে গেলে যেতো গিরিডিতে, কি ঝাঁঝায়, গান গাইলে গাইত ব্রহ্মসঙ্গীত। এবং টাকা থাকলেও গয়না পরত হালকা হালকা।

কিন্তু 'কেতা-দুরস্ত'র সংখ্যাটা নগণ্য, তাঁরা ভারে কাটতেন না, ধারে কাটতেন। ভারে যাঁরা কাটতেন অগণ্য সেই মহিলাকুল জুতোকে পায়ের ধারে কাছে আসতে দিতেন না, ঘোমটাকে যে কোন মুহূর্তে টেনে লম্বা করবার জন্যে আটক বাঁধনে যেতেন না, ফ্রী রাখতেন।

এঁরা আলতা পরা আর পায়ে ঝামা ঘসার জন্যে মাস-মাইনের নাপতিনি রাখতেন, মাথা ঘসার মশলা মিশোনো খাঁটি নারকেল তেলে চুল জবজবিয়ে পাতা কেটে চুল বাঁধতেন, ফিরিঙ্গী খোঁপায় সোনার সাপকাটা আর পালিশ পাতের তারাফুল গুঁজতেন, শীতকালে সরময়দা আর গরমকালে 'ল্যালেবাই' সাবান

ঘসে অঙ্গ মার্জনা করতেন, কাঁচপোকা আর সোনাপোকা ধরে ধুনোর আঠা দিয়ে কপালে টিপ পরতেন।

মাঝারীবয়সীরা ফরাসডাঙ্গার মিহি চওড়া কালাপাড় আর নবীনারা 'নীলাম্বরী' 'গঙ্গাযমুনা' 'চাঁদের আলো' 'কালাপাণি' অথবা 'বৌপাগলা' শাড়িকে ছুরি কোঁচা কুঁচিয়ে বাহার খেলিয়ে সোনার অঙ্গে জড়াতেন।

সেকালের কলকাতার মেয়েরা পয়সাকড়ি বেশি না থাকলেও তবক দেওয়া পানের খিলির মত নিজেদেরকে সোনায় মুড়তে ভালবাসতেন। অন্ততপক্ষে দশভরির বিছেহার, বারো চোদ্দ ভরির অমৃতি পাকের বালা, ভরি আষ্টেকের গালাভরা গোলাপ পাতের অনন্ত এবং ষোলো আঠারো ভরির গোখ্‌রি চুড়ি এক জোড়া না থাকলে বেঁচে থাকার কোন মানে খুঁজে পেতেন না তাঁরা। নেহাৎ গেরস্ত ঘরের মেয়েরাও।

তাই বটতলা থেকে এক পয়সায় দুখানা করে সব 'পুজোর ছড়া' বেরোত, তার ফেরীওয়ালাদের হাঁক শোনা যেতো মোড়ে মোড়ে, এবার পুজোয় বিপদ ভারী, বৌ চেয়েছেন টেক্কা চুরি। নিদের গলায় দানার মালা, পুজোয় আমার বিষম জ্বালা।'

সেকালের কলকাতার ঐসব কেতাবিহীন মেয়েরা রাঁধত, বাড়ত, কুটতো, কাটতো, ডাবর ডাবর পান সাজতো, ডালা ডালা বড়ি দিতো, কাঁথায় ফুল তুলতো, কার্পেটে 'যাও পাখী' আঁকত। ছেলে ঠ্যাঙাতো, কোঁদল করতো আবার তার মধ্যেই পাড়া বেড়াতো, তাসের আড্ডা বসিয়ে ছক্কা পাঞ্জা দিতো এবং সিনেমার স্বাদ না জানলেও থিয়েটারটি দেখতো বিলক্ষণ।

থিয়েটার শুরু হবার দু'চার ঘণ্টা আগেই ডিবেভর্তি পান আর কৌটাভর্তি দোক্তা এবং তৎসহ কাঁথায় মোড়া খোকাখুকুকে নিয়ে (সারারাতব্যাপী তো অভিনয়, বাড়িতে কে সামলাবে তাদের?) দোতলা কি তিনতলায় তারের জাল মোড়া খাঁচার মধ্যে গিয়ে বসতো এবং সামনের সীটের দখল নিয়ে ঝগড়ার মাঝখানে মাঝখানেই গহনার প্যাটার্ন, স্যাকরার নাম ঠিকানার লেনদেন করে ফেলত। আর খাঁচার জাল কাটবার চেষ্টাও চালাতো সমবেত ভাবে। 'মাইক' নামক বস্তুটা ছিল না, তবে কুশীলবদের অ-মাইক গলা সেই সুদূর মঞ্চ থেকে এই তিনতলায় উঠে এসে ছাদ ফাটাতো আর মাঝে মাঝেই বিরতিকালে কান ফাটানো ঐতিহাসিক সেই ঝিয়েদের ভাঙা কাঁসরের সমগোত্র কণ্ঠনিনাদ ওগো দর্জিপাড়ার অমুক বাবুর বাড়ির গো—ওগো বাদুড়বাগানের…ওগো চোরবাগানের…ওগো হোগল কুড়ের… অমুক বাবুর বাড়ির গো—

এগুলি হচ্ছে বিরতিকালে নীচের তলা থেকে কর্তাদের উপরতলে অবস্থিতা গিন্নীদের উদ্দেশে প্রেমোপহার প্রেরণের ঘোষণা।

বাড়িতে এ হেন প্রেম নিবেদন সম্ভবপর নয়, তাই বাড়ির বাইরের এই সুবর্ণ-সুযোগে- ঝিয়েদের মাধ্যমে এসে যেতো সোডা, লেমনেড, হিংয়ের কচুরী, আলুর দম, রসগোল্লা, অমৃতি, মিঠেপানের দোলা।

তবে খরচাটা বেশিই করতে হতো। কেবলমাত্র নিজের গিন্নীটিকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে আসার মতো অশ্লীল কাজ তো

সেকালের বাবুরা করতে পারতেন না? খাস কলকাত্তাই হলেও না। সঙ্গে ভাগ্নী, ভাইঝি, বোন, বৌদি, মাসী, মামী ইত্যাদি করে কোন না আধ ডজন নিয়ে আসতে হতো সভ্যতা রক্ষা করতে।

তথাপি সে কালের কলকাতার মেয়েরা গ্রাম গঞ্জের মেয়েদের অনুকম্পার চোখে দেখতো। আর নিজেদের শহুরে মেয়ে বলে বেশ মহিমাময়ী ভাবত। আর একাল?

একালের পৃষ্ঠপট?

একালের কলকাতার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

বিচিত্ররূপা এই কলকাতার মুখ বহুবর্ণে আলোকসম্পাতে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল। অতএব একালের কলকাতার কোন স্থির চিত্র নেওয়া সম্ভব নয়। সে সর্বদাই অস্থির। তাই একালের কলকাত্তাই মেয়েদেরও সুস্থিরতার অবকাশ নেই। এরা ঠিক করে উঠতে পারে না শাড়ি পরবে না শালোয়ার পরবে, লুঙ্গি পরবে না বেল্‌বটস পরবে। চুল ছেঁটে খাটো করে যুরফুরিয়ে বেড়াবে না 'পিরামিড' 'মনুমেণ্ট' নিদেনপক্ষে 'আমের টুকরি' 'ঘুঁটের ঝুড়ি' সদৃশ খোঁপা কিনে মাথায় চাপিয়ে নট-নড়নচড়ন অবস্থায় থাকবে। এরা ঠিক করে উঠতে পারে না হাত দুখানাকে বিধবার মত ন্যাড়া করে ঘুরবে, না সে হাতে ডজন দেড়েক কাঁচের চুড়ি ঢুকিয়ে বসে থাকবে।

না, এরা কিছুতেই একটা কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত হতে পারছে না, তাই এরা একই সঙ্গে নথ ও 'নাইটি' পরছে, হাতে ঘড়িও বাঁধছে, মাদুলিও বাঁধছে. সিগারেটও খাচ্ছে, গুরুদীক্ষাও নিচ্ছে।

এরা 'ভল্টে' রাখতে গহনা গড়ায়, বাক্সে রাখতে উল বোনে। এরা ঘর সাজাতে 'কড়ির ঝাঁপি' 'লক্ষ্মীর সরা' মাটির ঘোড়াও রাখে, সোফা সেটি কার্পেট কুশনও ছাড়ে না।

তবে হ্যাঁ, সাজের ব্যাপারে দোদুল্যমান হলেও কাজের ব্যাপারে একালের কলকাত্তাই মেয়েরা লোকের চোখ ট্যারা করে দিচ্ছে। এরাও রাঁধে বাড়ে কুটনো কোটে, তার সঙ্গে আবার হাট-বাজারটাকেও একচেটে করে ফেলেছে। এরা সংসার নির্বাহের সর্বাধিক দায় নিজেদের কাঁধে দিব্যি তুলে নিয়েছে।

এরা খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়েই খোলা আকাশে উড়তে শিখে গেছে। পায়ের শেকল খুলতে না খুলতেই দৌড় মারতে শুরু করেছে। 'ঘর আর বার' দুটোকেই সমানভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে সুচারুভাবে। দেখে কে বলবে এই সেদিনও এর মা কাকীমারা পুরুষ দেখে ঘোমটা টানতেন। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবতেই পারতেন না।

কলকাতায় একালের মেয়েরা পারে না এমন কাজ নেই, জানে না এমন বিদ্যে নেই, বোঝে না এমন কথা নেই। পুরুষ জাতির এতাবৎ কালের সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়ে কর্মক্ষেত্রের সকল ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চাকরিবাকরি বাগিয়ে আয়-উন্নতি করছে। সংসার প্রতিপালন করছে দশভুজার যোগ্য কন্যারূপে, ঘর-বার দুই সামলে—সমিতি করছে, ইউনিয়ন গড়ছে; ঝাণ্ডা ওড়াচ্ছে, শ্লোগান দিয়ে মিছিলে নামছে।

এই মেয়েদের কাজ আর গুণপনার ফিরিস্তি দিতে হলে

গণেশের কলম চাই। সেটা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, আপাতত এইখানেই ইতি।

তবে আসল কথাটা হচ্ছে—বাইরের আবরণ, আভরণ এবং আচরণ বিচরণের যতই পার্থক্য ঘটুক, একাল সেকাল আর অন্যকালে মেয়েরা চিরকাল 'মেয়ে'ই থাকবে। কর্মক্ষেত্রে চিরন্তনী নারী মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে সাজবে বাজবে, ভুলবে ভোলাবে, মান করবে অভিমান করবে, আব ভালবাসায় মরবে।

আমার কথায় চটে ওঠেন, গুরুদেবের মন্তব্যটি মনে করুন! মনে না পড়ে পড়িয়ে দিচ্ছি। এ যুগের মেয়ে সম্পর্কে তাঁর উক্তি -

পবেন বটে জুতো মোজা, চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা অন্য দেশী চালে,
তবু দেখ সেই কটাক্ষ, আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে।

কলকাতা অচেনাই রয়ে গেল

শ্রীপান্থ

পর পর অনেকগুলো কাহিনী শোনা গেল। অনেক কথা হল। মনে হয় অচেনা শহর কলকাতার অনেকখানিই যেন এখন আমাদের জানা। আমরা জানি এ শহরের জন্ম কবে, কোথায় তার কি বাল্যলীলা, কেনই বা তার নাগরিকেরা ডাঙার মানুষ হয়েও 'ডিচার', কিংবা কি কারণে লড়েছিলেন হেস্টিংস আর ফ্রান্সিস। শুধু তাই নয়, অতঃপর এক নিমেষে আমরা বলে দিতে পারি কোথায় অঘোরে ঘুমুচ্ছেন গোবিন্দ দত্তের নয়নের মণি কুমারী তরু, কেন ওয়েলেসলির এই কোনটির নাম—'খালাসীটোলা' কিংবা কে সেই ছেলেটি, নাম যার দৌলত হুসেন! 'জ্ঞানের আলো' মুখস্থ করা ছেলের মত কলকাতার টুকিটাকি যাবতীয় প্রশ্নের চটপট জবাব এখন আমাদের মুখে। গেল বছরেই এই শহরে গৃহ সঞ্চার করে থাকি, আর গেল যুগেই এসে থাকি—কলকাতা এখন আমাদের চেনা শহর। যাকে বলে, রীতিমত চেনা, তাই। আমার নীচের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকটিকে যত চিনি, তার চেয়ে আলাপে আলাপে কলকাতাকে আজ যেন বেশী চিনি আমি। আমরা।

কিন্তু থেকে থেকেই মনে হয় এ চেনা কতটুকু? কলকাতার সবটুকু কি জানি আমরা?—জানি না। আমি কেন, শহরটা যাদের হাতের কিংবা মাথার মুঠোয় বলে ধারণা—তাঁরাও জানে না। তাঁরা আপনাকে অনায়াসে বলতে পারেন কোথায় যেতে কত নম্বর বাস লাগে কিংবা কোন সালে প্রথম আশ্বিনের ঝড় এসেছিল, অথবা কত খরচ পড়েছিলো রাইটার্স বিল্ডিংস বা গড়ের মাঠ গড়াতে। কিন্তু এ জানা কতটুকু জানা? রহস্যময়ীর মত দু'পা পিছিয়ে গিয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে কলকাতা বলবে—কিছুই না।

'চিরপরিচিত বলে যারে আমি মানি তার আমি কতটুকু জানি?' কবিরা স্বীকার করেছেন। আপনাকেও একটু ভেবে দেখলে স্বীকার করতে হবে। কেননা মুখ দেখে যাদের মনের খবর জানা যায়, কলকাতা সে ধরনের নগরী নয়। সে—নাগরী। তার চালচলন বলন—অনেক বলেও যেন কিছু বলে না।

চেহারা দেখে মনে হয় কলকাতা যেন মস্কো। লিখেছিলেন সেকালের বিখ্যাত বিলেতী সাংবাদিক রাসেল সাহেব। এক পাগলা সাহেব বলতেন—লণ্ডন হচ্ছে "পারগেটারী" আর কলকাতা—'প্যারাডাইস'। আমি মস্কো দেখিনি। লণ্ডনও না। তবে কলকাতাকে আমি দেখেছি। একদিন নয়, অনেকদিন। একভাবে নয়, অনেক ভাবে। সকালে পাইপবাহী গঙ্গার জলে স্নানের পর, দুপুরের ট্রামে, সন্ধ্যার পার্কে, রাত্রির চিলে-কোঠায়। দেখে দেখে আমার মনে হয়েছে কলকাতা যেন আত্মভোলা নগরী। এক অগোছাল সংসারী। ঘরকন্নায়

যেন একদম মন নেই তার, কোন মাধুর্য নেই তার বেশভূষায়। সন্ধ্যার চৌরঙ্গীতে যদি সে নিয়ন-এ হাসে, তবে বেলেঘাটার অন্ধ বস্তিতে তেমনি কেরোসিন না পেলে হাহাকার তোলে! আর পার্ক স্ট্রীট যদি ঠাটে গরবিনী, ছকু খানসামা লেন তবে ঐতিহ্যে আদরিণী। কিপলিং বলেছিলেন—বৈপরীত্য! প্রাসাদের পাশে কুটির, আলোর পাশে অন্ধকার—কলকাতা বৈপরীত্যের শহর।

সুতরাং কলকাতা যখন হাসে, জানবেন—কলকাতা তখন কোথাও না কোথাও, কোন না কোন বেশে কাঁদছেও। জানবেন, —প্রগতি প্রগতি করে কলকাতা যখন রুদ্ধশ্বাসে ছোটে, কলকাতা তখন স্থির হয়ে বসে ঝিমোয়ও। কালেক্টারের অফিসের সেই খেরো বাঁধানো খাতাগুলোর নাম এখন লেজার, ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম নেতাজী সুভাষ রোড। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না যেন কলকাতা উল্টে গেছে। এখনও এ শহরে 'ব্যাঙ্কশাল' আছে, ঠাকুর নোঙ্গোরেশ্বর আছেন, জ্যোতিষী আছেন এবং আছে গুমখানা লেন। এখনও এ শহরে মাটিয়া কলেজের সামনে স্বপ্নাদ্য তাবিজ বিক্রি হয়, পাল্কিগাড়ি চলে এবং সন্ধেরাত্তিরে গড়ের মাঠ পার হতে গা ছমছম করে। সেকালে যা ছিল! একালে তার সবই আছেঃ কখনও কখনও অন্য নামে—এই যা। দালালি এখন এ শহরে জেণ্টল আর্ট অব "ব্রোকারি" বড়মানুষি সর্বজনীন, নাচ গান হল্লা—সংস্কৃতি। একালের পাড়ার ছেলেরা সেকালে পাড়ায় বাস করত না ভাবলে ভুল ভাববেন। একশ বছরেরও আগে একদিন এই কলকাতার কাগজে কাগজে বিস্তর লেখালেখি হয়েছিল যে সামাজিক সমস্যাটি নিয়ে তা

হচ্ছে—সিগারেট খাওয়া। অভিযোগের মর্ম এই—ছেলেরা সিগারেট খায়। একজন জানাচ্ছেন, দিনে না খেলেও রাতে খায়। সন্ধ্যের পর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেদিন তিনটি ছেলে যে খাচ্ছিল আগুন দেখে তা স্পষ্ট বোঝা গেল অবশ্য, তাদের যে তখন চেনা সম্ভব নয় সে কথা বলাই বাহুল্য—ইত্যাদি।

এগুলো ইতিহাসের সংবাদ। কলকাতা লণ্ডন নয়, বারাণসী কিংবা দিল্লীও নয়। তার ইতিহাস নাতিদীর্ঘ। তাহলেও দশটি কাহিনীতে কিংবা দশটি বইয়ে তার পেটের কথা ফুরোবার নয়। দু দণ্ডের আলাপে ধরা দেয় না যে মন কলকাতা যেন সেই অতি সাবধানী বন্ধু, তার ইতিহাস তাই আপনি জেনেও জানেন না। এমনকি তথাকথিত তথ্যগুলোও না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রীটে দাঁড়ালে হয়ত আপনার মনে পড়বে দ্বারকানাথ ঠাকুর কিংবা ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের কথা। কিন্তু একবারও কি ভাবতে পারেন আপনি ওখানেই একদিন তুমুল হাতাহাতি হয়েছিলো মানিকচাঁদ আর ওয়াটসনের সৈন্যদের মধ্যে ? আপনি জানেন না,—এখনও খুঁজলে পাওয়া যায় সেই বাড়িটি যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল বিচারাধীন নন্দকুমারকে। লোকসভায় সেদিন ফিরিঙ্গী কথাটা নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছে আপনি শুনেছেন, কিন্তু অনেকেই শোনেন নি—এই শব্দটা নিয়ে একদিন আদালতে মোকদ্দমাও হয়ে গেছে এ শহরে। ঘড়ি চুরির জন্যে প্রাণদণ্ড থেকে বিশুদ্ধ আতর জলে রাস্তা ভেজান—অনেক খবর আছে কলকাতার লিখিত ইতিহাসে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী আছে— অলিখিত মনের ভাণ্ডারে।

আপনারা শুনেছেন 'সর্বণ আনারস খেয়ে' কবি ল্যাণ্ডারের প্রণয়িনী প্রাণত্যাগ করেছেন কলকাতা শহরে; কিন্তু কজন শুনেছেন—সুদূর কলকাতায় পুত্রবিয়োগের সংবাদ পাওয়ার পর ডিকেন্সের মনের খবর। ময়দানের পথে যেতে যেতে আপনি হয়ত দেখেছেন, পথের ধারে খুঁটির কাজ করছে সারি সারি কতকগুলো লৌহস্তম্ভ। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতেন সেগুলো আসলে সেকেলে কামান। কান পাতলে শুনতে পারতেন এদের মুখ অনেক লড়াইয়ের কাহিনী। কলকাতা থেকে অনেক দূরে কোন পতিত গমের ক্ষেতে রাজ এবং রাজ্য হারাবার কাহিনী। তাই বলছিলাম—কলকাতা আপনি চেনেন না। আমি না আপনি না, কেউ না, অনেক রহস্য এই সেদিনের শহরটিকে ঘিরে। রাশিয়ার মানুষ এখানে এসে ডোমতলা লেনে বাংলা নাটক করেছেন, মার্কিনী সাংবাদিক দৈনিক কাগজ চালিয়েছেন। বিদেশী মেয়ে এসে অন্ধলোকের পসারিনী সেজেছে।

এখনও আসছে। দশ দিক থেকে হাজার জাতের মানুষ এখনও আসে কলকাতায়। এখনও এখানে সেন্সারের খাতায় খাস পর্তুগীজ, পোলিশ খুঁজে পাওয়া যায়, মন্দির মসজিদের শহরে এখনও এমন মানুষের কথা পড়া যায়—যাদের কোন ধর্ম নেই।

কলকাতা রোমাঞ্চময় শহর। এ শহরে নূতন কিছু নেই, পুরনোও কিছু নেই। এ শহরে সবই নতুন; আবার সবই পুরনো। কলকাতা তাই দিন-রাত্তিরের চেনা শহর হয়েও অচেনা। সেদিনও তাই ছিল, আজও তা-ই রয়ে গেল।